ফারসী সাহিত্যের কালক্রম

আবদুস সাত্তার

ফারসী সাহিত্যের কালক্রম

আবদুস্ সাত্তার

ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, রাজশাহী-এর পক্ষে
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা

হিজরী ১৪০০ বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত

ই. ফা. প্রকাশনী ঃ ১১৭
ফারসী সাহিত্যের কালক্রম ঃ
আবদুস সাত্তার

প্রথম প্রকাশ ঃ

অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬
ডিসেম্বর, ১৯৭৯
মহররম, ১৪০০

প্রকাশ করেছেন ঃ
অধ্যাপক শাহেদ আলী
ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, রাজশাহী-এর পক্ষে
ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ
৬৭ পুরানা পল্টন, ঢাকা-২

ছেপেছেন ঃ
তাজ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
১৬ এ/১ কোর্ট হাউজ স্ট্রীট
ঢাকা-১

প্রচ্ছদ ঃ
বীরেন সান্যাল

বিষয় ঃ পারশ্যের জায়নামাজ

মূল্য ঃ ১৮·০০ টাকা

Farsi Sahityer Kalakram: A Survey of Persian Literature, Written by Abdus Sattar in Bengali and published by the Islamic Foundation Bangladesh, Dacca, for the Islamic Cultural Centre, Rajshahi.

Price: Tk. 18·00

কবি শামসুর রাহমান

বন্ধুবরেষু

প্রসঙ্গ কথা

'ফারসী সাহিত্যের কালক্রম' গ্রন্থে ফারসী সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাসের রূপরেখা বর্ণনা করা হয়েছে। ফারসী সাহিত্য পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন এবং সমৃদ্ধ সাহিত্য। ইসলামী সাহিত্যের বিস্তৃত অংশও এই ফারসী সাহিত্য। মুঘল শাসন আমলে এদেশের রাজভাষার মর্যাদা লাভ করেছিল ফারসী ভাষা। রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় উভয় কারণেই এই ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা তখন বলবৎ ছিল। বৃটিশ আমলে এসে একই ঐতিহ্যের ধারা অনেকটা প্রবহমান ছিল। কেননা, বৃটিশরাও এদেশের মুসলমানদের ধর্মীয় এবং ঐতিহ্য চেতনার অনুশীলনে বাধা প্রদান করে নি।

যেহেতু ফারসী ভাষা ও সাহিত্য ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটি বিস্তৃত অংশ, সেহেতু স্বাধীন বাংলাদেশেও আমাদের পক্ষে এমন একটি উন্নত এবং সমৃদ্ধ ভাষা ও সাহিত্যকে জানা অপরিহার্য। এবং সেই জানার পথকেই সুগম করে দিয়েছেন জনাব আবদুস্ সাত্তার। লেখকের আসল উদ্দেশ্য বাংলা পাঠক-পাঠিকাকে ফারসী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত করানো এবং এই পরিচয় প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি সফলকাম হয়েছেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বলা আবশ্যক, জনাব আবদুস্ সাত্তার একাধারে কবি, গবেষক এবং বহু ভাষাবিদ। ইতিপূর্বে আরবী সাহিত্য সম্পর্কিত তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ সুধী

সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। 'ফারসী সাহিত্যের কালক্রম' গ্রন্থটিও সেই খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখবে বলে মনে করি। ফারসী সাহিত্যের বিস্তৃত অংশ জুড়ে রয়েছে ইসলামী ঐতিহ্য এবং গৌরবের দিক-চিহ্ন। জনাব আবদুস্ সাত্তার সেই ঐতিহ্য এবং গৌরব জনসমক্ষে তুলে ধরে পরম উপকারই করেছেন বলতে হবে। তিনি সহজ সরল এবং সাবলীল ভাষায় ফারসী সাহিত্যের পরিচয়-লিপি পেশ করে পথ-প্রদর্শকের কাজ করেছেন। গ্রন্থটি যে কেবল ফারসী সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রী এবং গবেষকদেরই উপকারে আসবে তাই নয়—সাধারণ পাঠকও এতে উপকৃত হবেন।

এ. জেড. এম. শামসুল আলম
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ
ঢাকা

'ফারসী সাহিত্যের কালক্রম' গ্রন্থে ফারসী সাহিত্যের সূচনাপর্ব অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশক পর্যন্ত সব কয়টি শাখার মোটামুটি পরিচয় পেশ করেছি মাত্র ; কোনো বিস্তৃত পর্যালোচনা কিংবা তুলনামূলক আলোচনায় অগ্রসর হই নি। যদিও তুলনামূলক আলোচনার অবকাশ ফারসী সাহিত্যে যথেষ্ট রয়েছে।

বলা আবশ্যক যে, ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের আবর্তন-বিবর্তনের সঙ্গে বহু রাজশক্তির উত্থান-পতন জড়িত আছে। যেমন সাসানীয় (২২৮ খ্রীঃ—৬৪১ খ্রীঃ), আব্বাসীয় (৬৪১ খীঃ—৮৭৯ খ্রীঃ), সাফারী (৮৮০ খ্রীঃ—৯০১ খ্রীঃ), সামানীয় (৯০১ খ্রীঃ—৯৯৮ খ্রীঃ), গজনবী (৯৯৮ খ্রীঃ—১০৬০ খ্রীঃ), সালজুক (১০৬০ খ্রীঃ—১১৯৩ খ্রীঃ), আতাবেগ (১১৯৪ খ্রীঃ—১২২৫ খ্রীঃ), মোংগলীয় (১২২৬ খ্রীঃ—১৩৩৫ খ্রীঃ), মোজাফ্ফরীয় (১৩৩৬ খ্রীঃ—১৩৮৭ খ্রীঃ), তৈমূরীয় (১৩৮৭ খ্রীঃ—১৪৫০ খ্রীঃ), সাফাভী (১৪৫১ খ্রীঃ—১৭৩৬ খ্রীঃ), নাদির শাহ প্রবর্তিত শাসন (১৭৩৬ খ্রীঃ—১৭৬০ খ্রীঃ), জান্দীয় (১৭৬০ খ্রীঃ—১৭৯৪ খ্রীঃ), কাজার (১৭৯৪ খ্রীঃ—১৮৮৬ খ্রীঃ) এবং তৎপরবর্তী শাহদের শাসন ও বর্তমান খোমেনী শাসন। প্রত্যেকটি রাজশক্তি ও শাসনের সঙ্গে ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের যোগ নিবিড় এবং রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা এবং ধ্বংসযজ্ঞ উভয়ই এর সঙ্গে জড়িত। এসব সম্পর্কেও বিস্তৃত আলোচনায় নিবিষ্ট চিত্ত হই নি—কোথাও কোথাও খুব সংক্ষেপে ইংগীত দিয়েছি মাত্র।

ফারসী সাহিত্য বিশেষ করে কবিতার এক বিস্তৃত অংশ জুড়ে রয়েছে সূফীবাদ। সূফীবাদের জন্মলগ্ন অর্থাৎ হজরত আবুল হাশিম (রাঃ)-এর সময় থেকে তাপসী রাবেয়া, মনসুর হল্লাজ, শামস-ই-তাব্রিজ প্রমুখ সূফী দার্শনিকদের যে প্রভাব ফারসী সূফী-কবি যেমন আত্তার, হাফিজ, রুমী, জামী, আনওয়ারী, সানাই প্রমুখদের মধ্যে তদগত সে সম্পর্কেও সামান্য আলোকপাত করেছি মাত্র—সূফী-দর্শন তত্ত্বের বিশদ ব্যাখ্যা করিনি। কারণ এ সম্পর্কে আমার ভিন্ন গ্রন্থে বিস্তৃত ও বিশদ আলোচনা স্থান পেয়েছে।

ফারসী সাহিত্যের সুদীর্ঘকালের ইতিহাসকে শাসন ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। আমি তা না করে

মোটামুটি চারটি ভাগে ভাগ করে [যেমন (১) সূচনা-পর্ব ও ক্রমবর্ধমান যুগ, (২) গৌরবময় যুগ, (৩) আধুনিক-পূর্ব যুগ এবং (৪) আধুনিক ফারসী সাহিত্য] ফারসী সাহিত্যের মোটামুটি পরিচয় পেশ করেছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে আধুনিক ফারসী সাহিত্যের শুরু হলেও আধুনিক ফারসী সাহিত্যকে দু'টো পর্ব ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ দশক পর্যন্ত—এই একশ' বছর আধুনিক-ধ্রুপদী সাহিত্য (মডার্ন ক্লাসিক্যাল) এবং পঞ্চাশের দশক থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত আধুনিক সাহিত্য। মর্ডান লিটারেচার অর্থাৎ আধুনিক ফারসী সাহিত্যের বয়োসীমা দাঁড়িয়েছে প্রায় তিরিশ বছর। অন্ততঃ আমার ইরানীয় সাহিত্যিক বন্ধুরা যেমন, অধ্যাপক মূর্তাজা সাররাফ, গোলাম রেজা ইমামী প্রমুখও তাই বলেন। এ সম্পর্কেও আমি বিস্তৃত আলোচনা করেছি আমার 'আধুনিক ফারসী সাহিত্য' গ্রন্থে।

ফারসী সাহিত্যের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস বাংলাভাষায় অন্ততঃ বাংলাদেশে রচিত হয়েছে বলে আমার মনে পড়ে না। যা আছে তা কয়েকজন ইরানীয় বা পারশ্যের কবিদের উপর বিক্ষিপ্ত আলোচনা মাত্র। বাংলা ভাষাভাষী পাঠক-পাঠিকা ও সুধীজনেরা ফারসী ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা পাবেন এই আশায় 'ফারসী সাহিত্যের কালক্রম' পরিবেশনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। আরও একটা কথা বলে রাখা ভালো, 'কালক্রম' কথাটিতে কবি, লেখক, সমালোচক প্রমুখদের রচনা বৈশিষ্ট্য এবং প্রকাশিত গ্রন্থের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছি অতিমাত্রায়। কেননা গ্রন্থের মাধ্যমেই সত্যিকারভাবে সাহিত্য ও সাহিত্যিকের বিচার হয়।

'ফারসী সাহিত্যের কালক্রম' যদি বাংলাভাষাভাষী পাঠক-পাঠিকা ও সুধীজনের সামান্যতম উপকারেও আসে তবে নিজের শ্রম সার্থক মনে করবো।

২৪শে অক্টোবর, ১৯৭৯ — আবদুস্ সাত্তার

৫৭/৪ সার্কুলার রোড, ধানমণ্ডি,
ঢাকা-৫

এককালে ফারসী ছিল এদেশের রাজভাষা। বৃটিশ আমলেও ফারসী ভাষার মর্যাদা অনেকটা অটুট ছিল বলা চলে। কেননা, এই ভাষার চর্চা অনেকেই বজায় রেখেছিলেন। কারণ এই ভাষা তাদের রক্তে মাংসে মিশে গিয়েছিল।

বলতে দ্বিধা নেই, ইরানীয় সংস্কৃতির প্রভাব যখন এই উপমহাদেশে বিস্তার লাভ করে তখন বহু ফারসী শব্দ যেমন বাংলা ভাষায় অনুপ্রবেশ করে তেমনি আদব-কায়দা ইত্যাদিতেও ইরানীয় প্রভাব মূর্ত হয়ে উঠে। তাছাড়া পশ্চিম দেশীয় শায়েখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান যাঁরা এদেশে এসে বসতি স্থাপন করেন তাঁরাও ফারসীর চর্চা অব্যাহত রাখেন। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে বসতি এলাকাকেও ফারসী ভাষায় নামকরণ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, আমাদের গ্রামের নাম 'গোলরা'। আমার দাদাজানের মুখে শুনেছি 'গোলরা' শব্দটি ফারসী 'গুল আরাঁ'-এর অপভ্রংশ অর্থাৎ পরিবর্তিত রূপ। 'গুল আরাঁ'-এর ফারসী আভিধানিক অর্থ 'ফুলের বাগান'। আমাদের পূর্ব-পূরুষ যাঁরা এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন তাঁরা ছিলেন পশ্চিম দেশীয় এবং ফারসী ছিল তাঁদের ব্যবহারিক ভাষা। সেই অনুসারেই গ্রামটির এই ধরনের নামকরণ করা হয়। এমন নজীর বাংলাদেশে বহু আছে।

মনে আছে, বাবার মুখে মসনবীর গল্প এবং গজল শুনে শুনে আমরা ছোটবেলায় ঘুমাতাম। তখন গজলের কোনো অর্থ বুঝিনি, তবে সুরের মায়াজাল আমাদের মোহিত করতো। সেই সুর এখনো কানে বাজে এবং বাবাজানের একটা শান্ত সৌম্য চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠে। সেই সুরের প্রতিধ্বনি 'ফারসী সাহিত্যের কালক্রম'-এ কতটা শোনা যাবে বলতে পারিনা, তবে এমন একটা উন্নত. সমৃদ্ধ এবং সুন্দর ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আমার অনুরাগ জন্মগত এবং সেই অনুরাগই এই গ্রন্থে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেছি মাত্র—তেমন কিছু লেখা হয়নি।

রেডিও বাংলাদেশ, ঢাকা আমার এ গ্রন্থ রচনার কাজ আরও ত্বরান্বিত করেছেন। তাঁরা যদি ধারাবাহিকভাবে আমাকে ফারসী সাহিত্যের উপর অনেকগুলো প্রোগ্রাম না দিতেন তবে এ গ্রন্থ রচনায়

আরও বিলম্ব হতো। আমি এ ব্যাপারে রেডিও কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে এ. এইচ. এম. আবদুল্লাহ্-হেল কাদের এবং মনোয়ার হোসেনের কাছে ঋণী। এই সঙ্গে বাংলা একাডেমী, সেণ্ট্রাল পাবলিক লাইব্রেরী, মাদ্রাসা-ই-আলীয়া লাইব্রেরী ও ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষকেও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তাঁরা আমাকে তাঁদের সংগৃহীত ফারসী সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থসমূহ পড়ার সুযোগ দিয়েছেন। বিশেষ করে সেণ্ট্রাল পাবলিক লাইব্রেরীর মোতাহার আলী খান এবং বাংলা একাডেমীর শামসুল হক এবং আমিরুল মোমেনিনের সাহায্য ভুলবার নয়। যে সমস্ত গ্রন্থ থেকে বিভিন্নভাবে সাহায্য নিয়েছি সেসবের একটা তালিকা 'গ্রন্থপঞ্জীতে' দেওয়া হলো।

'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' গ্রন্থটির প্রকাশনা দায়িত্ব গ্রহণ করায় আমি তাঁদেরকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। তাঁরা এ দায়িত্ব না নিলে গ্রন্থটি আদৌ প্রকাশিত হতো কিনা সন্দেহ। বিশেষ করে জনাব এ. জেড. এম. শামসুল আলম ও অধ্যাপক শাহেদ আলীর অবদান অপরিসীম।

এই গ্রন্থের সবগুলো কবিতাই মূল ফারসী থেকে আমার নিজের অনুবাদ। হাফিজ এবং ইকবালের দুটো কাব্যাংশ কাজী নজরুল ইসলাম ও কবি ফররুখ আহমদ থেকে গ্রহণ করেছি। আমি তাঁদের অমর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। খোদা হাফেজ।

আ. সা.

সূচীপত্র

১
সূচনাপর্ব ও ক্রমবর্ধমান যুগ/১
২
গৌরবময় যুগ/১৩
৩
আধুনিক পূর্ব-যুগ/৫৯
৪
আধুনিক ফারসী সাহিত্য/১১৩

পরিশিষ্ট

গ্রন্থপঞ্জী/১৫৭

শব্দসূচী/১৬৩

১

সূচনা-পর্ব ও ক্রমবর্ধমান যুগ

ফারসী ভাষা পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ও সমৃদ্ধ ভাষা এবং এর সাহিত্যও যথেষ্ট উন্নত। প্রাচীন গ্রীক, রোম, আরব প্রভৃতি দেশের অধিবাসিগণ ইরানীয় ভূখণ্ডের এই ভাষাকে ফারসী বলে অভিহিত করতেন এবং এই ভূখণ্ড তাইগ্রীস থেকে সিন্ধু উপত্যকা এবং কাস্পীয়ান সাগর ও অক্সাস থেকে আরব মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পারস্য এই বিস্তৃত ভূখণ্ডের অংশ মাত্র। বর্তমানে ইরান, আফগানিস্তান ও বালুচিস্তানের অধিবাসীদের মাতৃভাষা ফারসী।

ফারসী ভাষার ইতিহাস সু-প্রাচীন। খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর থেকে আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনসমূহে ফারসী ভাষার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। এবং এই প্রমাণ বিধৃত আছে আর্যদের প্রাথমিক ইরানীয় ভূখণ্ডে আগমন কেন্দ্রিক বহু প্রাচীন দলিল দস্তাবেজে। প্রাচীন ইরানীয় ভূখণ্ডের অধিবাসীদের একমাত্র ভাষা ছিল প্রাচীন ফারসী এবং আর্যরাও তখন এই ভাষাই মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহার করতেন। পরবর্তীকালে এই আর্যসমাজ যখন সুদূর ভারত পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেন তখন সেই ভাষার পরিবর্তন সাধন করে সংস্কৃতে রূপ দেন এবং এই সংস্কৃতেরই প্রথম ফলশ্রুতি সংস্কৃত ভাষায় রচিত বেদ এবং ঋগ্বেদ। খ্রীষ্টপূর্ব এক হাজার বছর আগে জোরোষ্টার প্রবর্তিত পার্শী ধর্মের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তার ভাষার সঙ্গে ফারসী ভাষার সাযুজ্য রয়েছে বহুল

পরিমাণে। আবেস্তা বা জেন্দাবেস্তা গ্রন্থের ভাষা পাহলবী। প্রাচীন গ্রীক, সিরীয় এবং সংস্কৃত ভাষার অবদানে পাহলবী ভাষার সমৃদ্ধি ঘটলেও প্রাচীন ফারসী ভাষা ছিল পাহলবী ভাষার চেয়েও প্রাচীন এবং উন্নত। কেননা, ফারসী ভাষার কিউনীফর্ম রীতিই তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ এবং এই রীতি পাহলবী ভাষায় অনুপস্থিত।

সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে যখন উম্মাইদ এমনকি আব্বাসীয় শাসন সমগ্র ইরানীয় ভূখণ্ডে কায়েম হয় তখন এতদ্ঞ্চলের ভাষার কোনো পরিবর্তন তাঁরা করেন নি যদিও তাদের শাসন সংক্রান্ত ভাষা ছিল আরবী। উল্লেখ্য যে, পাহলবী ভাষার অনেক শব্দ যদিও আরবী ভাষায় সংমিশ্রিত ছিল তথাপি তাঁরা আরবী হরফে ফারসী ভাষার নবজন্ম দান করলেন এবং এই ভাষা অভিহিত হলো আধুনিক ফারসী ভাষা বা দারী ভাষারূপে। আরও বলা যায় যে, আরবী ভাষায় রয়েছে বত্রিশটি হরফ এবং তাঁরা ফারসী ভাষায় আরও চারটি হরফ বর্ধিত করে এর সাহিত্য সীমা বিস্তৃত করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করলেন। ইরান ও খোরাসানের অধিবাসীরা এতে তৃপ্তি বোধ করলেন এবং তাদের কার্যকরী ভূমিকায় আধুনিক ফারসী বা দারী ভাষা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হতে শুরু করলো। পরবর্তী-কালে এই ভাষা সুদূর ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। গজনবী, মোঙ্গল এবং তৈমুর শাসন আমলে ফারসী বা দারী ভাষা রাজ-ভাষার মর্যাদা লাভ করে এবং এর সাহিত্যও গৌরবময় দিকচিহ্নের সূচনা করে। বর্তমানে ইরান এবং আফগানিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ফারসী হলেও এই ভাষার বিস্তৃতি তাজিকিস্তানসহ সোভিয়েত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং পাকিস্তানের বালুচিস্তান প্রভৃতি স্থানে।

ফারসী সাহিত্যের কালক্রম ভাগ করলে চারটি প্রধান ভাগে একে ভাগ করা যায়ঃ

এক. ক্রমবর্ধমান যুগ। অষ্টম-নবম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি।

দুই. গৌরবময় যুগ। একাদশ শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই গৌরবময় যুগের সময় সীমা। গজনবী ও

সালজুক শাসন আমলেই ফারসী সাহিত্যের উন্নতির চরম পরাকাষ্ঠা লক্ষ্যযোগ্য।

তিন. মোঙ্গল, তৈমুর এবং পরবর্তী শাসকদের কার্যকরী ভূমিকায় ফারসী সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই সময়সীমা বিস্তৃত। এবং এটাই আধুনিক-পূর্ব যুগ।

চার. আধুনিক ফারসী সাহিত্য। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এর গতি প্রবাহ চলমান।

আরবী সাহিত্যের মতো ফারসী সাহিত্যের কাব্য শাখাই সবচেয়ে বেশী বিস্তৃত এবং সমৃদ্ধ। বলা আবশ্যক যে, সপ্তম শতাব্দীতে যখন ইরানীয় ভূখণ্ডে ইসলামী শাসন কায়েম হয় তখন থেকেই ফারসী সাহিত্যের নবজন্মের সূত্রপাত হয় এবং কবি-সাহিত্যিকগণও নব উন্মাদনায় সাহিত্য রচনা শুরু করেন। ফারসী সাহিত্যের আসলরূপ ইসলামীয় শাসন আমল থেকেই আরম্ভ হয় বলা চলে। ইসলামীয় যুগের সর্বপ্রথম এবং খ্যাতিমান কবি খোরাসানের মারভ অঞ্চলের আবুল আব্বাস। খলীফা হারুন অল-রশীদের পুত্র আল-মামুন যখন খোরাসানের শাসনকর্তা তখন আবুল আব্বাস আল-মামুনের প্রশংসা-গীতি লিখে সম্রাটের প্রীতিভাজন হন এবং গীতিটির কাব্যমূল্যও ছিল অত্যধিক। আবুল আব্বাসের পরে অর্থাৎ নবম শতাব্দীর প্রথমার্ধের আর একজন কবি আফগানিস্তানের বাদঘীর বাসিন্দা হানজালা। তিনি সম্রাট আবদুল্লাহ্ ইবনে তাহিরের সভাকবি ছিলেন। তাঁর কাব্যে বলিষ্ঠতার ছাপ সুস্পষ্ট। এখানে তাঁর কবিতার নমুনাস্বরূপ কয়েকটি লাইনের অনুবাদ পেশ করছি ঃ

সিংহের থাবায় যদি একান্ত নেতৃত্ব থেকে থাকে,
তাহলে নির্ভীক চিত্তে থাবা থেকে নেতৃত্ব আনো গে ;
বীরের সম্মান যদি পেতে চাও, বীরত্বের সাথে
মৃত্যুকে দু'পায়ে দলে উচ্চশির দেখাও সবারে।

হানজালার সমসাময়িক আফগানিস্তানের ফিজিস্তানের মোহাম্মদ ওয়াররাক এবং মোহাম্মদ বিন ওয়াসীফ সাকজীও ফারসী কাব্য জগতে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। রাজা-বাদশাহ্‌দের প্রশংসা এবং প্রেয়সীর রূপ বর্ণনাই ছিল তাঁদের কাব্য-কর্মের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এঁদের সামান্য পরে সাফ্‌ফারী রাজসভা অলঙ্কৃত করে যিনি কাব্যের স্ফুলিঙ্গ প্রদর্শন করেন তিনি ফিরোজ মাশ্‌রেকী। বহু কাব্য সংকলনে তাঁর কবিতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রেয়সীর রূপ বর্ণনা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক অবক্ষয়কে তিনি চিত্রিত করেছেন তাঁর কাব্য-শিল্পে। তাছাড়া তাঁর কাব্যে প্রতীকধর্মী চিত্রকল্প গুলোও লক্ষ্য করবার মতো। যেমন,

তীরটা যেন একটা পাখী ;
সে কেবল জীবন শিকার করে।
ঈগলের পাখার একটি পালক—
মৃত্যুর উৎসবে আমন্ত্রণ জানাবার জন্যই
ঈগল তার পালকটি নিয়োজিত রেখেছে।
শিকারী ঈগলের পালক
তীরটা ; সেও এক পাখী।

ফিরোজ মাশরেকীর সমসাময়িক আবুল সালীকও কাব্য জগতে বিশেষ প্রশংসার দাবীদার। সমাজের অন্যায়-অনাচার তাঁকে ভীষণ-ভাবে নাড়া দিয়ে ছিল। এসব দূরীকরণে তিনি ছিলেন উচ্চকণ্ঠ। সৎসাহস এবং নির্ভীকতার জন্য তিনি প্রশংসিত হয়েছেন বহুবার। নিম্নের একটি স্তবকেই তাঁর কাব্যাদর্শের পরিচয় পাওয়া যায় ঃ

ভাঁড়ামী করে আত্মসম্মান কুড়ানোর চেয়ে
আত্মরক্ত ধুলায় লুটানো ঢের ভালো।
তোষামোদ-নীতি আর মনুষ্য পূজার চেয়ে
মূর্তি পূজাকেই আমি উচ্চে স্থান দিই।

খলীফা হারুন অল-রশীদ এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র যেমন আরবী সাহিত্য ও সংস্কৃতির সমঝদার ছিলেন তেমনি তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতার

সূত্র ফারসী সাহিত্যেও বিস্তৃত। এবং এই লক্ষণ ফারসী সাহিত্যের আগাগোড়াই লক্ষ্য করবার মতো। দশম শতাব্দীতে সামানীয় শাসনও ফারসী সাহিত্যে প্রভূত ক্রিয়া করে। আব্বাসীয় রাজদরবারে যেমন কবি-সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের সমাদর ছিল অত্যধিক সামানীয় শাসক গোষ্ঠীও আব্বাসীয়দের অনুকরণে ছিলেন ভীষণ তৎপর। দশম শতাব্দীতে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন এবং যাঁদের অবদানে ফারসী কাব্য-সাহিত্য সমৃদ্ধ তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বলখের আবু শাকুর, আবুল মু'আইদ, আবুল হাসান শহীদ; খোরাসানের কিসাই; সমরখন্দের রোদাকী, দাকিকী এবং আরও অনেকে। এঁদের মধ্যে আবু শাকুর নানা কারণেই উল্লেখের দাবী রাখে। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, দার্শনিক এবং ইতিহাসবেত্তা। গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসের বহুদর্শনতত্ত্ব সমৃদ্ধ রচনা তিনি ফারসীতে অনুবাদ করেন। তাছাড়া তাঁর কাব্য-ভাবনায়ও ছিল দর্শনতত্ত্বের মূল সুর। আবু শাকুরই সর্বপ্রথম ফারসী সাহিত্যে মহাকাব্যের ঢং-এ প্রশংসা-গীতি রচনা করেন। জ্ঞান বা বুদ্ধি সম্পর্কে তাঁর দর্শন অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তাঁর দু'টো লাইনের অনুবাদ এইরূপ ঃ

যেমন রাজার হাতে রাজ্যের শাসন
তেমনি বুদ্ধির হাতে দেহের শাসন।

বুদ্ধি দ্বারা যাঁরা জীবিকা অর্জন করেন বা ভালোমন্দ নির্ধারিত করেন তাঁদেরকে যে 'বুদ্ধিজীবী' আখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়—এই কথাটি যে আবু শাকুরের কথার প্রতিধ্বনি তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

দশম শতাব্দীর মাঝামাঝী সময়ের আবুল মু'আইদ-এর কবিকৃতি ছাড়াও সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান পারস্যের রাজা-বাদশাহ্‌দের উপকথাধর্মী গদ্য 'শাহনামা।' তিনিই সর্বপ্রথম প্রাঞ্জল গদ্যে 'শাহনামা' রচনা করেন। কালের কুক্ষিতে পড়ে আবুল মু'আইদের 'শাহনামা' অবলুপ্ত হলেও ইতিহাসবেত্তারা আজও তাঁর নাম 'শাহনামা'র অন্যতম রচয়িতা হিসেবে স্মরণ করে থাকেন। এসব ছাড়াও তিনি পবিত্র কোরান ও বাইবেলের অমর প্রেম-কাহিনী নির্ভর 'ইউসুফ-

জোলায়খা'র জীবন আলেখ্য কাব্যে রূপদান করেন। পরবর্তী সময়ে ফারসী সাহিত্যে ইউসুফ-জোলায়খার উপর যেসব কাহিনী-কাব্য রচিত হয়েছে তাদের পশ্চাতপট হিসেবে আবুল মু' আইদের কাব্য কর্মই ক্রিয়া করেছে বলে অনেকে মনে করেন।

আবুল মু' আইদের সমসাময়িক আর একজন উল্লেখযোগ্য কবি আবুল হাসান শহীদ। রাজা-বাদশাহ্‌দের প্রশংসা, নিসর্গ বর্ণনা, নর-নারীর প্রেম-বিরহ ও জীবন-যন্ত্রণা ইত্যাদি তাঁর কাব্যের বিষয়-বস্তু। জীবনকে তিনি উপলব্ধি করেছেন নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে। তার এক্স-রে তে জীবন কিভাবে ধরা পড়েছে লক্ষ্য করা যাক ঃ

দুঃখের আগুনে যদি থাকতো কেবলি ধুঁয়োরাশি,
তাহলে পৃথিবী হতো চতুর্দিক ঘেরা অন্ধকার।
পাবে না পৃথিবী ঘুরে একটি মানুষ
যে বলে, 'এখানে আমি খুব সুখে আছি।'

দশম শতাব্দীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও খ্যাতিমান কবি সমরখন্দের রোদাকী। ফারসী সাহিত্যের জনক বলে তাঁকে আখ্যায়িত করা হয়। এবং তিনিই ফারসী সাহিত্যের প্রথম শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর কাব্য-গুণে মুগ্ধ হয়ে সামানীয় শাসক (৯১৪—৯৪৩ খ্রীঃ পর্যন্ত তাঁর শাসন-কাল) নসর বিন আহমদ তাঁকে সভাকবি নিযুক্ত করেন। ইংরেজ কবি হোমার, আরবী কবি আবুল আলা আল-মাআররী এবং উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর মিশরীয় পণ্ডিত ডক্‌টর তাহা হোসেনের মতো রোদাকীও ছিলেন জন্মান্ধ। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তিনি দিনের পর দিন তাঁর রচিত কবিতাসমূহ জনসমক্ষে মুখস্থ আওড়াতে পারতেন। গবেষকদের মতে তাঁর খণ্ড-কবিতা, দীর্ঘ-কবিতা, গীতি-কবিতা ইত্যাদির সংখ্যা তেরো লক্ষের মতো। তবে তিনি যে স্পেনীয় কবি লোপেদ্য ভেগার মতো কয়েক লক্ষ কবিতা রচনা করেছেন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

আরবী ভাষায়ও তাঁর জ্ঞান ছিল অপরিসীম। বিশ্বখ্যাত আরবী লেখক আবদুল্লাহ্‌ ইবন আল মুকাফ্‌ফার 'কালিলা ওয়া দিমনা' গ্রন্থটিও

তিনি ফারসী ভাষায় অনুবাদ করে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন। তাছাড়া আরবী 'আলিফ লায়লা ওয়া লায়লার' ফারসী অনুবাদ করেও ফারসী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার পথ তিনি উন্মুক্ত করেন। উল্লেখ্য যে, তাঁর কবিতা ছিল সহজ, সরল অথচ বর্ণনা পরিপাট্য এবং আলঙ্কারিক গুণে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তাঁর 'বোখারা' কবিতা থেকে কয়েকটি লাইনের অনুবাদ পেশ করছি ঃ

মুলিয়াঁ নদীর জলে আতরের ঘ্রাণ মিশে আছে,
আমার প্রেয়সী সেই ঘ্রাণের ঢেউয়ে খেলা করে।
অকসাসের বালিরাশি যদিও কর্কশ মনে হয়
আমার পায়ের নীচে সুকোমল রেশম সদৃশ।...

বোখারা শান্তির দেশ, শান্তি নিয়ে থাকো সর্বক্ষণ
সম্রাট আসবে ফিরে এখানে অতিথি হয়ে ফের।
বোখারা বাগান তুমি, সম্রাট সে বাগানের ফুল
চাঁদ ছাড়া আকাশের জানি জানি কোনো শোভা নেই।

রোদাকীর 'বোখারা' কবিতাটির একটি সুন্দর ইতিহাস আছে। জানা যায়, সামানীয় সম্রাট নসর বিন আহমদ একবার হেরাতে অবস্থান করছিলেন এবং দেশে ফিরবেন না বলে স্থির করেছিলেন। অথচ দেশবাসী সম্রাটের জন্য ছিল অস্থির-চিত্ত। সবাই রোদাকীর শরণাপন্ন হলে তিনি এই কবিতাটি লিখেন এবং সুর সহযোগে সঙ্গীতে রূপ দেন। এই সংবাদ শুনে সম্রাট আর স্থির থাকতে পারেননি এবং দেশে ফিরে আসেন। দেশে প্রত্যাবর্তন করে সম্রাট তাঁকে পুরস্কৃত করেন।

রোদাকী ছিলেন সুগায়কও। বেহালা সংযোগে তিনি গাইতে পারতেন অপূর্ব। ফারসী গজলের সুর এবং জনপ্রিয়তার মূলে রোদাকীর অবদান নিঃসন্দেহে অসামান্য। তাঁর গজলগুলো শুধু সুরের মায়াজালেই আচ্ছন্ন ছিল না---এক একটি গজল ছিল মূল্যবান মুক্তো খণ্ডের মতোই ভাস্বর। তাঁর একটি গজলের কয়েকটি লাইন এইরূপ ঃ

জীবন আমাকে দিয়েছে ঢের শিক্ষা
শিক্ষার কাছেই জীবন নেয় যে দীক্ষা।
অপরের সুখে হয়ো না তুমি দুঃখী,
তোমার সুখেও হবে না কেউ সুখী।

রোদাকীর পরেই নাম করতে হয় দাক্বিকীর। আরবী ভাষা ও সাহিত্যেও ছিল তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। প্রখ্যাত আরবী লেখক আবদুল্লাহ্ ইবন আল-মুকাফ্‌ফার রচনা তাঁকে বিশেষ প্রভাবান্বিত করে। তাঁর পূর্ববর্তী কবি যেমন মাসূদী, আবুল মু'আইদ, আবু আলী প্রমুখের রচনাও তাঁকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করে। তুসের আবু মনসুর সংকলিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'শাহনামা'র কলেবর বর্ধনেও তাঁর অবদান অপরিসীম। উল্লেখ্য যে, পরবর্তীকালে ফেরদৌসী 'শাহনামা'র যে কাব্যরূপ প্রদান করেন তাতেও দাকিকীর উল্লেখ আছে।

কবি হিসাবে দাকিকী ছিলেন অত্যাধিক জনপ্রিয়। গজল বা গীতি-কবিতা রচনায় তাঁর দক্ষতা তুলনাহীন। ফারসী সাহিত্যের গবেষকদের মতে এবং তাঁর কিছু সংখ্যক কবিতাদৃষ্টে তাঁকে জোরোষ্টার ধর্মী পার্শী বলে স্থির করা হলেও তাঁর রচনায় মুসলিম দর্শন ছিল প্রকট। যেমন প্রকট ছিল আরবী কবি জীবরান খলীল জীবরানের। জীবরান জন্মগত খ্রীষ্টান হলেও তাঁর রচনা মুসলিম দর্শনে ভারাক্রান্ত।

দাকিকীর কবিতায় বিচিত্রধর্মী তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। নিসর্গ প্রীতি, প্রেম-বিরহ এবং আধ্যাত্মিকতা সবই তাঁর কাব্য-কর্মে বাঙময়। নারীর রূপ বর্ণনা কেন্দ্রিক একটি অপূর্ব প্রেমের কবিতার কয়েকটি লাইনের অনুবাদ এইরূপ ঃ

তোমার চুলের মতো কালো এই রাত
তোমার মুখের মতো দীপ্ত এই দিন।
তোমার ঠোঁটের ওই সুদৃশ্য চত্বরে
শিল্পীর সৌকর্য ভরা মুক্তোর বিস্ময়।
হরিণীর দু'টি চোখ তোমার দু'চোখে,
অথবা সে নার্সিসাসী চোখের ভিতরে।

দশম শতাব্দীর আরবী দার্শনিক ও পণ্ডিত প্রখ্যাত আবি সীনাও ফারসী সাহিত্যে এক অবিস্মরণীয় নাম। সাসানীয় শাসনের শেষ এবং গজনবী শাসনের শুরুতে তাঁর আবির্ভাব। প্রথমতঃ তিনি তাঁর রচিত আরবী গ্রন্থসমূহের ফারসী অনুবাদ করেন এবং পর-বর্তীকালে মূল ফারসী ভাষায় কবিতাও রচনা করেন। উল্লেখ্য যে, আবি সীনা মূলতঃ আরবী ভাষায় লিখলেও তাঁর মাতৃভাষা ছিল ফারসী। আবি সীনার কবিতা অধিকাংশই দর্শনতত্ত্ব ভারাক্রান্ত। একটা উদাহরণ দেয়া যাক ঃ

জীবনের এ বিশাল মরুভূমি জুড়ে
অনেক ঘুরেছে আহা আমার এ মন !
কিন্তু কি পেয়েছে কোনো জ্ঞানের সন্ধান ?
আমার হৃদয়ে উঠে হাজার সুর্যের ঝলকানি---
এক কণা অন্ধকার দূর করা হয়নি সম্ভব।

ফারসী সাহিত্যের সূচনা-পর্বে গদ্য সাহিত্যের খুব একটা উন্নতি সাধিত হয়নি। তার বহুবিধ কারণের মধ্যে একটি এই যে, সমগ্র ইরানীয় ভূখণ্ডে যখন মুসলিম শাসন কায়েম হয় তখন আরবী ভাষা ছিল রাজ-ভাষা এবং এর পশ্চাতপটে ছিল পাহলবী ভাষার অস্তিত্ব। প্রাচীন ফারসী এবং পাহলবী ভাষার মাঝামাঝি এবং আরবী হরফ সংযোগ করে একটি নতুন ভাষার জন্মদান করা হয় এবং সেই ভাষাই আধুনিক ফারসী বা দারী ভাষা—এ সম্পর্কে আগেও ইংগিত দেওয়া হয়েছে। জোরোষ্টারপন্থী ইরানীয়গণ পাহলবী ভাষাকে জোরদার এবং টিকিয়ে রাখার জন্য আড়ালে আবডালে ক্রিয়া করে আসছিল কিন্তু মুসলিমগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকায় তা' সম্ভব হয়ে উঠেনি। ফলে, পাহলবী ভাষার সাহিত্য ক্রমে ক্রমে অবলুপ্তির পথে চলে যায়। সামান্য যা কিছু অবশিষ্ট থাকে তার মধ্যে 'খুতে নামাক' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একদিকে মুসলিমগণ যেমন পাহলবী ভাষা লিখতে পারতো না অপরদিকে এই ভাষা

শিক্ষা করার প্রতিও তাদের কোনো আগ্রহ ছিলনা। তারা আরবী হরফ সংযুক্ত ফারসী ভাষার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে এবং এভাবেই ফারসী গদ্যের সূত্রপাত হয়।

ফারসী গদ্যের প্রথম পদক্ষেপ 'শাহনামা'। শাহনামা রচনায় যাঁরা সর্বপ্রথম আত্মনিয়োগ করেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মারভ অঞ্চলের মাসুদী এবং বলখের আবুল মু' আইদ এবং আবুল আলী। এ সম্পর্কে আগেও সামান্য ইংগিত দেয়া হয়েছে। এসব ছিল দশম শতাব্দীর প্রথম দিকের কার্যক্রম। এবং এগুলোও কালের কবলে পড়ে অবলুপ্ত প্রায়। দশম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ফারসী গদ্যের উৎকর্ষ সাধিত হয় 'শাহনামা'-এর সংস্কার সাধন কেন্দ্র করে। ৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তুসের শাসনকর্তা আবু মনসুর একদল জোরোষ্টারীয় বুদ্ধিজীবী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের নিযুক্ত করেন ইরানের রাজা-বাদশাহ্‌দের নির্ভরযোগ্য দলিল সম্পৃক্ত 'শাহনামা' রচনা করতে। তাঁরা এই দুরূহ কাজটি সমাপ্ত করলে পরে তা একজন ইরানী মুসলিম পণ্ডিত দ্বারা সংশোধন ও সম্পাদনা করা হয়। এই 'শাহনামা'র ভূমিকা থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি ঃ

'সম্রাট আবু মনসুর তাঁর মন্ত্রী আবু মনসুর আল মু' আম্‌মারীকে আদেশ করলেন 'শাহনামা'র বিভিন্ন রচয়িতাদের নিজ নিজ রচনা দেশের জ্ঞানী-গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের সম্মুখে হাজির করার ব্যবস্থা করার জন্য। সব স্থান থেকেই পণ্ডিত ব্যক্তিরা আগমন করলেন। মাখ, খোরাসান, হেরাত, শাহপুর, সেইস্তান, নিশাপুর, সাদান, তুস প্রভৃতি স্থানের কৃতি সন্তানেরা সবাই একে একে হাজির হলেন। আবু মনসুর তাঁদেরকে নিযুক্ত করলেন ইরানের প্রত্যেকটি রাজা-বাদশাহর জীবনী, ন্যায়-অন্যায়, বিচার-মজলিস, যুদ্ধ-বিগ্রহ, সাহিত্য-সংস্কৃতি, ধর্ম-বিশ্বাস সম্বলিত কাহিনী-গ্রন্থ 'শাহনামা' রচনা করতে। এবং তা সীমাবদ্ধ থাকবে ইরানের সর্বশেষ রাজা ইয়াজদিগিরি পর্যন্ত। বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তিরা কয়েক বছরে ৩৪৬ হিজরী সালের মহরম মাসে এই গ্রন্থ সমাপ্ত করেন এবং এটাও 'শাহনামা' নামেখ্যাত।...'

'শাহনামা' ছাড়া ফারসী গদ্যের উল্লেখে কিছু কিছু অনুবাদের নাম করা যায়। এ সম্পর্কে আবু শাকুর, আবুল মু'আইদ, রোদাকী, দাকিকী এবং আবিসীনা প্রমুখের প্রচেষ্টার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ফারসী সাহিত্যের সূচনা-পর্বে গদ্যরীতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম প্রখ্যাত আরবী ঐতিহাসিক তাবারীর সমগ্র রচনা ফারসীতে অনুবাদ করা এবং এই দুরূহ কাজটি সম্পাদন করেন আবু আলী বা'লআমী।

আবু আলী বা'লআমীর আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান পবিত্র কুরআনের ফারসী অনুবাদ। এটিও প্রখ্যাত ঐতিহাসিক তাবারীর বিজ্ঞানধর্মী গবেষণা সমৃদ্ধ পবিত্র কুরআনের আলোচনার অনুবাদ। উল্লেখ্য যে, এ ব্যাপারেও সম্রাট আবু মনসুরের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল অপরিসীম। তাঁর আদেশেই পবিত্র কুরআনের বিজ্ঞানধর্মী আলোচনার অনুবাদ করা হয়। অনুবাদ করিয়েই ক্ষান্ত হননি, বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি নিয়ে এর নির্ভরযোগ্য দলিল নিরূপণে একটি সম্পাদনা পরিষদও গঠন করেছিলেন।

পবিত্র কুরআন, ইতিহাস ইত্যাদি ছাড়াও ভূগোল, ভেষজবিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক কিছু গ্রন্থও ফারসীতে অনূদিত হয়। এইসব অনুবাদের ভাষা ছিল সহজ, সরল এবং সাবলীল। ফারসী সাহিত্যের সূচনা-পর্বে এগুলোই গদ্যরীতির উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

২

গৌরবময় যুগ

একাদশ শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত ফারসী সাহিত্যের গৌরবময় যুগের সময়সীমা। গজনবী ও সালজুক শাসন আমলেই ফারসী সাহিত্যে চরম উন্নতির পরাকাষ্ঠা লক্ষ্য করা যায়। আরবী সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নতিকল্পে যেমন আব্বাসীয় খলীফা হারুন অল-রশীদ এবং তাঁর পুত্র আল-মামুনের ভূমিকা ছিল অসামান্য তেমনি ফারসী সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিস্তৃতিতেও গজনবী শাসক সুবক্তগীন (মৃত্যু ৯৯৭ খ্রীঃ) এবং তাঁর পুত্র সুলতান মাহমুদ (মৃত্যু ১০৩০ খ্রীঃ)-এর অবদান নিঃসন্দেহে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র ইরানীয় ভূখণ্ড, তুর্কিস্তান এবং সুদূর ভারতবর্ষ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেই তাঁরা ক্ষান্ত হননি, ফারসী সাহিত্য ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যময় ধারাও তাঁরা সমানভাবে প্রবাহিত করেন। সুলতান মাহমুদ যে কতটা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরক্ত ছিলেন তা তাঁর রাজদরবারে আশ্রিত কবি-সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সঙ্গীতজ্ঞ প্রভৃতি গুণী ব্যক্তিদের সমাবেশ থেকেই ধারণা করা যায়। সুদূর আরব ও ভারতবর্ষের পণ্ডিত ব্যক্তিদেরকেও তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করার সুযোগ দিয়েছিলেন। ইরান এবং তুর্কিস্তানের পণ্ডিতদের তো কথাই নেই। পণ্ডিত, দার্শনিক, গবেষক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক এবং সঙ্গীতজ্ঞ ছাড়া সেখানে একমাত্র কবিদের সংখ্যাই ছিল চারশতের উপর। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় তিনি কতোটা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরক্ত ছিলেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফারসী সাহিত্যের গৌরবময় যুগের সময়কাল প্রায় তিনশ' বছর। তিনশ' বছরে ফারসী সাহিত্য জগতে এমন সব কবি-সাহিত্যিক ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের আবির্ভাব ঘটেছে যাদের সম্পর্কে বলতে গেলে বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। ফারসী সাহিত্যের অমর ভাষ্যকার আসাদীর 'তারিখ-ই-গুজিদা', 'গুরসাস্প নামা', আওফীর 'লুবাব', নিজাম-ই-আরোদীর 'চাহার মাকালা' ইত্যাদি সংকলন গ্রন্থে যেসব কবি-সাহিত্যিকদের সমালোচনা স্থান পেয়েছে তাতে তাঁদের সংখ্যা কয়েক হাজার। আলোচনার পরিসীমা বৃদ্ধি না করে আমরা এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করবো মাত্র।

গৌরবময় যুগের কবিদের মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় আবুল কাশিম ফেরদৌসীর। খোরসানের তুস নগরের নিশাপুরে ৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর কবি প্রতিভা সম্পর্কে সুন্দর একটি কাহিনী আছে। ফারসী সাহিত্যের তিনজন প্রখ্যাত কবি উন্‌সুরী, আরসাদী এবং ফারুকী একদিন গজনীতে আলাপে মত্ত এমন সময় নিশাপুর থেকে একজন আগন্তুক এসে তাঁদের কাছে বসলেন। উনসুরী তাঁর আগমন এবং তাঁদের সঙ্গে যোগদান করা খুব পছন্দ করলেন না। তিনি সোজা বলেই ফেললেন, 'ভাই আমরা রাজ-কবি। কবি ছাড়া কেউ এসে আমাদের সঙ্গলাভ করুক এটা আমরা পছন্দ করি না। ঠিক আছে, আমরা তিন কবি তিনটি 'মিসরা' তৈরী করবো, চতুর্থ 'মিসরা' যদি আপনি মিল সহযোগে সন্নিবেশ করতে পারেন তবে আপনি এখানে থাকতে পারবেন, নতুবা নয়।' আগন্তুক অর্থাৎ কবি ফেরদৌসী কাব্য-যুদ্ধে রাজী হয়ে গেলেন। উনসুরী ভাবলেন তাঁরা এমন তিনটি 'মিসরা' বা লাইন বলবেন যাতে চতুর্থ লাইন মিল সহকারে সংযোগ করা তাঁর পক্ষে মোটেই সম্ভব না হয়। তিনটি সোজা লাইনের কথা চিন্তা করে উনসুরী ভাবলেন, অপর দুইজন অর্থাৎ আরসাদী এবং ফারুকী অবশ্যি সফলকাম হবে কিন্তু আন্তঃমিলের চতুর্থ লাইন সংগ্রহ করা মোটেই সম্ভব নয়। উনসুরী শুরু করলেন ঃ

উনসুরী ॥ তোমার ও চোখ জোড়া আলো নীল সমুদ্রের জল ;
আরসাদী ॥ মায়াবী চাহনী জুড়ে আছে আহা যাদু যে কেবল,
ফারুকী ॥ ও যখম সারাবে না কোনোদিন ঔষধ তরল ,
ফেরদৌসী ॥ বাঁকানো ধনুক থেকে ছুঁড়ে শুধু তীরের অনল।

উনসুরী অবাক বনে গেলেন এবং তাঁর কাব্য প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে সুলতান মাহমুদের দরবারে হাজির করে বললেন, 'ইনিই একমাত্র প্রতিভাধর কবি যাঁর পক্ষে 'শাহনামা'র কাব্যরূপ দেওয়া সম্ভব।' উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী আলোচনায় 'শাহনামা'র সংস্কারসাধন সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করা হয়েছে। আরও বলা যায়, সাসানীয় শেষ সম্রাট ইয়াজদীর্জাদ পারস্যের রাজা-বাদশাহর কাহিনী, জনশ্রুতি, ঘটনা ইত্যাদি সংগ্রহ করে 'সিয়ারুল মুলুক' অথবা 'বোস্তান নামা' নামে অভিহিত করেন। দশম শতাব্দীতে সামানীয় সম্রাট আবু মনসুর 'সিয়ারুল মুলুক' অথবা 'বোস্তান নামা' সংশোধন করে 'শাহনামা'য় রূপ দেওয়ার জন্য দেশের বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তিদের নিযুক্ত করেন। কয়েক বছরে গ্রন্থটি সমাপ্ত হলে আল-মোরী নামক জনৈক ঐতিহাসিক দ্বারা সম্পাদনা করে তা গদ্যে লিখিয়ে নেন। এ সম্পর্কে আগেও বলা হয়েছে। যাহোক, দাকিকীর উপর ন্যস্ত করা হয় এর কাব্যরূপ দেওয়া। কিন্তু দাকিকী তাঁর কৃতদাসের হাতে নিহত হলে এই দুরূহ কাজ অসমাপ্ত থেকে যায়। কারণ মাত্র দু'হাজার লাইন সমাপ্ত করার পর পরই তাঁর মৃত্যু ঘটে। তখন এই দায়িত্ব অর্পণ করা হয় উনসুরীর উপর। উনসুরী যখন স্ব-ইচ্ছায় ফেরদৌসীকে সুলতান মাহমুদের কাছে হাজির করলেন এবং তাঁর কাব্য-প্রতিভা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন তখন সুলতান মাহমুদ সম্পূর্ণ শাহনামার কাব্যরূপ দেওয়ার ভার অর্পণ করলেন ফেরদৌসীকে। ফেরদৌসীর নিজের বক্তব্যে জানা যায় ঃ

কি না করেছি আমি এ সুদীর্ঘ তিরিশ বছরে,
ফার্সীর সৌন্দর্যে আজ এই দেশ আছে রূপে ভরে।
রোদ-বৃষ্টি ঝড়ে জানি সুরম্য প্রাসাদ পায় লয়,
এ-কাব্য প্রাসাদ মোর কোনোদিন হবে না বিলয়।

'বিলয়' হয়নি। পৃথিবী যতদিন আছে 'শাহনামা'র ফেরদৌসীকে কেউ মুছে ফেলতে পারবে না। উল্লেখ্য যে, ষাট হাজার ছত্র বিশিষ্ট 'শাহনামা'র কাব্যরূপ সম্পন্ন করে যখন ফেরদৌসী তা সুলতান মাহমুদকে উৎসর্গ করতে যাবেন তখন জানতে পারলেন যে, সুলতান তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে অনীহা প্রকাশ করেছেন। কেননা, প্রতিটি ছত্রের জন্য যেখানে তিনি স্বর্ণমুদ্রা দিতে চেয়েছিলেন সেখানে তিনি রৌপ্য মুদ্রা দিতে উৎসাহী। এতে ফেরদৌসীর উৎসাহে ভাঁটা পড়লো এবং তিনি 'শাহনামা'য় যুক্ত করলেন সুলতানের প্রতি ব্যঙ্গধর্মী উক্তি। 'শাহনামা'র সমাপ্তি ঘটেছে এভাবে ঃ

তোমার জনক যদি সুলতান, সুমহান অতি,
এবং তোমার মাতা রাজকীয় গুণে গুণবতী---
তাহলে কবির ভাগ্যে হতো না এমন বিড়ম্বনা,
সম্মান ও পুরস্কার অন্ততঃ জুটতো এক কণা।
রাজকীয় জন্মসূত্র যদিবা থাকতো সে তোমার,
কি করে অবজ্ঞা করো অমূল্য এ কবিতার হার।
তোমার জনম সেতো অতি নীচ কামারের ঘরে,
এখন ঘোরাও তুমি রাজদণ্ড সবার উপরে।
হায়রে দুর্ভাগ্য, আহা! মন্দ থেকে আসে না যে ভালো,
অত্যাচারী রাজা কভু দিতে পারে উচ্চাশার আলো!
জল কি পেরেছে কভু ইথুপীয় শ্বেত মুছে দিতে?
কেউ কি পেরেছে কভু রাত্রি থেকে অন্ধকার নিতে?
যে গাছে মাকাল ধরে জানি জানি তেতো সে মাকাল,
স্বর্গে গেলেও তেতো থাকে, এতটুকু বদলে না হাল।
হীন মন যদি কভু দুষ্ট গতি একা বদলায়,
হীন থেকে হীন হয়ে হীন পথে শুধু সে যে ধায়।
দুধের নহর যদি স্বর্গ পথে নদী হয়ে চলে
সে ধারা সুতীব্র হয়ে মধুর মধুর কথা বলে।
অত্যাচারী রাজা যদি গরীবের রক্ত খায় চুষে,
অপযশ তার ভাগ্যে, মন্দ কয় সকল মানুষে।

ফেরদৌসীর ভাগ্যে বিড়ম্বনা দেখা দিল। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা সুলতানের কান ভারী করলে তাঁর জীবন সেখানে দুর্বিষহ হয়ে উঠল। তিনি শেষ পর্যন্ত গজনী ত্যাগ করে হেরাতে চলে গেলেন। হেরাত এবং তুসে কিছুদিন অবস্থানের পর তিনি পাড়ি জমালেন কাস্পিয়ান সাগর তীরবর্তী তাবারিস্তানে। সেখানে তিনি সুলতানকে 'শাহনামা' প্রদান করবেন বলে স্থির করলেন। কিন্তু কিছুই হলো না। পরে তিনি তুসে প্রত্যাবর্তন করলেন।

শাহনামার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি ছত্র সোনায়-মোড়ানো দামী হার সদৃশ। সুলতানের প্রধান মন্ত্রী মেমান্দি একথাই সুলতানের কানে দিয়ে বললেন: 'থাক না সামান্য ব্যঙ্গোক্তি, খাদ না থাকলে সোনা শক্ত হয় না। এবং সেই স্বর্ণখচিত মূল্যবান বস্তুই কবি এনেছিলেন আপনাকে উপহার দিতে।'

সুলতান কবির প্রতি অবিচার করেছেন বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে তিনি ষাট হাজার স্বর্ণমুদ্রা কবিকে উপহার দেওয়ার জন্য কারাভাঁ পাঠালেন। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, কারাভাঁ পেঁৗছে দেখে ততক্ষণে কবির লাশ কাফন পরিবৃত করে দাফন করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এ ঘটনা ঘটে ১০২০ থেকে ১০২৫ সালের মধ্যে।

'শাহনামা' ছাড়াও তাঁর অমর গীতিকাব্য 'ইউসুফ জোলায়খা'। কিন্তু শাহনামার সঙ্গে এর কোনো তুলনা হয় না। উল্লেখ্য যে, ফারসী সাহিত্যে অজস্র কবি থাকলেও সাতজন কবির কাব্য-কর্ম আজ পর্যন্ত কেউ অতিক্রম করতে পারেননি এবং তাঁদের কাব্য-ফসল মহাকালের ধাক্কায় কোনোদিন বিনষ্ট হবে না। এই সাত-জন কবি হলেন ফেরদৌসী, আনওয়ারী, নিজামী, জালালুদ্দিন রুমী, শেখ সাদী, হাফিজ এবং জামী। ফেরদৌসীর সেই অমর কাব্য ফসলই 'শাহনামা'।

গজনবী শাসন আমলের আর একজন উল্লেখযোগ্য কবি উনসুরী। ইতিপূর্বে আমরা লক্ষ্য করেছি মহাকবি ফেরদৌসীর সঙ্গে উনসুরীর নাটকীয়ভাবে পরিচয় ঘটে এবং সুলতান মাহমুদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটানোর মূলেও রয়েছেন উনসুরী। এবং উনসুরী ছিলেন সুলতান

মাহমুদের অন্যতম সভাকবি এবং শাহনামার কাব্যরূপ দেওয়ার দায়িত্ব ফেরদৌসীর আগে তাঁর উপরও পড়েছিল। প্রখ্যাত সাহিত্যিক সমরখন্দের নিজাম-ই-আরোদীর 'চাহার মাকালা' গ্রন্থের তথ্য অনু-সারে উনসুরী রাজ-কবি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন সুলতানের ভ্রাতা আমির নাসর-এর মাধ্যমে। আমির নাসর ছিলেন সুলতান মাহমুদের সেনাধ্যক্ষ এবং উনসুরীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। উনসুরী ছিলেন সুলতানের অত্যধিক প্রিয়ভাজন কবি।

উনসুরীর কবি-খ্যাতি সম্পর্কে একটি সুন্দর কাহিনী আছে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধনী ব্যবসায়ীর পুত্র। পিতৃসূত্রে তিনিও ব্যবসায় করতেন। একবার তাঁর ধনসম্পদ ভর্তি কারাভাঁ ডাকাত কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে সব লুট হয়ে যায় এবং তিনি আর ব্যবসায় করবেন না বলে স্থির করলেন। পরে তিনি আরবী ও ফারসী উভয় ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন কাব্য রচনায় এবং শেষ পর্যন্ত তিনি সফলকামও হলেন। রাজকবি হওয়ার সৌভাগ্যও তাঁর হলো। কিন্তু এ সৌভাগ্যকে তিনি মনের দিক দিয়ে স্বীকার করেন নি। নিজের সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য ঃ

কি জন্য এসেছি আমি স্বার্থপর পৃথিবীর বুকে ?
আত্মা ও জিহ্বাকে আমি পেয়েছি কি সাফ করে নিতে ?
প্রথম, নিজেকে রাখি প্রেয়সীর হাতে নিয়োজিত,
দ্বিতীয়, রাজার জন্যে রাতদিন স্তুতিবাক্য লিখি।

উনসুরীর কাব্য-প্রতিভা ছিল অসামান্য। খণ্ড-কবিতা, দীর্ঘ-কবিতা এবং গীতি-কবিতা বা গজল মিলিয়ে তাঁর কবিতার সংখ্যা দু'হাজারের উপরে। তাঁর কাব্য সংকলনের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'ওয়ামিক ওয়া আজরা।' এ কাব্যের বিস্তৃত অংশ জুড়ে সুলতান মাহমুদের বিজয় অভিযান কীর্তিত হয়েছে। ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দে উনসুরীর মৃত্যু ঘটে।

উনসুরীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং ফেরদৌসীর সঙ্গে কাব্য-যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া সেই স্থানের ফারুকীও প্রতিভাধর কবি। ফারুকীও সুলতান মাহমুদের রাজদরবারের অন্যতম সভাকবি ছিলেন। কাব্য-চর্চা ছাড়াও

তিনি ছিলেন একজন সুগায়ক। নিজের গজল-গীতিতে সুর আরোপ করে নিজেই যন্ত্রসহকারে গাইতেন এবং এজন্য তিনি সুলতানের অত্যধিক প্রিয়পাত্র ছিলেন। রাজ-কবির আসনে অলঙ্কৃত থাকার সুবাদে এবং সুলতানের প্রিয়পাত্র হওয়ার গৌরব অর্জন করায় তিনি সুলতানের রাজনৈতিক উপদেষ্টার কাজও করেছেন।

তাঁর অধিকাংশ কবিতায় প্রেম, প্রকৃতি, গজনীর রূপমাধুর্য এবং সুলতান মাহমুদের গৌরবময় কীর্তি ইত্যাদি বিষয় স্থান পেয়েছে। তাঁর কাব্য-প্রতিভার জন্য তাঁকে ফারসী কাব্য সাহিত্যের 'আল-মুতানাব্বী' বলা হতো। আল-মুতানাব্বী আব্বাসীয় যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আরবী কবি। প্রকৃতি বর্ণনায় কবির চিত্রকল্প এবং প্রকাশভঙ্গী লক্ষ্য করবার মতো। 'চলমান মেঘ' শীর্ষক কবিতাটির কিছু অংশের অনুবাদ এখানে পেশ করছিঃ

নীলাভ সাগর থেকে নীল মেঘ উঠেছে আকাশে,
প্রেমিকের ভাবনাগুলো ঘোরেফিরে এদিক ওদিক।
এতটুকু স্বস্তি নেই, খোঁজে তার প্রেমিকা কোথায়।
তবে কি এ ক্ষিপ্রমাণ সমুদ্রের কি উত্তাল গতি ?
অথবা আঁধার ঘেরা ঝড়ের তাণ্ডব লীলা খেলা ?

কবিতা ছাড়া ফারুখীর ছন্দঃপ্রকরণ সম্পর্কিত গবেষণা সমৃদ্ধ গ্রন্থ 'তারজুমানুল বালাগাত' ফারসী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এতে তিনি ফারসী কবিতার প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে তাঁর কালক্রম পর্যন্ত ছন্দরীতির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেছেন। আরোদীর 'চাহার মাকালা' গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী 'তারজুমানুল বালাগাত' দুর্ভাগ্য বশত বিনষ্ট হলেও তার কিছু অংশ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

এগার শতকের প্রথমার্ধের কবি মানুচেহ্‌রীও ফারসী কাব্য-আকাশের অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র। খোরাসানের দেমাঘান শহরে তাঁর জন্ম। সুলতান মাহমুদের পুত্র সুলতান মাসুদ প্রথম-এর রাজত্বকালে মানুচেহ্‌রী কাব্যজগতে খ্যাতি অর্জন করেন এবং সভাকবি হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। আরবী ভাষায় তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। ফলে তাঁর কবিতায়ও

আরবী কাসিদার প্রভাব লক্ষণীয় হয়ে দাঁড়ায়। দুঃখবাদের কোনো স্থান তাঁর কবিতায় অনুপস্থিত। তাঁর মতে কবিতা আনন্দ উৎসারিত। কাজেই, কাব্য-ভাবনায়ও থাকবে আনন্দের প্রতিধ্বনি। তাঁর বর্ণনায় কোথাও প্রেয়সীকে নিঃসঙ্গ রাখা বা ছেড়ে যাওয়া অথবা বিদায় ইত্যাদির লক্ষণ নেই। আরব কবিদের মতো তাঁর বর্ণনায়ও কারাভাঁ, প্রেয়সীর বাসভুমি, উট, ঘোড়া ইত্যাদিও স্থান পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, দুঃখবাদ বা নৈরাশ্যবাদে তাঁর আস্থা না থাকলেও নিয়তিবাদ বা ফ্যাটলিজমকে তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি। তিনি বলেন ঃ

আমার প্রেয়সী, তুমি শোনো—
আমিত হতাশ নই প্রেমের জগতে।

সুপ্রাচীন কাল থেকে শুনি ঃ
'বিরহ মধুর করে প্রেমের বৈভব,'
এ বাক্যে আস্থা আমি রাখিনা কখনো।

নিয়তি কখনো খেলে জানি
মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুলতান মাহমুদের পৃষ্ঠপোষকতায় চারশত কবি গজনী রাজদরবার মুখরিত করে রেখেছিলেন। এঁদের মধ্যে মারভ অথবা হেরাতের আসজাদী, তুসের আসাদী, তেহরানের গাজায়েরী এবং মাহনার আবু সাঈদ আবুল খায়ের প্রমুখ প্রায় সমগোত্রীয় এবং উনসুরী, ফেরদৌসী এবং দাকিকীর সমসাময়িক কবি। এঁরাও ছিলেন প্রতিভাধর এবং নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। ফেরদৌসীর সঙ্গে কাব্য-যুদ্ধে অবতীর্ণ রত আসজাদীর কাব্যপ্রতিভা সম্পর্কে মাত্র একটি লাইনেই আমরা প্রত্যেক্ষ করেছি।

আসাদীর কাব্যরীতিতে রচিত 'শাহনামা'র উল্লেখও আমরা পেয়েছি। কাব্যরীতিতে রচিত 'শাহনামা' ছাড়াও আসাদীর 'গুরসাসপ নামা' ফারসী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলে বিবোচিত। যতদূর

জানা যায়, এই আসাদী মহাকবি ফেরদৌসীর শিক্ষক ছিলেন এবং গজনী দরবারের অত্যধিক জনপ্রিয় কবি ছিলেন। সুলতান মাহমুদ তাঁকে শাহনামার কাব্যরূপ দেওয়ার অনুরোধ জানালে বার্ধক্যের অজুহাতে তিনি অপারগতা জ্ঞাপন করেছেন। কিন্তু সুযোগ্য শিষ্য ফেরদৌসীর অনুরোধে তিনি ফেরদৌসীকে শাহনামার অনুবাদে সাহায্যদান করেছিলেন। এই সাহায্য ফেরদৌসীর অন্তিম সময়ে করা হয়েছিল।

ফেরদৌসী তখন তুসনগরে শয্যাশায়ী। তিনি ওস্তাদকে বলে পাঠালেন; 'আমি কতদিন বাঁচবো জানি না। কিন্তু শাহনামার কিছু কাজ অসমাপ্ত রয়ে গেলো। আপনি ছাড়া আর কাউকে আমি এ কাজের জন্য উপযুক্ত বিবেচনা করিনা।'

আসাদী শিষ্যের অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন এবং দুই দিনে চার হাজার ছত্র লিখে দিয়েছিলেন। এজন্য ফেরদৌসী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

আসাদীর কাব্য-কর্মের উল্লেখে তাঁর 'দিবা-রাত্রির ঝগড়া' শীর্ষক কবিতা থেকে কিছু অনুবাদ পেশ করছি ঃ

দিবস চিত্রিত করে এ আকাশ নীল রং দিয়ে,
তারার মালিকা দিয়ে রাত্রি রাখে আকাশ সাজিয়ে;
মানুষ সময় গুণে প্রতিটি চাঁদের পরিমাপে,
রাতের চাদর পুড়ে দিবস সে নিজের উত্তাপে।
কর্মের বেসাতি নিয়ে দিন আসে মানুষের ঘরে ;
শান্তিতে বিশ্রাম নেয় মানব রাতের অবসরে।
যদিও সে কর্মে ভরা, দিনের তারিফ নেই জানা,
ভক্তের সোহাগ রাত্রি, ছায়া মেলে জিব্রীলের ডানা।

কিন্তু মাহনা অঞ্চলের আবু সাঈদ আবুল খায়ের তাঁর কাব্য-ধারা ভিন্নখাতে প্রবাহিত করেছেন। তাঁর কাব্য-ভাবনায় সূফীবাদ প্রকট এবং প্রত্যেকটি 'রুবাই' যেন এক একটি মুক্তো খণ্ডের মতোই উজ্জ্বল। তাঁর কবিতায় আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ ছাড়াও রয়েছে প্রেমিক-

প্রেমিকার মিলনের আর্তি। তাঁর বিভিন্নধর্মী কয়েকটি রুবাইয়্যাতের অনুবাদ এইরূপ ঃ

১. চোখ

আমার দুচোখ জুড়ে তোমার দৃষ্টির ছায়া আছে,
তাই চোখ ভালোবাসি তোমাকে যে পেয়ে এতো কাছে,
কি করে পৃথক করি তোমাকে আমার চোখ থেকে
চোখ যাক, তুমি থাকো—খুশীতে আমার প্রাণ নাচে।

২. আত্মা

সকালের মৃদু হাওয়া এনেছে আত্মায় তব ঘ্রাণ,
এই ঘ্রাণ খুঁজে ফিরে কোথায় রয়েছে তব প্রাণ ;
ভুলে গেছি সব আমি এ হৃদয়ে নেই কিছু আর,
ঘ্রাণেই পেয়েছি সব, আমি তাই পেয়েছি যে ত্রাণ।

৩. চালক

আল্লাহ্, পাঠাও তুমি, বিশ্বের চালক একজন---
এবং পাঠাও মশা ; নমরুদ সবাই এখন ;
অত্যাচারী ফেরাউন এখানের প্রতি ঘরে ঘরে
নীল নদ আজো আছে, এখন মূসার প্রয়োজন।

৪. ঝাড়ু

সমাজের ময়লা নিতে শক্ত এক ঝাড়ু দরকার,
হাতুড়ির প্রয়োজন উঁচুনীচু এক করবার ;
কতকাল দেখি বলো একঘেয়ে এই রীতি-নীতি ?
কেয়ামত ছাড়া বুঝি হবে নাকো উত্থান আবার।

আবু সাঈদ আবুল খায়ের আশি বছর বয়সে ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মৃত্যু বরণ করেন। সুদীর্ঘ জীবনকালে ফারসী সাহিত্যে রেখে গেছেন তিনি অমূল্য সম্পদ। ফারসী সাহিত্যের বিস্তৃত অংশ জুড়ে রয়েছে 'সূফী' প্রভাব। সূফীবাদের বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে সংক্ষেপে বলা যায় সূফীবাদীরা প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে আল্লার অস্তিত্ব কল্পনা করেন এবং নিজেদের সত্তা প্রেমময় আল্লার সঙ্গে মিশিয়ে

দেওয়ার পক্ষপাতী। ২৪৫ হিজরী সালের প্রখ্যাত সূফী প্রবক্তা জুন নুন মিসরীর মন্তব্যের বরাত দিয়ে আর. এ. নিকলসন উল্লেখ করেছেন, 'The Sufis are folk who have preferred God to everything, so that God has preferred them to everything.' এই আধ্যাত্মিক চিন্তা ফারসী-কাব্যের বিস্তৃত অংশ জুড়ে ভাস্বর হয়ে আছে। একাদশ শতকের প্রথমার্ধের কবি বাবা তাহির-এর সামগ্রিক কাব্য-কর্মে এই সূফী-প্রভাব বর্তমান। আসলে তিনি ছিলেন একজন সূফী-সাধক এবং সংসারবিরাগী দরবেশ। আল্লাহ্ যদি সর্বত্র বর্তমান এবং সর্বদ্রষ্টা তবে কাপড়ের আবরণ দিয়ে নিজেকে ঢেকে রেখে কি লাভ? এই মতবাদে আস্থা রেখে তিনি কাপড় পরতেন না বলে জনশ্রুতি আছে এবং এজন্য তাঁকে 'ল্যাংটা দরবেশ' বলা হতো। বাবা তাহিরের অধিকাংশ কবিতাই পারস্যের আঞ্চলিক 'লুরি' ভাষায় রচিত এবং কবিতাগুলো আধ্যাত্মিক ভাবনায় জারিত। গজল ও রুবাইধর্মী তাঁর বহু কবিতা বিভিন্ন সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দু'একটা উদাহরণ দেয়া যাক ঃ

১. আত্মা ও প্রেমিকা

আমার আত্মায় যদি আমার প্রেমিকা বাস করে
তাহলে এ আত্মা 'প্রেমিকা' আমার।
আমার প্রেমিকা যদি আমার এ 'আত্মার' স্বরূপ
তা'হলে বা 'আত্মা' বলি কেন?
প্রেমিকা-আত্মায় আমি বিভেদ দেখিনা—
আত্মা ও প্রেমিকা এক—এই জানি আমি।

২. মালী

হায়রে মালী! তোমার বাগান ফুলে ভরা,
তোমার হাতে ফোটাও সে ফুল সযতনে
আবার তুমি নিজেই তোলো আপন মনে।
হায়রে মালী! তোমার বাগান ফুলে ভরা!

গজনবী শাসন আমলের আর একজন উল্লেখযোগ্য কবি নাসির খসরু। বলখের কুবাদিয়ান শহরে ১০০৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। তিনি যেমন বৈচিত্র্যময় জীবনের অধিকারী ছিলেন তেমনি তাঁর সাহিত্য-কর্মও বিচিত্র স্বাদে ভরপুর। আরবী ও ফারসীতে উচ্চশিক্ষা লাভ করে প্রথমে গজনবী ও পরে সালজুক সরকারের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চাকরি ইস্তফা দিয়ে মক্কায় চলে যান। তিনি ইসমাইলীয়া সম্প্রদায়ভুক্ত সিয়া-পন্থী মুসলমান ছিলেন। কয়েক বছর মিশরে কাটানোর পর তিনি নিজ মতবাদ প্রচার মানসে খোরাসানে ফেরত আসলে সালজুক কর্তৃপক্ষের বিরোধিতায় তাঁকে খোরাসান ছেড়ে চলে যেতে হয়। তখন তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন বাদাখশানের পার্বত্য অঞ্চলে। এবং এই বাদাখশানেই ১০৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

নাসির খসরু ছিলেন অত্যধিক প্রতিভাশালী কবি। যতদূর জানা গেছে তাতে তাঁর সর্বমোট কবিতার সংখ্যা তিরিশ হাজার এবং এগুলো তাঁর কয়েক খণ্ড 'দিওয়ান' এবং 'রওশন নামা' গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। তিনি একাধারে কবি, দার্শনিক এবং ধর্মপ্রচারক। কাজেই তাঁর কাব্যাদর্শে একদিকে যেমন দর্শনতত্ত্ব ভারাক্রান্ত অপরদিকে তেমনি ধর্মীয় উপদেশে বাঙ্ময়। এখানে তাঁর দুটো খণ্ড কবিতার অনুবাদ পেশ করছি ঃ

১. বলখের উদ্বেগ

বলখের স্নিগ্ধ হাওয়া, শোনো তুমি আমার মিনতি,
আমার দেশের দিকে ফিরাও না তোমার ও গতি!
সেখানে দেখবে তুমি কি ঘটেছে আমার সে দেশে---
অত্যাচার অবিচার সেইখানে আছে আহা মেশে!
সময়ের নগ্ন হাত বিনষ্ট করেছে ঘর বাড়ী---
দুঃখের কি দীর্ঘশ্বাস! চারদিকে শুধু আহাজারি।
দ্যাখোনা আমার ভাই আমাকে চিনতে পারে কিনা
নাকি সে বলেই ফেলে, 'আমি তাকে কখনো চিনি না।'

২. অন্তর্দৃষ্টি

অন্তরের চোখ মেলে পৃথিবীর রহস্যে তাকাও,
বাইরের দৃষ্টি দিয়ে সে রহস্য যায় না যে দেখা ;
এ পৃথিবী মই যেন উচ্চ এক পৃথিবীতে যেতে,
সে কৌশল হয় যেন আমাদের সকলের শেখা।

নাসির খসরুর গদ্যে হাত ছিল অতি চমৎকার। বিভিন্ন বিষয়-ভিত্তিক তাঁর গদ্য রচনার পনেরোটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে 'সফরনামা' আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী। পবিত্র মক্কা, মদিনা, জেরুজালেম, মিশর ইত্যাদি স্থান পরিভ্রমণ করে যে অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছিলেন তারই চিত্র এবং প্রতিচিত্র পরিবেশন করেছেন 'সফরনামা' গ্রন্থে। গ্রন্থটির ভাষা সহজ, সরল এবং প্রাঞ্জল। গ্রন্থটি বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

নাসির খসরুর সমসাময়িক আর একজন খ্যাতিমান কবি খাজা আবদুল্লাহ্ আনসারী। খাজা আবদুল্লাহ্ আনসারী বয়সে নাসির খসরুর চেয়ে দুই বছরের ছোট থাকলেও তিনি বেঁচে গেছেন নাসির খসরুর চেয়ে প্রায় তিরিশ বছর বেশী। অর্থাৎ খাজা আবদুল্লাহ আনসারীর জন্ম ১০০৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ১০৮৮ খ্রীষ্টাব্দে। খোরাসানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সূফীকবি বলে তিনি খ্যাত। সূফীদর্শনে নিজস্ব মতবাদ তৈরী করতে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন এবং এজন্য তাঁর শিষ্য-সেবকও জুটেছিল বহু। সূফীতত্ত্বের উপর তাঁর গবেষণামূলক গদ্য রচনাও রয়েছে বেশ কয়েকটি। তিনি আরবী ভাষায়ও প্রচুর লিখেছেন। দর্শনতত্ত্ব-সমৃদ্ধ তাঁর কয়েকটি কবিতা এইরূপ ঃ

১. প্রেমের পথে

তোমার ইচ্ছায় আমার এ পথ চলা,
আমার জীবন তোমার কথাই বলা,
প্রহরী কিসের ? ওসব চাইনা আমি,
জীবন সঁপেছি, সেইতো আমার দামী।

২. স্বর্গীয় প্রেম

তোমার প্রেমে কখনো পাগল হই
কখনো আনি বিজয়ের বেশে রই।
তোমার কথা ভাবতে গিয়ে প্রভু,
এইতো আছি এইতো নাই কভু।

৩. জীবন রহস্য

সুদূর অতীতে আমি কিছুই ধরি নি
আজকেও ভালো কাজ মোটেই ধরি নি ;
আগামী দিনও যাবে হেলা ফেলা করে
তাহলে এসেছি কেন পৃথিবীর ঘরে ?

৪. উৎসর্গই প্রেম

যে একা নির্বিঘ্নে ঘোরে প্রেমের প্রাসাদ কেন্দ্র করে,
প্রেমের সুতীক্ষ্ণ বাণে নিঃশেষ হবেই তার প্রাণ ;
প্রেমের এ-কাব্য গ্রন্থে লিখলাম এই কথা আমি ;
'প্রেমিক কখনো জানি মরণের পয়োয়া করেনা।'

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, গজনবী শাসকগোষ্ঠী কেবল সুদূর ভারতবর্ষ পর্যন্তই তাঁদের রাজ্য বিস্তার করেননি, ফারসী সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রাণবন্ত ধারা ভারত পর্যন্ত প্রবাহিত করেছিলেন। এ ধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অবগাহন করেছিলেন ভারতের অসংখ্য কবি। এর মধ্যে রৌনা অঞ্চলের আবুল ফারাজ এবং লাহোরের মাসুদ সা'দ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে আবুল ফারাজ গজনীর সুলতান ইব্রাহিম এবং পরবর্তীকালে সুলতান ইব্রাহিমের পুত্র সুলতান মাসুদ দ্বিতীয়-এর রাজদরবারে যোগদান করেন। আবরী, ফারসী ভাষা ছাড়াও তিনি অনেক আঞ্চলিক ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। দর্শন ও বিজ্ঞানেও ছিল তাঁর অগাধ জ্ঞান। পূর্ববর্তী অনেক কবিদের মতবাদ উপেক্ষা করে তিনি ফারসীতে প্রচলিত আরবী শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। উপমা, উৎপ্রেক্ষা এবং চিত্রকল্পের মাধ্যমে তিনি কাব্যকর্ম করেছেন জীবন্ত

ও প্রাণবন্ত। তাঁর 'দিওয়ান-ই আবুল ফারাজ' কাব্য-সংকলনে প্রায় দুই হাজার কবিতা সংকলিত হয়েছে। তাঁর দুটো কাতরা এখানে উদ্ধৃত করছি ঃ

১. সুরা ও সাকী ছাড়া কিছুই বুঝি না,
মৃত্যুর মুহূর্তে আমি পেতে চাই প্রাণবন্ত সুরা ;
এটাই কামনা ছিল একমাত্র আমার জীবনে—
বাকী সব দুর্ঘটনা, তাছাড়া কিছু না।

২. হে আমার প্রিয়তমা, তোমার রক্তিম দুই ঠোঁটে
আমার জীবন যেন। তাছাড়া দুঃখের রাতদিন ;
আমার নিশ্বাস জুড়ে মরুভূর লু'হাওয়া ছোটে
এবং দু'চোখ যেন উত্তাল নদীর স্রোতোধারা।

আগুনে না পুড়লে যেমন স্বর্ণ খাঁটি হয় না, তেমনি অভিজ্ঞতার আগুনে পুড়ে মাসুদ সা'দ হয়েছিলেন খাঁটি সোনা। ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে তাঁর জন্ম। আরবী, ফারসী, হিন্দী ও উর্দু এই চার ভাষায় ছিল তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য। প্রায় সত্তর বছর জীবনকালের আঠারো বছর তাঁর কেটেছে কারাবরণ করে। সুলতান ইব্রাহিমের পুত্র মাহমুদ রাজরোষে পতিত হয়ে যখন কারাবরণ করেন তখন তাঁর সঙ্গে মাসুদ সা'দও সঙ্গী হন। দশ বছরকাল কারাভোগ করার পর তিনি মুক্তি পেয়ে পাঞ্জাবের শাসন কর্তা নিযুক্ত হন কিন্তু রাজনৈতিক কারনে আবার তাঁকে জেলে যেতে হয়। সুদীর্ঘ আট বছর কারাভোগের পর তিনি মুক্তি পেয়ে গজনীর সুবৃহৎ পাঠাগারের লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হন এবং ১১২৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু ঘটে। ষোল হাজার কাব্য-সম্ভূত ফারসী কবিতার 'দিওয়ান' ছাড়াও তাঁর আরবী ও হিন্দীতে রচিত দুটো সুবৃহৎ কাব্য-গ্রন্থ আছে। বিষয়বস্তু নির্বাচন, বর্ণনাকৌশল এবং চিত্র-চিত্রণে তাঁর দক্ষতা ছিল অপরিসীম। নিম্নের কাব্যাংশেই তার প্রমাণ মিলবে ঃ

ঈগল পাখীর মতোন তুমি সাহস রাখো বুকে
শিকার এবং বিজয় দুটো আসবে উৎসুকে।
কোকিল অথবা ময়ূর দেখে হয়োনা মশগুল,
সাহস এবং রঙের মাঝে তফাৎ বিলকুল।

গজনবী শাসন আমলে গদ্য রচনার উল্লেখে সর্বপ্রথমেই নাম করতে হয় 'শাহনামা'র। শাহনামার সংস্কার সাধন যদিও গজনবী-পূর্ব যুগে শুরু হয়েছিল কিন্তু গজনবী শাসন আমলেও এটা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়। সম্রাট গেয়োমার্থের বিখ্যাত কাহিনী দিয়ে শুরু করে এর মধ্যে জামশিদ ও জোহহাগ, রোস্তম ও সোহরাব, সিকান্দর বা আলেকজাণ্ডার ইত্যাদি ইতিহাস-খ্যাত রসাত্মক ও বীরত্বপূর্ণ কাহিনীসম্ভারে শাহনামা পরিপূর্ণ। যে অর্থে অষ্টম ও দশম শতাব্দীতে রচিত আরবী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ 'কালিলা ও দিমনা', 'মাকামাতে হামদানী', 'মাকামাতে হারিরী' এবং 'আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা'তে উপন্যাস ও ছোট গল্পের রস খুঁজে পাওয়া যায় সে অর্থে 'শাহনামা'ও ছোট গল্পের সমাহার কিংবা খণ্ড খণ্ড উপন্যাস। ফেরদৌসী তো 'শাহনামা'র কাব্যরূপ প্রদান করে মহাকাব্য করে ফেললেন।

'শাহনামা' ছাড়া গদ্য রচনার উল্লেখে ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, সঙ্গীত ও কাব্যালঙ্কার সম্পর্কিত গবেষণাধর্মী বিষয়-বস্তুর নাম করা যায়। তাছাড়া আরবী সাহিত্যের কিছু ফারসী অনুবাদও এর অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে উল্লেখিত গজনবী শাসন আমলের প্রখ্যাত কবিদের অনেকেই তাঁদের কাব্য চর্চার পাশা-পাশি গবেষণামূলক গদ্য রচনায়ও আত্মনিয়োগ করেছেন এবং অনেকে আবার দুই ভাষায়ই পাণ্ডিত্য থাকার দরুন তাঁদের মূল আরবী রচনা ফারসীতে রূপান্তরিত করেছেন। প্রখ্যাত দার্শনিক ও কবি আবিসীনা তার অন্যতম নজির। এ সম্পর্কে আগেও উল্লেখ করা হয়েছে। একই ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে ফারুকী, নাসির খসরু, খাজা আবদুল্লাহ্ আনসারী, আসাদী প্রমুখের মধ্যে।

ফারুকীর 'তারজুমানুল বালাগত' (বাগ্মিতার মুখপাত্র), আসাদীর 'গুরসাস্প নামা' ও 'তারিখ-ই-গুজিদা', নাসির খসরুর 'সফর নামা' ইত্যাদি সম্পর্কে আগেও বলা হয়েছে।

প্রখ্যাত দার্শনিক ও জ্যোতির্বিদ আল-বেরুণী তাঁর জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত গ্রন্থ সমূহ প্রথমে ফারসী ভাষায় রচনা করেছিলেন এবং পরে সেসব আরবী ভাষায় রূপান্তরিত করা হয়। ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দ সময়কালের মধ্যে এই কাজ সম্পাদন করা হয়। বলা যায় যে. আল-বেরুণীর 'জ্যোতির্বিদ্যা প্রদর্শক' গ্রন্থ খারজমীয়ান রাজকুমারীর অনুরোধে রচিত হয়।

অন্যান্য গদ্য রচনাগুলো ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি ও ধর্মীয় আদেশ নির্দেশ সম্পর্কিত। এ সবের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় উপদেশ ও আচার পদ্ধতি সম্পর্কিত কায়কাউসের 'কাবুস নামা', আবদ-উল-হাই গারদিজীর 'খাবরীন', আবুল ফজল বায়হাকীর 'তারিখ-ই-গজনবী', হুজবিরীর সূফীতত্ত্ব সম্পর্কিত 'খোলাসাতুল সের' প্রভৃতি।

উপরিউক্ত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে আবুল ফজল বায়হাকীর 'তারিখ-ই-গজনবী' নানা কারণেই উল্লেখের দাবি রাখে। গ্রন্থটি সুবৃহৎ তিরিশ খণ্ডে সমাপ্ত এবং গজনবী শাসকদের এমন নির্ভরযোগ্য ইতিহাস দ্বিতীয়টি আর রচিত হয় নি। গ্রন্থটির ভাষায় যেমন রয়েছে সাবলীলতা, তেমনি রয়েছে ঘটনাপরম্পরার সত্যাসত্য। তাছাড়া গ্রন্থটিতে তৎকালীন সমাজচিত্রও চিত্রিত হয়েছে নিখুঁতভাবে।

অনুরূপ, গজনীর হুজবিরীর 'খোলাসাতুল সের' গ্রন্থটিতেও লেখক সূফী-তত্ত্বের ইতিহাস, বিস্তৃতি এবং প্রভাব সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। যদিও সূফীতত্ত্বের জন্ম ১৫০ হিজরী সালে আবু হাসিম থেকে এবং জুননুন মিসরী, তাপসী রাবেয়া প্রমুখ বিশ্বখ্যাত সূফী-দরবেশগণ এর ধারক ও বাহক ছিলেন তথাপি হুজবিরীর আগ পর্যন্ত এমন তথ্য-নির্ভর গ্রন্থ দ্বিতীয়টি রচিত হয় নি। এই গ্রন্থটির ভাষা যেমন প্রাঞ্জল তেমনি সহজবোধ্য।

গজনবী শাসন আমলের আরও একটি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায় কিন্তু লেখকের নাম সেখানে অনুপস্থিত যেমন 'তারিখ-ই-সেইস্তান' (সেইস্তানের ইতিহাস) ইত্যাদি। এই গ্রন্থটি খুবই উচ্চমানের। বলা যায় যে, উপরিউক্ত গ্রন্থ সমূহই গজনবী শাসন আমলের গদ্য-রচনার নিদর্শন।

॥ দুই ॥

সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর পর গজনবী শাসনের পতন শুরু হয় এবং গজনবী সুলতান মাসুদ প্রথম-কে পরাজিত করে সালজুক শাসকগোষ্ঠী শাসন ভার গ্রহণ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই সালজুক-গণ সিরিয়া, এশিয়া মাইনর এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে আফগানিস্তান পর্যন্ত তাঁদের কর্তৃত্ব প্রসারিত করেল। সালজুকদের প্রথম সুলতান ছিলেন তুঘরিল বে। উল্লেখ্য যে, সালজুক এবং উঘুজ, তুর্কী গোত্রের এই বংশ দুটোই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। যাহোক, ১০৬৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সালজুক শাসন বলবৎ থাকে এবং সালজুক শাসনের পর তুর্কী-নেতা আতা বেগ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন এবং তাঁর শাসন কাল ১২২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলে। তারপর ঘোরীদের আবির্ভাব।

গজনবী, সালজুক, ঘোরী ও আতাবেগের শাসন আমল প্রায় তিন শ' বছর এবং এই তিন শ বছর ফারসী সাহিত্যের অঙ্গনে বহু কবি-সাহিত্যিক এবং পণ্ডিত ব্যক্তিদের জন্ম দিয়েছে। গজনবী শাসন আমল সম্পর্কে স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা হয়েছে এবং সালজুক ও তৎপরবর্তী সময়ে অর্থাৎ মোংগলদের পূর্ব পর্যন্ত ফারসী সাহিত্যের উন্নতি এবং সমৃদ্ধিতে এক চরম পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হয়। এই সময়কালের মধ্যে এমনসব প্রতিভাধর কবি-সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের আবির্ভাব ঘটেছে যাঁদের অবদান পৃথিবী থেকে কোনো-

দিনই মুছে যাবার নয়। ফারসী সাহিত্যের যে সাতজন কবি 'স্তম্ভ' হিসেবে স্বীকৃত যেমন ফেরদৌসী, আনওয়ারী, নিজামী, রুমী, সাদী, হাফিজ এবং জামী---এঁদের অধিকাংশই সালজুক আমলের। উল্লেখ্য যে, গজনবী শাসনের পৃষ্ঠপোষকতা ফারসী সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রসারে যেমন কার্যকারী ছিল ঠিক একই ধরনের প্রবণতা সালজুক এবং ঘোরী শাসনেও লক্ষ্য করা গেছে। এবং এর ফলশ্রুতি লক্ষ্য করা গেছে ফারসী সাহিত্যের উন্নতির চরম পরাকাষ্ঠায়।

সালজুক আমলের ফারসী কাব্যে সুফীবাদ বা মরমীয়াবাদের লক্ষণ আরও প্রকট হয়ে দেখা দেয়। ইতিপূর্বের কাব্যধারায় মরমীয়াবাদ ছিল না একথা বলছি না, তবে সালজুক আমলে যেমন কাব্য জগতে কয়েকজন দিকপালের আবির্ভাব ঘটে তেমনি মরময়ীবাদের পরাকাষ্ঠাও তাঁরা কাব্য-কর্মে প্রদর্শন করেছেন। এ প্রসঙ্গে সানায়য়ী, ফরিদ উদ্‌দীন আত্তার, জালালউদ্দিন রুমী প্রমুখের নাম করা যায়। এ সম্পর্কে পরে আলোকপাত করবো।

উল্লেখ্য যে, সালজুক আমলে যাঁরা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন তাঁদের প্রথমদিকে কয়েক জন গজনবী আমল থেকেই কাব্য-চর্চা করে আসছিলেন। তাঁদের মধ্যে সর্ব প্রথমেই নাম করতে হয় আজারবাইজানের কাতরানের। বিখ্যাত তাবরিজ শহরে তাঁর জন্ম হলেও তাঁর শিক্ষাজীবন কেটেছে খোরাসানে এবং খোরাসানীয় সুফী প্রভাবও তাঁর কাব্যকর্মে দীপ্তিমান। তাঁর অধিকাংশ কবিতাই কাসিদাধর্মী এবং বর্ণনা পারিপাট্য এবং সাহিত্যমূল্যেও কবিতাগুলো উত্তীর্ণ। তৎকালীন ভূমিকম্পে তাবরিজ শহরের যে অপরিমেয় ক্ষতি সাধিত হয় কবির কাব্য-এক্‌স-রে'তে তা কি সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে লক্ষ্য করা যাক :

তাব্রিজের মতো কোনো সুন্দর শহর পৃথিবীতে
আছে কিনা জানা নেই; ছিল সুখী সবাই এখানে
অর্থ ও সম্পদে, আর সুদৃশ্যের আবাস ভূমিতে
স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে কাটাতো আনন্দ আর গানে।

সম্রাট অথবা দাস, নামাজী অথবা বেনামাজী
পণ্ডিত ও ধনবান, এমনকি নীতিবান কাজী—
গায়ক ও মদ্যপায়ী সব মিলে এখানে কেমন
জীবনের কোলাহলে মেতে ছিল স্রোতের মতন।
তাব্রিজের ভাগ্যে এলো সর্বনাশা কি যে অভিশাপ,
চোখের পলকে যেন সবকিছু হয়ে গেলো সাফ।
উচ্চস্থান নীচু হলো, নীচুস্থান হলো যে গহ্বর,
সিজদায় র'লো পড়ে বৃক্ষ চূড়া, বালির চত্বর
ছাই হয়ে উড়ে গেলো, সুউচ্চ পর্বত ও পাহাড়
গলে গলে জল হয়ে ধরলো কি সমুদ্র আকার!
সুরম্য প্রাসাদ আর স্বর্ণ-খচা তাব্রিজ শহর,
মুহূর্তে কোথায় গেল? কে রচলো এমন কবর?

'রুবাইয়্যাত'-খ্যাত ওমর খৈয়্যামও সালজুক শাসন আমলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর পুরো নাম খাজা ইমাম ওমর খৈয়্যাম। কবি-খ্যাতি ছাড়াও জ্যোতির্বিদ, অঙ্কশাস্ত্রবিদ, জড়োবাদী এবং মুক্তবুদ্ধির অধিনায়ক হিসেবে তাঁর খ্যাতি সুবিদিত। জন্ম-মৃত্যু ও সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কিত দর্শন-যন্ত্রণাই তাঁকে জড়োবাদী বা ম্যাটে-রিয়ালিষ্ট করে গড়ে তুলেছিল।

দ্বিতীয় সালজুক শাসক সুলতান আল্‌প আরসালান এবং তার পুত্র মালিক শাহ-এর প্রধানমন্ত্রী নিজাম উল মুলকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং সহপাঠী ছিলেন ওমর খৈয়্যাম। নিজাম উল মুলকের সহায়তাও তিনি পেয়েছিলেন প্রচুর। এ সম্পর্কে একটি সুন্দর কাহিনীও আছে।

নিজাম উল মুলক হাসান সাব্বা এবং ওমর খৈয়্যাম নিশাপুরের এক স্কুলে সহপাঠী ছিলেন। তিন বন্ধু মিলে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তিনজনের মধ্যে যে আগে উচ্চপদ পাবে সে অপর দুইজনকে সাহায্য করবে। হাসান সাব্বা হলেন বড় সাধক, ওমর খৈয়্যাম কবি এবং নিজাম উল মুলক প্রধান মন্ত্রী। অতএব প্রতিজ্ঞা অনুসারে নিজাম উল মুলকেরই অপর দু'জনকে সাহায্য করার কথা।

ওমর খৈয়্যাম ও হাসান সাব্বা মিলে একদিন নিজাম উল মুলকের দরবারে গিয়ে তাঁদের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। নিজাম উল মুলক বাল্যকালের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলেন। হাসান সাব্বাকে দিলেন সরকারী বড় চাকরি এবং ওমর খৈয়্যামকে বিজ্ঞানশাস্ত্রে গবেষণার জন্য দিলেন বৃত্তি এবং ওমর খৈয়্যাম নিশাপুরেই অবস্থান করতে শুরু করলেন। এবং এই নিশাপুরেই ১১২৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি ছিলেন মুক্তবুদ্ধির অধিনায়ক। ধর্মীয় গোঁড়ামী, ইমামদের ভণ্ডামী এবং মিথ্যার বেসাতি তাঁকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল এবং এই জীবন-যন্ত্রণাই তাঁর সমগ্র কাব্য-কর্মে প্রতিফলিত। অদৃষ্টবাদ ছাড়া কোনো বিশ্বাসে তাঁর আস্থা ছিল না এবং এই পৃথিবীই জীবনের শেষ পরিণতি বলে তিনি লোকের কাছে প্রচার করতেন। এবং জীবনকে পূর্ণভাবে উপভোগ করারই ছিলন তিনি পক্ষপাতী।

ওমর খৈয়্যামের রুবাইয়্যাতই তাঁকে অমর করে রেখেছে। পৃথিবীর বেশ কয়েকটি ভাষায় 'রুবাইয়্যাত-ই-ওমর খৈয়্যাম' অনূদিত হয়েছে কিন্তু কেউই ওমরের দর্শন ছাড়া মূল বিষয়বস্তু হুবহু অনুবাদে আনয়ন করতে সমর্থ হননি। এডওয়ার্ড ফিট-জ্যারাল্ড-এর অনুবাদ জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও হুবহু অনুবাদ নয়— খৈয়্যাম দর্শনের প্রকাশ মাত্র। বাংলায় যাঁরা সার্থক অনবাদক হিসেবে স্বীকৃত তাঁদের মধ্যে নজরুল ইসলাম, শান্তি ঘোষ এবং নরেন দেবও ফিটজ্যারাল্ডকে অনুকরণ করেছেন। মূল ফারসী এবং খৈয়্যামের শক্ত লেখনীর হুবহু ছন্দ রেখে অনুবাদ করা সত্যি দুরূহ ব্যাপার। উল্লেখ্য যে, এই গ্রন্থের সব কবিতাই যেমন আমার নিজের অনুবাদ তেমনি কাউকে অনুসরণ না করে এখানেও আমার নিজের অনুবাদের কয়েকটি স্তবক পেশ করলাম ঃ

জীবন যদি বা চলেছে নির্বিবাদে
হোক না সে ওই বলখে বা বাগদাদে ;
মদের পিয়ালা ভরাও পূর্ণ করে
হোক্ না তিক্ত অথবা মিষ্টি, স্বাদে।

যতোদিন আছে আকাশেতে ওই চাঁদ,
চালাও সবেগে মদের এ আস্বাদ;
চাঁদের গতিতে মাসের পদার্পণ—
ক্ষণেকের তরে দিয়ো না সুরা বাদ।

আমার কামনা পিয়ালা ভর্তি সুরা
সামান্য খাবার, না হোক তা সে পুরা—
কবিতার বই সেই তো ঢের ভালো
তুমি আর আমি খুশীর তানপুরা।

রাজার আসন কিছুই না এর কাছে,
মদের পিয়ালা যখন এ হাতে আছে।
আমার কবিতা, সেই তো প্রাণ-প্রিয়া—
আর কিছু নয়, আনন্দে মন নাচে।

মদের পিয়ালা রূপের নেশা অতি
ভণ্ড-নামাজীর নামাজ থেকে শ্রেয়;
রূপ-পিয়াসীর নরকে যদি গতি—
তাহলে সে কারা দেখবে স্বর্গ-জ্যোতি!

খৈয়্যাম-দর্শনের সামান্য ইংগিত দেওয়া হলো মাত্র। তাঁর সমগ্র 'রুবাইয়্যাত' জুড়েই এমনি ধরনের চিন্তার ফসল মাথা উঁচু করে আছে। এবং এজন্যই তাঁকে পারস্যের ভোল্‌টেয়ার বলা হয়।

ওমর খৈয়্যামের পরেই নাম করতে হয় মু'ইজ্‌জীর। মু'ইজ্‌জির জন্ম আনুমানিক ১০৪৮ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর বাবা সালজুক সম্রাট আল্‌প আর সালানের রাজদরবারে সভা-কবি ছিলেন। পিতার অনুরোধেই মু'ইজ্‌জী প্রথমতঃ আল্‌প আরসালানের পুত্র মালিক শাহ্‌-এর দরবারে ঠাঁই পান এবং স্তুতিব্যঞ্জক কবিতা লিখে মালিক শাহ-এর পুত্র সম্রাট সানজর-এর রাজসভায় সভাকবি হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। মু'ইজ্‌জী আরবী ভাষায়ও সুপণ্ডিত ছিলেন। ফলে তাঁর অধিকাংশ কবিতায় আইয়্যামে জাহেলিয়া ও আইয়্যামে ইসলামিয়া যুগের আরবী কবি ইমরুল কায়েস, জুহায়ের বিন আবু সালমা, তরাফা, লুবাইদ, আনতারা, আল আশা প্রমুখের

প্রভাব বর্তমান। শুধু তাই নয়, তাঁর অধিকাংশ কবিতাই কাসিদা-ফর্মে রচিত। তাঁর কাব্য গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'হাদায়েকুস্ সিহ্‌র' (যাদুর বাগিচা)। নিম্নের কাব্যাংশে আরবী কবি ইমরুল কায়েস কিংবা জুহায়ের বিন আবু সালমার 'সাবআ মু'আল্লাকায়' অন্তর্ভুক্ত কবিতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়ঃ

কারাভাঁ চালক শোনো আমার মিনতি, একবার
প্রিয়ার ঘরের পাশে থামাও এ কারাভাঁ তোমার।
কিছুক্ষণ কেঁদে নেবো আমার প্রিয়াকে মনে করে,
অশ্রুজল নদী হবে হৃদয়ের মরুর উপরে।
কান্নার অজস্র ফোঁটা ফুল হবে বিশুষ্ক বাগানে
দুঃখের জঞ্জাল যতো ধুয়ে দেবে নদীর কল গানে।
প্রেয়সী কোথায় তুমি, রূপবতী; ফাঁকা ঘর বাড়ি
ফুলহীন এ বাগিচা কেবলি করছে আঁহাজারি।
যেখানে আমরা মিলে ভরেছি সুরার পান-পাত্র,
সেখানে এখন শুনি জেব্রার সে কান্না একমাত্র।
যেখানে শুনেছি শুধু বাঁশরীর সুমধুর গান—
সেখানে এখন শুনি কি কর্কশ কাকের আহ্‌বান।
যেখানে প্রেয়সী ছিল সখীদের সঙ্গ-গুঞ্জরণে
সেখানে এখন বাঘ ভালুকের খেলা একমনে।

হায়রে দুঃখের মেঘ, ঢেকে দিলে কি সুন্দর চাঁদ,
বিষের ছোঁয়াচ দিয়ে করলে এ মধু বরবাদ।
পাথরের চাপা পড়ে' হাত ছাড়া মুক্তোর বাহার,
ফুলের বদলে আহা, এ বাগানে সৌন্দর্য কাঁটার।

মু'ইজ্‌জীর কবিতার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, যেখানে দুর্বোধ্যতা কিংবা দর্শনের পাথর চাপা নেই, কবিতাগুলো সহজ, সরল এবং সাবলীল। ১১৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মারভ শহরে মু'ইজ্‌জীর মৃত্যু ঘটে।

সানজর রাজদরবারের আর একজন উল্লেখযোগ্য কবি আনওয়ারী। তাঁর জন্ম তারিখ জানা যায়নি, তবে তিনি দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধে খোরাসানের আবিওয়ার্দ শহরের বাদানাহ্ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রশংসাব্যঞ্জক কবিতা লিখেই তিনি সভাকবি

হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তাঁর কবিতা অধিকাংশই কাসিদা-ধর্মী এবং সুদীর্ঘ। তিনি একজন প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদও ছিলেন। উল্লেখ্য যে, সভাকবি ছাড়া তিনি রাজ-জ্যোতির্বিদ হিসেবেও সানজর রাজদরবারে কাজ করেছেন। তাঁর জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে একটি সুন্দর অথচ দুঃখপূর্ণ কাহিনী আছে। একবার আনওয়ারী পাঁজি-পঞ্জি দেখে বলে দিলেন যে, অমুক তারিখে মারভ শহরে ঝড়ের তাণ্ডবলীলা বয়ে যাবে এবং সমূহ ক্ষতি হবে। সবাই সতর্ক হয়ে গেলো। কিন্তু দেখা গেলো ঝড়তো দূরের কথা জোরে বাতাসও বইলো না। এমনকি সেদিন মসজিদের মোমবাতি পর্যন্ত নিভলো না। সম্রাট ক্ষিপ্ত হলেন এবং তাঁকে রাজদরবার থেকে বহিষ্কার করা হলো। আনওয়ারীর গণনা একেবারে নিরর্থক হয় নি। কিছু-দিন পর আবিষ্কৃত হলো উক্ত রাত্রে দুর্ধর্ষ চেংগিস খান জন্মগ্রহণ করেছিল। ঝড়ের তাণ্ডবলীলার চেয়ে চেংগিস খানের জন্ম আরও ভয়াবহ বলে বিবেচিত।

আনওয়ারীর কাব্যগ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'অাঁসু-ই-খোরা-সান' (খোরাসানের কান্না)। গ্রন্থটির সবগুলো কবিতাই তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে রচিত। উল্লেখ্য যে, ১১৫৩ সাল থেকে ১১৫৬ সালের মধ্যে তুর্কোম্যান উপজাতীয় ঘুঝ খোরাসান আক্রমণ করে এবং সমগ্র দেশ তচনচ করে ফেলে। তদুপরি সানজরকে বন্দী অবস্থায় অন্তরীণ রাখে। কিছুদিন পর সানজরকে মুক্ত করা সম্ভব হয় এবং তিনি পুনরায় সিংহাসন লাভ করলে আনওয়ারী তাঁকে এই 'অাঁসু-ই-খোরাসান' উপহার দেন। ঘুঝ আক্রমণে খোরাসানের কি বিপর্যয় ঘটেছিল তাঁরই পূর্ণচিত্র পাওয়া যায় এই কাব্য-গ্রন্থে ঃ

হায়রে ঝড়ের তাণ্ডবলীলা এ সমরখন্দে ;
এখানের লোক একদা ছিল যে মহা আনন্দে।
খোরাসানী-সুখ ডুবেছে এবার দুঃখের সাগরে—
তুরানী রাজার দুঃসহ আঘাত দেশের উপরে।
অজগরী-শ্বাস ছিল যে তাদের নাসারন্ধ্রে,
অত্যাচার আর অনাচার আনে তারা স্কন্ধে।

এমনি ধারার বর্ণনায় আনওয়ারীর কাব্যগ্রন্থ 'অাঁসু-ই-খোরাসান' মুখর।

ব্যক্তিগত জীবনে আনওয়ারী ছিলেন খুব দরিদ্র অথচ মেধাবী। তুস শহরের মানসুবা কলেজ থেকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন এবং কাব্য-প্রতিভার জন্যই তিনি রাজ-অনুগ্রহ লাভ করতে সমর্থ হন। ১১৯০ থেকে ১২০০ সালের মধ্যে বলখে তাঁর মৃত্যু হয়।

আনওয়ারীর সমসাময়িক আর একজন উল্লেখযোগ্য কবি খাকানী। তাঁর পুরানাম আফজাল উদ্‌দীন ইব্রাহিম বিন আলী শিরওয়ানী। পারস্যের শিরওয়ান শহরে ১১০৬ খ্রীষ্টাব্দে খাকানীর জন্ম হয়। শিরওয়ানের সুলতান খাকান মানুচেহ্‌র তাঁকে 'খাকানী' এই সংক্ষিপ্ত নামে ভূষিত করেন। তাঁর মা ছিলেন খ্রীষ্টান এবং পিতা মুসলমান।

খাকানীর জীবন বিচিত্রখাতে প্রবাহিত। ছোট সময় থেকেই তিনি খুব ডান-পিটে ধরনের ছিলেন কিন্তু ছাত্র হিসেবে ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। তাঁর মেধা ও কাব্য-প্রতিভার জন্য শির-ওয়ানের সুলতান তাঁকে অত্যধিক ভালোবাসতেন। কিন্তু মানসিক চঞ্চলতার জন্য তিনি নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন না। দরবেশ-জীবন যাপন করার অজুহাতে তিনি দেশত্যাগ করার প্রাক্কালে তাঁকে সুলতানের অফিসাররা আটক করেন এবং শেষ পর্যন্ত জেলে পাঠিয়ে দেন। এই কারাজীবন ছিল সাতমাস। সাতমাসে তিনি একটি সুদীর্ঘ 'কাসিদা' রচনা করলেন। 'কাসিদা'তে ধর্মসম্পর্কিত স্বাধীন বক্তব্য ছাড়াও সামাজিক জীবনের কদর্য কতকগুলো দিকের প্রতিও ইংগিত ছিল। আবার তিনি সুলতানের রোষে নিপতিত হন। কিন্তু তাঁর জনৈক পণ্ডিত বন্ধু সমালোচনার মাপকাঠিতে প্রমাণ করেন যে, খাকানী ধর্ম নিয়ে ব্যঙ্গধর্মী কবিতা লিখলেও তা ধর্মের পরিপন্থী নয়। অতএব, খাকানীকে যে অমুসলমান বলে ফতোয়া দেওয়া হয়েছে এটাও ভুল। এই আলোচনা প্রকাশের পর খাকানী মুক্তি-লাভ করেন এবং আবার সুলতানের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেন। কিন্তু তাঁর পূর্বের স্বভাব বদলালো না। শেষ পর্যন্ত তিনি ১১৫৭ খ্রীষ্টাব্দে দরবেশ জীবন যাপন করবেন বলে মক্কায় পাড়ি জমালেন। মক্কা যাওয়ার পথে তিনি পারস্যের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন করলেন। দেশে ফিরে এসে তিনি তাঁর ভ্রমণ অভিজ্ঞতা নিয়ে এক সুদীর্ঘ কবিতাসহ এক কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশ করলেন 'তোহফাতুল ইরাকায়েন'

নামে। গ্রন্থটিতে দুই ইরাকের কাহিনী কীর্তিত হয়েছে—(এক) পশ্চিম ইরাক এবং (দুই) আরবীয় ইরাক অর্থাৎ মোসাপোটেমিয়া।

ভিন্ন দেশের প্রশংসা কীর্তনে শিরওয়ানের সুলতান আবার বিরক্ত হলেন এবং তাঁকে পুনরায় কারাবন্দী করা হলো। বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়ে দেখেন তাঁর স্ত্রী এবং একমাত্র পুত্র মারা গেছে। শিরওয়ান তখন তাঁকে বিষিয়ে তুললো এবং তিনি বাইজানটাইন সম্রাটের আশ্রয় প্রার্থনা করে চলে গেলেন। মুসলিম ও খ্রীষ্টান উভয় মতবাদে তাঁর অধিকার আছে বলে সম্রাট তাঁকে অভিবাদন জানালেম।

তাঁর মৃত্যু তারিখ নিয়ে মতভেদ আছে। তবে ১১৭৬ থেকে ১১৮৬ সালের মধ্যে তাঁর মৃত্যু ঘটে এবং তাব্রিজ শহরে কবি জহির উদ্‌দীন ফারাবী এবং শাহ গফুর নিশাপুরীর কবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

প্রখ্যাত সমালোচক লুৎফী আলী বেগ তাঁর 'আতশ কদা' এবং আমীন আহমদ-ই-রাজী তাঁর 'হাফত ইকলীম' গ্রন্থে খাকানীকে বিশিষ্ট কবি বলে স্বীকার করা হয়েছে। খাকানী কেবল কবি ছিলেন না—তিনি ছিলেন একাধারে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সঙ্গীতজ্ঞ এবং মুক্তবুদ্ধির অধিনায়ক। তাঁর সংকলিত 'দীওয়ান' কাব্য-গ্রন্থে বিচিত্র ধরনের কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। কবিতাটি দুই ইরাকের ধ্বংস সম্পর্কিত ঃ

হে দ্রষ্টা হৃদয় মোর, দেখে নাও দুই চোখ ভরে ;
দেখে নাও দু'শহর ; প্রাসাদের চিহ্ন থরে থরে।
কালের আয়না জুড়ে বিম্বিত সে ছবি হয়ে আছে—
হে দ্রষ্টা হৃদয় মোর, চোখ মেলে দেখো চার পাশে।
তাইগ্রীসের তীর ধরে পেঁৗছে যাও উটেসিফোহনে,
অন্য এক তাইগ্রীস দ্যাখো তুমি
ঝরে যায় তোমার নয়নে।

দু'চোখের অশ্রু আর হৃদয়ের আকুতি মিশিয়ে
একবার ডাকো তুমি প্রাচীন ধ্বংসের নাম ধরে—
উত্তর ঠিকই পাবে তোমার দু' কানের ভিতরে।

সালজুক সম্রাট সানজর এবং তাঁর ভ্রাতৃবৃন্দের সময় কালে অর্থাৎ ১০৯২ থেকে ১১৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পঁয়ষট্টি বছরে ফারসী সাহিত্যে বেশ কয়েকজন দিকপালের আবির্ভাব ঘটে। এঁদের মধ্যে ওমর খৈয়্যাম, মু'ইজ্‌জী এবং আনওয়ারী সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে। অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছেন গনজের নিজামী, শেখ ফরিদ উদ্‌দীন আত্তার, আদিব সাবীর, বোখারার আমা'ক, সানাই, রশীদ উদ্‌দীন ওয়াতওয়াত এবং রস-সাহিত্যিক সুজানী। এঁদের সঙ্গে ফরিদ-ই-কাতিব, ইমাদ-ই-জওজানী এবং সায়ীদ হাসানের নামও স্মরণযোগ্য। শেষোক্ত তিনজন অবশ্যি প্রথম সারির কয়েকজনের চেয়ে একটু নিম্নমানের।

ফারসী সাহিত্যে তিনজন নিজামী বা নিজাম এর সন্ধান পাওয়া যায়। একজন 'চাহার মাকালা' (আলোচনা চতুষ্টয়)-এর লেখক সমরখন্দের নিজাম-ই-আরোদী, দ্বিতীয় জন 'সিয়াসতনামা'-এর লেখক নিজাম উল-মুলক এবং তৃতীয় জন গনজের কবি নিজামী। আমাদের এখনকার আলোচ্য বিষয় গনজের কবি নিজামী।

নিজামীর পুরো নাম শায়েখ নিজাম উদ্‌দীন আবু মোহাম্মদ ইলিয়াস বিন ইউসুফ। 'নিজামী' তাঁর ছদ্ম নাম। ১১৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পারস্যে জন্মগ্রহণ করেন এবং জীবনের সব সময়ই তিনি গনজে অতিবাহিত করেছেন বলে তাঁকে গনজের বা গনজবীর নিজামী বলা হয়।

বাল্যকাল থেকেই তিনি ধ্যানরত থাকতে পছন্দ করতেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্তও এই অভ্যাস পরিহার করতে পারেন নি। তা সত্ত্বেও ফারসী কাব্য-সাহিত্যে যে অবদান রেখে গেছেন তা কোনো-দিনই অবলুপ্ত হবার নয়। ফারসী-সাহিত্য সম্পর্কে একটি কথা আছে তা এই যে, যতদিন পৃথিবী আছে ততদিন ফেরদৌসীর 'শাহনামা.' নিজামীর 'পাঁনচ গনজ', জামীর 'হপ্ত আওরঙ্গ' এবং রুমীর 'মসনবী' মহাকালের ঘর্ষণেও মুছে যাবার নয়। 'পাঁনচ গনজ' (পঞ্চরত্ন)-খ্যাত নিজামী সাহিত্য জগতে অমর হয়ে আছেন।

নিজামীর প্রথম গ্রন্থ 'মাখজানুল আসরার' (রহস্যের গুদামখানা) প্রকাশিত হয় ১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের বিস্তৃত আলোচনায় গ্রন্থটি পূর্ণ। এবং সে আলোচনা বিজ্ঞান-ভিত্তিক এবং

দার্শনিক ভাবনাপ্রসূত। বলা যায় যে, প্রখ্যাত মরমীকবি সানাই-এর 'হাদিকাতুল হাক্‌কাত' বা 'সত্যের বাগিচা' গ্রন্থটি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে নিজামী তাঁর অমরগ্রন্থ 'মাখজানুল আসরার' (রহস্যের গুদামখানা) রচনা করেন। এরপর প্রকাশিত হয় বিখ্যত রোমান্স কাব্য 'খসরু ওয়া শিরীন'। 'খসরু ওয়া শিরীন' কাব্য-গুণে এতই উন্নত যে, ফারসী সাহিত্যে একমাত্র ফেরদৌসীর 'ইউসুফ জোলায়খা' এবং ফখরুল্লাহ্ আসাদ জুরজানীর মূল পাহলবী ভাষায় লিখিত এবং পরে ফারসীতে অনূদিত 'ওয়াইস ওয়া রামীন' ছাড়া অন্য কোনোটির সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে না। যদিও অনেকে এ ধরনের বহু রোমান্স-কাব্য রচনা করেছেন।

কাসিদা, গজল এবং খণ্ড কবিতার সমষ্টি নিয়ে নিজামীর 'দিওয়ান' প্রকাশিত হয় ১১৮৮ খ্রীষ্টাব্দে। এতে সর্বমোট ছন্ত্রের সংখ্যা বিশ হাজার। প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় রোমান্স কাব্য 'লায়লা ওয়া মজনুন'। এ গ্রন্থটিও একমাত্র এ্যারিস্টটু'র অরলানডু ফিউরীসো-এর সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। অতঃপর এক বছরের মধ্যে প্রকাশিত হয় 'সিকান্দার নামা' বা আলেকজাণ্ডারের ভাগ্য অভিযান। এ গ্রন্থটি 'শাহনামা'র অনুকরণে কাব্যে রচিত। 'সিকান্দারনামা' দুই খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডে রয়েছে আলেকজাণ্ডারের বিজয় অভিযানের সাফল্য এবং দ্বিতীয় খণ্ডে তাঁর জীবনদর্শন কীর্তিত হয়েছে।

নিজামীর সর্বশেষ গ্রন্থ 'হপ্ত পয়কর' (সাত রাণীর মুখ)। এই গ্রন্থটি গদ্যে রচিত রোমান্টিক কাহিনীনির্ভর। কাহিনীটি অতি রসাত্মক এবং যতদূর জানা যায় সাসানীয় ঘোর সম্রাট বাহরামের ছিল সাত রাণী। একজন ভারতের, একজন চীনের, এমনিভাবে খাবা-রাজমের, রাশিয়ার, পারস্যের এবং অন্যান্য পশ্চিমী দেশসমূহের। প্রত্যেকের জন্য তিনি নিজ নিজ দেশের অনুকরণে প্রাসাদ তৈরী করে দিয়েছিলেন। সম্রাট প্রত্যেকের ঘরে সপ্তাহে এক রাত্রি করে থাকতেন এবং সেই রাতে রাণী তাঁর নিজের তৈরী গল্প সম্রাটকে শুনাতেন। এমনিভাবে সমাপ্ত হয়েছে সাত রাণীর কাহিনী। কাহিনী শেষে থাকতো বাহরামের অত্যাচারী শাসনের ব্যাখ্যা এবং তাঁর মৃত্যুর পরিণতি। সাতটি কহিনীর মধ্যে সবচেয়ে রোমান্টিক ও আকর্ষণীয়

ভারতীয় রাজকন্যার কাহিনী। এই কাহিনীসমূহ স্বভারতই 'আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

নিজামীর সাহিত্য-কর্ম কত যে মূল্যবান তা পরবর্তীকালের প্রখ্যাত কবি শেখসাদী, হাফিজ প্রমুখের গজলের মধ্যেই উচ্চারিত হয়েছে। সাদী বলেন ঃ

নিজামী গিয়েছে চলে, আমদের মধ্যমণি ; তাঁর
মর সেই আত্মা ঘিরে নামুক সে প্রশান্তি আল্লার।
পবিত্র শিশির আর পৃথিবীর বহুমূল্য হীরে—
আপন জ্যোতিতে জ্বলে' ধরা থেকে গিয়েছে যে ফিরে।

নিজামী যে ফারসী সাহিত্যের মধ্যমণি এতে সন্দেহ নেই। কি বর্ণনা, কি প্রকাশভঙ্গী, কি দর্শন চিন্তা সব মিলিয়ে নিজামীর সাহিত্য এক অনবদ্য মূল্যমানের আবির্ভাব ঘটিয়েছে। কবির অন্তর্দৃষ্টি যে কত প্রখর ছিল এবং রোমান্স তৈরী করতে যে তা কত উপযোগী দু' একটা দৃষ্টান্ত দিলেই তা স্পষ্ট হবে। 'খসরু ওয়া শিরীন' গ্রন্থে তাদের প্রেম যখন ঘনীভূত, শিরীনের মুখে শোনা যায় ঃ

মদের পিয়ালা ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও,
আমাকে তোমার সুরা-সাকী করে নাও।
শিরীনকে যদি ভালবাসো তুমি ঠিক---
ভালোবাসা তার সুরার অধিক জেনো ।

অনুরূপভাবে 'লায়লা ওয়া মজনুন' রোমান্স কাব্যে তিনি এমন রোমান্টিকতার সৃষ্টি করেছেন যা পড়ে পাঠক-পাঠিকাও মুহূর্তের জন্য হলেও লায়লা মজনুর প্রেমে আবেগ-অশ্রু বিসর্জন করে। মজনুন তার আবেগ জানাচ্ছে এইভাবে ঃ

বাতাসে যদি বা তোমার শ্বাস না থাকে
নিব না সে শ্বাস, বলো গে একথা তাকে।
তোমার শ্বাসেই আমার জীবন বাঁচে,
আমার জীবন তোমার মাঝেই আছে।
যতদূরে থাকি ক্ষতি বা কিসের, তাতে---
আমার এ আত্মা রয়েছে তোমার হাতে।

উল্লেখ্য যে, 'দিওয়ান', 'খসরু ওয়া শিরীন', 'লায়লা ওয়া মজনুন', 'হপ্ত পয়কর' এবং 'সিকান্দরনামা' এই পাঁচটি গ্রন্থ একত্র করে এক সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং এটাই ইতিপূর্বে বর্ণিত 'পাঁনচ গনজ' বা পঞ্চরত্ন। 'পঞ্চারত্ন'কে নিজামীর সামগ্রিক রচনা বলে উল্লেখ করা হয়। ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে নিজামীর মৃত্যু হয়।

দ্বাদশ শতাব্দীর শুরু থেকেই ফারসী সাহিত্যে মরমীবাদের স্পর্শ বেশী স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং বেশ কয়েকজন কবি তাঁদের সাহিত্য-কর্মে মরমীবাদকে অতিমাত্রায় প্রাধান্য প্রদান করেন। এই দলের অন্যতম কবি সানাই। সূফীমতবাদের তাৎপর্য এবং গুরুত্ব উপলব্ধি করে মওলানা জালাল উদ্দীন রুমী উল্লেখ করেছেন, 'সূফী দর্শনের আত্মা ফরিদ উদ্‌দীন আত্তার, সানাই দুই চোখ এবং আমার স্থান এসবের পরে। অবশ্য পরবর্তী বিচারে সূফীতাত্ত্বিকগণ মওলানা রুমীকেই শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করেছেন।

১১১৮ খ্রীষ্টাব্দে শায়েখ হাকিম সানাই অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত নামে পরিচিত সানাই গজনীতে জন্মগ্রহণ করেন। সানাইর প্রথম দিককার কবিতা ছিল কেবল রাজা-বাদশাদের প্রশংসায় নিবেদিত। জনৈক লাইখার নামে এক পণ্ডিত ব্যক্তি মানব-ব্যক্তিত্বের উদ্দেশ্যে রচিত সানাইর কবিতা সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, 'জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং দর্শন-তত্ত্বে এতো প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও সানাই যে কেবল রাজা-বাদশাহ-দেরই প্রশংসা কীর্তন করেছেন, মৃত্যুর পর আল্লাহ্‌র দরবারে তিনি কি নিয়ে হাজির হবেন!' এই মন্তব্যে সানাই সম্বিৎ ফিরে পান এবং তিনি রাজা-বাদশাদের প্রশংসাব্যঞ্জক কাব্য বন্ধ করে দেন। অতঃপর তিনি প্রখ্যাত পীর শায়েখ ইউসূফ হামদানীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, এই বুজর্গ পীরের আস্তানাকে 'ঘোরাসানের কাবা' বলা হয়।

সানাইর প্রথম কাব্য-গ্রন্থ 'তারিকুত তাহ্‌কীক' (সত্যের পথ)। এই গ্রন্থটি আল্লাহ্‌র একত্ব, ধর্মীয় বিশ্বাস ইত্যাদি সম্পর্কিত কাব্যরূপ আশ্রয় গ্রহণ করেছে। এমনিভাবে পর পর প্রকাশিত হয় 'হাদিকাতুল হাককাত' (সত্যের বাগিচা), 'সায়রুল ইবাদ ইলাল মা'দ' (আল্লাহ্‌র পথে যাত্রা), 'ইশ্‌ক নামা' (প্রেম-পুস্তক), 'আকল নামা' (জ্ঞান-পুস্তক), 'গারীব নামা' (দারিদ্র্য) এবং 'দীওয়ান' (কাব্য-সংকলন)।

উপরোক্ত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে 'হাদিকাতুল হাককাত'কে সানাইর শ্রেষ্ঠ রচনা বা মাস্টারপিস বলে ধরা হয়ে থাকে। জানা যায়, গ্রন্থটি প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুদূর ভারতবর্ষ পর্যন্ত আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং কয়েকদিনের মধ্যে গ্রন্থটির প্রথম মুদ্রণ নিঃশেষ হয়ে যায়। গ্রন্থটিতে আধ্যাত্মিকতা, সূফীমতবাদ, আল্লার সঙ্গে দীদার, ধর্মের মর্মবাণী ইত্যাদি বিষয়ক দশটি অধ্যায় আছে এবং বিভিন্ন ধরনের সর্বমোট দশ হাজার 'মিসরা' বা কাব্য-ছত্র আছে। সানাই-এর কাব্য নিদর্শনের উল্লেখে 'অন্ধের শহর' থেকে কয়েকটি লাইনের অনুবাদ পেশ করছি ঃ

ঘোর নামে সুবৃহৎ একটি শহর আছে জানা,
সেখানের অধিবাসী শুনেছি সবই তার কানা।
একদা সে এক রাজা সেখানে ছাউনী ফেলে নিয়ে
সৈন্য ও সামন্তসহ দেখাচ্ছিল বাহাদুরী কি এ!
রাজার সে দলে ছিল সুবৃহৎ তুলতুলে হাতি,
দেখলে তা মনে হতো একেকটা অন্ধকার রাতি।
এ খবর রটে গেলো চতুর্দিকে সারাটি শহরে;
অন্ধেরাও দেখবে হাতি, ছুটে এলো বহরে বহরে।
কি দিয়ে দেখবে হাতি? চোখ নেই। হাতের পরশে
সবাই করলো এক অনুমান মনের হরষে।
যে দেখেছে কান দুটো, সে বলেছে, এটাতো কার্পেট'।

যে দেখেছে লম্বা শুঁড়, সে বলেছে, 'লম্বা ফাঁপা নল'।
যে দেখেছে চারটা পা, সে বলেছে, থাম তো কেবল।
অন্ধের সে হাতি দেখা—আসল হাতির খোঁজ নেই;
যে দেখেছে যে ভাবে তা সেই তার হাতির স্বরূপ।
চোখ না থাকলে কভু হাতির স্বরূপ বোঝা যায়?
আল্লার মাহাত্ম্য নিয়ে মানুষের নানান ধারণা,
জ্ঞানের অভাবে লোক অন্ধ হয়ে ভুল পথে চলে।

১১৮০ খ্রীষ্টাব্দে গজনীতে সানাইর মৃত্যু হয়। সাধক-দরবেশ হিসেবে তাঁর খ্যাতিও সুবিদিত। তাঁর মাজার তীর্থযাত্রীদের আকর্ষণীয়

বস্তু। আধ্যাত্মিক জগতে উন্নতি লাভের আশায় বহু লোক তাঁর মাজারে ভীড় জমায়।

সূফীকবি ও দার্শনিক শায়েখ ফরিদ উদ্‌দীন আত্তার ফারসী সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট নাম। ১১২৬ খ্রীষ্টাব্দে নিশাপুরে তাঁর জন্ম। লেখা পড়া সমাপ্ত করে তিনি পৈতৃক ব্যবসায় ঔষধ তৈরী ও ঔষধ বিক্রী করার কাজে নিয়োজিত থাকেন। 'আত্তার' অর্থই ভেষজবিজ্ঞানী। তাঁর আসল নাম মোহাম্মদ ইব্রাহীম। ফরিদ উদ্‌দীন আত্তারই একমাত্র কবি যিনি ব্যক্তিবিশেষের উপর কোনো স্তুতিবাচক কবিতা লিখেন নি। তাঁর সূফী জগতে প্রবেশের মূলে প্রখ্যাত সূফী-সাধক শায়েখ রোকন উদ্‌দীনের প্রভাব অনস্বীকার্য। শায়েখ রোকন উদ্‌দীনের সাহচর্যেই তিনি সূফী সাধকে উন্নীত হন। জানা যায়, যখন তিনি সূফী জগতে প্রবেশ করেন তখন জাগতিক চিন্তা এবং ব্যবসায় পর্যন্ত পরিত্যাগ করেছিলেন। সূফীতত্ত্বের কাব্য-ক্ষেত্রে তিনি সানাই এবং রুমীর সমতুল্য। এ সম্পর্কে সানাই শীর্ষক আলোচনায় রুমীর মন্তব্যের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। আত্তার সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। মওলানা রুমীর মন্তব্যটি আত্তারের ব্যাপারে পুনরুক্তি করছি। রুমী বলেছেন ঃ

আত্তার রূহ্ বুদ উ সানাই দুচশ্‌ম-ই-উঁ,
মা আজ পে ই্ সানাই উ আত্তার আমাদিঁ।

'অর্থাৎ সূফীজগতে কিংবা সূফী দেহে আত্তার আত্মাস্বরূপ এবং সানাই দুটো চক্ষু। আর আমার স্থান এদের পরে।' সূফীজগতে কতটা উন্নত হলে মওলানা রুমীর মতো সূফী-শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব এমন মন্তব্য করতে পারেন তা সহজেই অনুমেয়।

লুৎফী আলী বেগের 'আতশ কদা' অনুযায়ী আত্তার দীর্ঘজীবী প্রাপ্ত হন এবং একশত চৌদ্দ বছর জীবিত ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। নিশাপুর শহরের সাদীয়াখ এলাকার জন্মস্থানে তাঁর কেটেছে পঁচাশি বছর এবং বাকি উনত্রিশ বছর কাটিয়েছেন নিশাপুর শহরে। অবশ্যি মাঝাখানে কয়েক বছর তিনি কাটিয়েছেন মক্কা শরীফে। জীবনের সুদীর্ঘ অংশ তিনি ব্যয় করেছেন সূফীদর্শন ভারাক্রান্ত কবিতা লিখে। তাঁর অসংখ্য কবিতা বিভিন্ন সংকলন

গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে নিজাম-ই-আরোদীর 'চাহার মাকালা' অন্যতম। উল্লেখ্য যে, 'চাহার মাকালা' গ্রন্থটি সমাপ্ত করতে আরোদীর চল্লিশ বছর সময় লাগে এবং কবিতা ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত আলোচনা ছাড়াও এতে উল্লেখযোগ্য কবিদের কবিতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আত্তারের কাব্য-গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'মুনতেকুত তায়ের' (পাখীর জলসা), 'মুসিবত নামা' (দুঃখের কবিতা), 'ইলাহী নামা' (আল্লার স্তুতি)' 'রিয়াজুল আরফীন' (সৌন্দর্যের বাগান), 'লিসানুল গায়্যাব' (অদৃশ্য জিহবা), 'মাদহারুল আজায়েব' (আশ্চর্যের প্রকাশ) এবং 'দীওয়ান' ইত্যাদি। 'দীওয়ান' কাব্য সংকলনে চল্লিশ হাজার ছত্র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং এর মধ্যে বারো হাজার চার লাইনের 'রুবাই' ধরনের কবিতা আছে। তাঁর গদ্য রচনা 'তাজকিরাতুল আউলিয়া' (দরবেশ নামা)।

আত্তারের মৃত্যু বড় করুণ এবং তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। ১২৩০ খ্রীষ্টাব্দে নিশাপুর আক্রমণকালে চেংগিস খানের জামাতা মৃত্যুবরণ করে। ফলে, মোংগলরা সেখানে এক নারকীয় অভিযান চালিয়ে বহু লোক হত্যা করে এবং আত্তারও তাদের দলভুক্ত হন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে আত্তারের সুদীর্ঘ জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে সূফীতত্ত্ব বা মরমীয়াবাদের কবিতা লিখে। আল্লার সান্নিধ্যে পেঁাছুতে গেলে নিজেকে পবিত্র করতে হয়। পবিত্র না করে মহা পবিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না—এটাই আত্তার দর্শনের মূল সুর। আত্তারের কাব্যনিদর্শনের দু' একটা উদাহরণ দিচ্ছি :

১. বন্ধুর প্রতি

সে আমাকে বলেছে একাকী :
'আত্মার জাগ্রতকারী সাধক-প্রবর
অযথা ঔষধ নিয়ে রাতদিন ব্যস্ত থাকো তুমি।
ঔষধ দেহের ব্যাধি নিরাময় করে—
কবিতা ও জ্ঞান জেনো আত্মার খোরাক।'

২. ভণ্ড ইমামদের প্রতি

হে ইমাম, আমাকে দেখাও
তোমাদের মাঝে শুধু সেই একজন
যে একাকী জেগে আছে আত্মার সমীপে ;
তোমরা সবাই নিমজ্জিত
অন্ধের সাগরে।
অন্তত দেখাও একজন
যে বলে, 'আমি তো ঠিক আছি।'
তোমাদের ঝগড়া-বিবাদ
আসল বস্তুতে পোঁছাবে না।

হাজার ফ্যাসাদ দেখি তোমাদের পুণ্য মসজিদে,
কেউ কি করেছে ঝগড়া কোনদিন সরাইখানায় ?
তোমাকে দেখাতে পারি বহুজন সরাইখানায়
মদের নেশায় যারা বুঁদ হয়ে আছে ;
তোমাদের ইচ্ছা যদি বুঁদ হয়ে থাকা
তাহলে আমাকে বলো মদের মাহাত্ম্য কিবা আছে ?
সরাইখানার লোক সকলেই কেমন প্রেমিক।
তোমাদের মাঝে কেউ এমন প্রেমিক আছে বলো ?

৩. তার প্রেমে

তার প্রেমে মগ্ন হয়ে কখনো বলো না,
'এটা কোন কাল ?'
যদি তুমি ভালোবাসো কখনো বলো না,
'আছে কিবা নাই।'
প্রারম্ভ অথবা শেষ কোনোটাই হৃদয়ে এনো না।
চোখ মেলে চাও
তার আলো হাসে
এবং তোমার চারপাশে।

রশীদ উদ্‌দীন ওয়াতওয়াতও সানজর আমলের অন্যতম প্রথম শ্রেণীর কবি। উপস্থিতবুদ্ধি এবং ব্যঙ্গধর্মী কবিতার জন্য ওয়াত-

ওয়াতের খ্যাতি সুবিদিত। তাছাড়া আকৃতিতেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত বেঁটে—যে জন্যে সহজেই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। জানা যায়, হাস্যরসে তিনি আসর মাত করে রাখতেন এবং তাঁকে ঘিরে অনেক রস-কাহিনীও ফারসী সাহিত্যে প্রচলিত আছে। তাঁকে ফারসী কাব্য-সাহিত্যের বো'লো (Boileue) বলে অভিহিত করা হয়েছে।

বলখে তাঁর জন্ম এবং ইতিপূর্বে উল্লেখিত আনওয়ারীর তিনি সমসাময়িক এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। এই বন্ধুত্বের অন্তরালে একটি সুন্দর কাহিনী আছে। আনওয়ারী ছিলেন সুলতান সানজরের সভাকবি এবং ওয়াতওয়াত ছিলেন খাবারিজম সুলতানদের অন্যতম সুলতান আসসিজ-এর সভাকবি। ওয়াতওয়াত যখন হজর আসপ ('সহস্র ঘোড়া' অর্থে) দুর্গে অবস্থান করছিলেন তখন সেই দুর্গ সানজর কর্তৃক আক্রান্ত হয়। সুলতানদের নির্দেশে দুই পক্ষের দুই কবি পরস্পরবিরোধী দলের উদ্দেশ্যে দুইটি ব্যঙ্গধর্মী উত্তেজনামূলক কবিতা লিখে তীরের মাধ্যমে নিক্ষেপ করেন। সানজর পক্ষের আনওয়ারী লিখলেন ঃ

আয়ে শাহ্! হামা মুলক ই জমিন হসব তুরাস্ত ;
বা'জ দৌলত উ ইকবাল জাহান কসব তুরাস্ত ;
ইমরোজ বি-যাক হম্‌বা হজরাসপ বি-গীর,
ফরদা খাবারজম উ সাদ হজরাসপ তুরাস্ত।

ওহে রাজন! বিশ্ব তোমার হিসেব মতে,
ভাগ্যের জোরে বিশ্ব এখন তোমার হাতে
আজকে নাও হজরাস্‌প সামান্য যুদ্ধে
আগামীকাল খাবারীজম আসবে হাতে
আসবে আরো হজরাস্‌প হাজার শত।

ওয়াতওয়াতের কবিতা ছিল এইরূপ ঃ

গর খিসমী তো আয়ে শাহ্ শওয়াদ রুস্তম-ই-গুরদ,
যাক খারজী হজরাস্‌পই তো না তু-আন্‌দ বুরদ ॥

ওহে রাজন! তোমার শত্রু হতো যদি রুস্তম দাদা,
'হাজার ঘোড়া' দূরের কথা নিতো না সে একটি গাধা ॥

উল্লেখযোগ্য যে, উপরোক্ত কবিতায় 'হজর আসপ' বা 'সহস্র ঘোড়ার' দুর্গ সম্পর্কে দুই কবির দুই কবিতা দুই সুলতানের কাছে পোঁছলো। ভাগ্যক্রমে সেই 'হজর আসপে'র দুর্গ সুলতান সানজরের করতলগত হলে তিনি কবি ওয়াতওয়াতকে বন্দী করলেন এবং অমাত্য-বর্গকে আদেশ দিলেন তাঁকে সাত খণ্ডে বিভক্ত করতে। সুলতানের আদেশে ওয়াতওয়াত একটুও বিচলিত হলেন না বরঞ্চ সহাস্যে বললেন, 'জাহাঁপনা' বেআদবী মাফ করবেন, লোকে আমাকে বলে, 'ওয়াতওয়াত' অর্থাৎ বাবুই পাখী, আমার খর্বাকৃতির জন্যই আমাকে এই 'লকব' বা পদবী দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষুদ্র বাবুই পাখী সদৃশ আমাকে সাত টুকরো করবেন কোথায়? তার চেয়ে বরঞ্চ দুই খণ্ড করুন. অন্তত দেখার মতো তখন কিছু হবে।'

ওয়াতওয়াতের এই উপস্থিতবুদ্ধি এবং হাস্যরসে সুলতান হেসে ফেললেন এবং তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন। এখানেই শেষ নয়। আনওয়ারী তাঁর কাব্য-প্রতিভার প্রশংসায় উচ্চকণ্ঠ হয়ে সুলতানকে বললে সুলতানও তাঁর মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হলেন না। এভাবেই আনওয়ারী এবং ওয়াতওয়াতের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জমে ওঠে।

ইতিপূর্বে উল্লেখিত তাঁর দুটো লাইনেই তাঁর কাব্য-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া তাঁর উপস্থিতবুদ্ধি এবং হাস্য-রসিকতা সম্পর্কের সামান্য পরিচয়ও ওয়াতওয়াতের বক্তব্যে স্পষ্ট-ভাবে ধরা পড়েছে। তিনি যে শক্তিশালী কবি ছিলেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বিভিন্ন ধরনের কবিতা লিখে তিনি ফারসী কাব্য-সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন। তাঁর 'দিওয়ান' কাব্য সংকলনে সমিলের পনেরো হাজার ছত্র এবং কাসিদাধর্মী সত্তরটি স্তবক সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রখ্যাত সমালোচক সমরখন্দের নিজাম-ই-আরোদীর 'চাহার মাকালার' বক্তব্য অনুসারে ওয়াত-ওয়াতের 'দীওয়ান' মানে কাব্য সংকলনে এমন আন্তঃমিল সংযুক্ত উৎকৃষ্ট কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যে, এ ধরনের কবিতা ইউরোপীয় ভাষায় খুব কমই আছে। কয়েকটি আন্তর্জাতিক ভাষায় তাঁর রচনা অনূদিত হয়েছে। শুধু ফারসী ভাষায় নয়, আরবী ভাষায়ও তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। উল্লেখ্য যে, আরবী ও ফারসী ভাষায় বিভিন্ন গুণীজনের কাছে সুদীর্ঘ চিঠি লেখার অভ্যাস ছিল তাঁর স্বভাবজাত। পরবর্তীকালে তিনি চিঠি-পত্রগুলোও পুস্তকাকারে, 'সাদ কালিমা' বা

'হাজার রকমের কথা' নামে প্রকাশ করেন। পত্র-সাহিত্য পদবাচ্য এই গ্রন্থটি জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

'দীওয়ান' ও 'সাদ কালিমা' ছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান 'হাদায়েকুস্ সিহ্র' (যাদুর বাগানরাজি)। এই গ্রন্থটি তাঁর গবেষণার ফসল এবং এতে ফারসী কবিতার রূপবৈচিত্র্য এবং ছন্দঃ প্রকরণ সম্পর্কিত বিস্তৃত আলোচনা স্থান পেয়েছে। কাব্যালঙ্কার সম্পর্কে এমন তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ ইতিপূর্বে দ্বিতীয়টি রচিত হয়নি।

১১৮২ খ্রীষ্টাব্দে সাতানব্বই বছর বয়সে ওয়াতওয়াতের মৃত্যু হয়। খাবারিজম শহরের জোরজানাহ্ নামক স্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

ফারসী সাহিত্যের গৌরবময় যুগে রম্য-সাহিত্যের পরিধি বিস্তৃতির মূলে সুজানীর খ্যাতি সুবিদিত। কিন্তু আরোদী প্রমূখ সমালোচকদের মতে ওয়াতওয়াতের খ্যাতি আরও ব্যাপক।

সূফী জগতের অন্যতম হোতা ও তাপস শ্রেষ্ঠ মওলানা জালাল উদ্দীন রুমী ১২০৭ খ্রীষ্টাব্দে বলখে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা বাহাউদ্দীনও ছিলেন প্রখ্যাত সূফী-সাধক ও দার্শনিক। রুমী পাঁচ বছর বয়সে তাঁর বাবা ও মা'র সঙ্গে পবিত্র হজ্জব্রত পালন করেন। এই সময়ে তিনি পিতা-মাতার সাহচর্যে মধ্য-প্রাচ্যের দেশ সমূহ পরিভ্রমণ করেন। জানা যায় রুমীর বয়স যখন বারো বছর তখন তাঁর পিতা বাহাউদ্দীন তাঁকে শায়েখ ফরিদ উদ্দীন আত্তারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করান। সূফী কবি ও দার্শনিক আত্তার বালক রুমীর কথাবার্তায় অত্যধিক মোহিত হন এবং মন্তব্য করেন যে, 'এই বালক একদিন তাঁর প্রেমের আগুন দিয়ে এই পৃথিবীর প্রেমিকদের পোড়াবে।' আত্তারের বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়। কেননা, রুমী প্রেমের জগতে এমন আগুনের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন যে আগুনে প্রেমিকরা পুড়ে গিয়ে আল্লার সান্নিধ্য লাভ করতে সমর্থ হয়।

১২২৬ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ উনিশ বছর বয়সে রুমী 'গওহর' বা মুক্তা নাম্নী এক মেয়েকে বিয়ে করেন এবং তাঁদের ঘরে একটি

পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে এবং তাঁর নাম রাখা হয় সুলতান ওয়ালেদ। ১২৩১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পিতার মৃত্যু ঘটলে তিনি পিতৃ-ভূমি কোনিয়া ছেড়ে আলেপ্পো এবং দামেস্কে গমন করেন উচ্চ-শিক্ষার অভিপ্রায়ে। সূফীতত্ত্ব এবং আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান অর্জন করে তিনি কোনিয়ায় ফিরে আসেন এবং সেখানে তাঁর পিতৃ প্রতিষ্ঠিত কলেজে যোগদান করে জ্ঞান-বিতরণ শুরু করেন। এখানেই তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং অল্পদিনেই তাঁকে 'সুলতান উল্ উলামা' বা জ্ঞানজগতের শাসক আখ্যায় ভূষিত করা হয়। এই সময়ে তাঁর অনেক ভক্তেরও সমাগম হয়। ১২৭৩ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি এখানেই অবস্থান করেন এবং মৃত্যুর পর পিতার মাজারের কাছেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

মওলানা রুমীর সূফীতত্ত্বে সাফল্যের মূলে ফরিদ উদ্দীন আত্তারের আশীর্বাদ এবং সূফী-গুরু শামস-ই-তাব্রীজের সাহচার্য বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে। ১২২৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রখ্যাত সূফীদরবেশ শামস তাব্রীজ তাঁর নিজ দেশ তাব্রীজ থেকে কোনিয়ায় আগমন করেন এবং তাঁর জ্যোতির্ময় সূফীদর্শন তত্ত্বে আকৃষ্ট হয়ে রুমীর জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটে। বেশ কয়েক বছর রুমী তাঁর সাহচর্যে কাটান এবং সূফীতত্ত্বের দিব্যজ্ঞান অর্জন করেন। উল্লেখ্য যে, রুমীর শিষ্যেরা শামসকে পছন্দ করতেন না এবং তাঁরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলে শামস দামেস্কে চলে যান। কিন্তু রুমীর জীবনে নেমে আসে দারুণ বিয়োগব্যথা। প্রখ্যাত ঐতি-হাসিক আল্-আফলাকীর 'মানাকিবুল আরফীন' গ্রন্থের বক্তব্য অনুসারে রুমীর শ্রেষ্ঠ বেদনা-বিধুর কবিতাসমূহ নাকি রচিত হয়েছে শামস তাব্রীজের বিরহ-ব্যথা কেন্দ্র করে। এই গ্রন্থে আরও অনেক অলৌকিক কাহিনীও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

শামস তাব্রীজ চলে গেলে রুমী স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি তাঁর ছেলে সুলতান ওয়ালেদকে পাঠালেন দরবেশ শামস তাব্রীজের সন্ধানে। ছেলে তাঁকে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলে তখন শিষ্যরা তেমন উচ্চবাচ্য না করলেও কিছুদিন পর আবার বিরো-ধিতা শুরু করে এবং ১২৪৭ খ্রীষ্টাব্দে শামস তাব্রীজ আবার

অদৃশ্য হয়ে যান। এবার ছেলেকে না পাঠিয়ে নিজেই বের হলেন শামস তাব্রীজের খোঁজে কিন্তু এশিয়া মাইনর, সিরিয়া ইত্যাদি দেশ পরিভ্রমণ করে বিফল হয়ে ফিরে আসলেন। শামস তাব্রীজকে আর পাওয়া যায় নি, জানা যায় তাঁকে কে বা কারা হত্যা করেছিল। কিন্তু শামস তাব্রীজকে চিরদিনের জন্য পাওয়া গেছে রুমীর কবিতায়ঃ

তাব্রীজের কি গৌরব শামসের দীপ্ত মুখচ্ছবি,
আলোক বিকীর্ণ করা কি উজ্জ্বল তেজোদ্দীপ্ত রবি।
সে সূর্যের চার পাশে অজস্র মেঘের আনাগোনা,
যেন সে হাজার আত্মা খোঁজে ফেরে আলোকের কণা।

রুমী আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী এবং 'বর হক্ক' বা চির সত্যের সাধনায় উত্তীর্ণ হতে পারলেই সেই 'মহাসত্য' বা আল্লার সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায়। এবং এই চির সত্যের সন্ধানই রুমী পেয়েছিলেন শামস-ই-তাব্রীজের মধ্যে। শামস তাব্রীজকে উদ্দেশ্য করে যেমন রুমী বহু কবিতা লিখেছেন তেমনি অনেক কবিতা তাঁকে উৎসর্গও করেছেন।

সত্যের আলোকে স্নান করে নিজেকে পবিত্র করা যায় এবং সে আলোকই হচ্ছে প্রেম—আর এই প্রেম-সত্যই ধ্বনিত হয়েছে রুমীর সমগ্র রচনায়। তাঁর বিখ্যাত 'মসনবী' গ্রন্থ ছয় খণ্ডে সমাপ্ত এবং ছাব্বিশ হাজার কাব্য-ছত্র ছাড়াও রয়েছে নীতিকথা সম্বলিত কেচ্ছা-কাহিনী। কেচ্ছা-কাহিনীসমূহও সূফীতত্ত্ব ও আল্লার প্রেমে প্রোজ্জ্বল। উল্লেখ্য যে, কাহিনীগুলোতে পবিত্র কোরান, বাইবেল এমনকি সংস্কৃত সাহিত্যের 'পঞ্চতন্ত্র' এবং 'হিতোপদেশ' প্রভৃতি গ্রন্থের নীতিধর্মী কাহিনীর প্রভাব আছে।

'মসনবী'-এর পরেই তাঁর 'দীওয়ান'-এর উল্লেখ করতে হয়। এতে চল্লিশ হাজার গীতি-কবিতা বা গাথা সংকলিত হয়েছে। কবিতাগুলো সবই আধ্যাত্মিক প্রেম সম্পর্কিত এবং এসবের ভাষাও খুব সহজ, সরল এবং সাবলীল। তাঁর গদ্য রচনার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'ফিহ্ মা ফিহ্'। এতে তাঁর বিভিন্ন সময়ের বক্তৃতাবলী সংযোজিত হয়েছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঐতিহাসিক আল-আফলাকীর 'মানাকিবুল আরফীন' গ্রন্থের বক্তব্য অনুসারে রুমীর জীবন এক

বৈচিত্র্যময়তার অধিকারী এবং অনেক অলৌকিক ব্যাপার তাঁর জীবনে সংঘটিত হয়েছে। এই গ্রন্থে আমরা সেদিকে অগ্রসর হবো না। তবে একটি ব্যাপার এই যে, রুমীর জীবিত কালেই তাঁর অনেক শিষ্য সেবকের আবির্ভাব ঘটেছিল এবং মৃত্যুর পরে শিষ্যের সংখ্যা আরও বহু গুণে বেড়ে যায় এবং বর্তমানেও ইরান ছাড়া মিশর, কন্‌সটান্‌টিনোপাল প্রভৃতি দেশে তাঁর অসংখ্য ভক্ত রয়েছে। এই ভক্তরা 'মৌলালী' নামে একশ্রেণীর দরবেশ এবং তারা বিশেষ ধরনের পোশাক পরে বাঁশী ও ঢোল সহকারে নৃত্যের মাধ্যমে সামা-সঙ্গীত গায়। সঙ্গীতগুলোর অধিকাংশই রুমীর 'মসনবী' ধারার গীতি কবিতা বা গজল। রুমীর 'মওলানা' অর্থাৎ 'আমাদের প্রভু' এই খেতাব সেই ভক্তদেরই প্রদত্ত। উল্লেখ্য যে, 'মৌলালী'-দের উদ্ভব ঘটে রুমীর নাতি চালাবী আমির আরাফ থেকে এবং এটা শুরু হয় ১৩১০ খ্রীষ্টাব্দে। এই ধারা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১২৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রুমীর মৃত্যু হয় এবং কোনিয়াতে তাঁর পিতার মাজারের পাশেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। বলা যায় যে, রুমীর মাজার আজও অগণিত ভক্তদের কাছে শ্রদ্ধার বস্তু। দূর দূরান্ত থেকে বহু ভক্ত সেই মাজার সে জিয়ারতে ভীড় জমায়। রুমীর মাজার তীর্থস্থান হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

রুমীর কাব্য-ভাবনা সম্পর্কে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ তাঁর 'মসনবী শরীফ' থেকে কিছু অনুবাদ পেশ করছি ঃ

> "বাঁশীর আওয়াজ শোনো, করুণ কাহিনী তার সুরে—
> বিয়োগ ব্যথার কথা সেই সুরে আসে ঘুরে ঘুরে।
> বাঁশীটি বলছে, 'আহা আমাকে তো কেটে বাঁশ থেকে
> মানব দুঃখের কথা সুর তোলে বলে একে একে।
> ছেঁড়া খোড়া এ হৃদয়ে বিদায়ের সকরুণ সুর—
> প্রেমের রহস্য করে উন্মোচিত—বিয়োগ-বিধুর।
> মূল থেকে চলে এসে, মূলে ফিরে যাবার ইচ্ছায়
> এমন সুখ ও দুঃখ সুরের ভিতরে বাজে হায়!'

সবাই ধারণা করে সে আমার আপন আপন—
কেউ তো বলে না আহা, আমার এ রহস্য গোপন।
বাঁশীর করুণ সুর বায়ু নয়, দীপ্ত অগ্নি শিখা—
এ অগ্নি যার না আছে, মিশে যাবে। অগ্নির দাহিকা
সেই তো প্রেমের গতি সুরা-মাঝে ছুটে চলে, চলে · ···

রুমীর জীবনের এমন সব ঘটনা আল-আফলাকীর 'মানাকিবুল আরফীন' গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে যে, সেসব বিষয় এক ভিন্ন চিন্তার উদ্রেক করে। বিশেষ করে 'মৌলালী দরবেশদের' জীবন যাত্রা, তাঁদের বাদ্যসহকারে সামা-সঙ্গীত পরিবেশেন রীতি এবং বিশেষ ধরনের কাপড় পরিধান করার পদ্ধতি। একটা ঘটনা উল্লেখ করছি ঃ

একবার রুমীর এক শিষ্য মারা গেলেন। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে আলোচনা শুরু হলো যে তাকে কাফন পরিবৃত করে, না কাফন বিহীন অবস্থায় দাফন করা হবে।

রুমীকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি শিষ্যদের মতের উপর ছেড়ে দিলেন। কিন্তু একজন শিষ্য এসে বললেন যে, তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদেরকে কাফন ছাড়া দাফন করাই শ্রেয়ঃ। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো 'কেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'মা তাঁর সন্তানের রক্ষণা-বেক্ষণের ব্যাপার ভালো করেই জানেন। এ ব্যাপারে ভাইদের নাক গলানো ঠিক নয়। পৃথিবী মানবজাতির মা সদৃশ; কাজেই, কাফন ভাই বলে বিবেচিত। মৃতদেহ শায়িত করানো হয় মায়ের কোলে, ভাইয়ের কাছে নয়—পৃথিবীমাতাই এ দায়িত্ব নেন।

শিষ্যের এই বুদ্ধিতে রুমী প্রশান্তির হাসি হাসলেন কিন্তু কিছু বললেন না।

এই সময়কার আর একজন উল্লেখযোগ্য কবি ও সমালোচক হাকীম আজরাকী। আজরাকীর পুরো নাম আবুল মাহাসীন আবু বকর জানী-উদ্দীন আজরাকী। তাঁর 'দীওয়ান' কাব্য সংকলনে দুই হাজার সমিল কাব্য-ছত্র সংকলিত হয়েছে। তিনি একাধারে কবি, চিকিৎসা-বিজ্ঞানী এবং সুলেখক। চিকিৎসা-বিজ্ঞানী বলেই

তাঁর নামের সঙ্গে 'হাকীম' কথাটি সংযুক্ত হয়েছে। তাঁর গদ্য রচনার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'সিন্দবাদ ওয়া হিন্দবাদ।' সমগ্র ইউ-রোপে গ্রন্থটির খ্যাতি সুবিদিত এবং ইংরেজী ভাষায় গ্রন্থটির রূপান্তর বেশ সমাদর লাভ করেছে। তাঁর আর একটি গদ্য রচনা 'আল-ফিয়াহ্ ওয়া সালফিয়াহ্'। এই গ্রন্থটিতে যৌন-রহস্যের ব্যাখ্যা আশ্রয় লাভ করেছে এবং গ্রন্থটি প্রখ্যাত সংস্কৃত লেখক বাৎসায়নের 'কামসূত্রের' প্রভাব আছে। তাছাড়া তাঁর ইতিহাস-গ্রন্থ 'তারিখ-ই-মক্কা মু'য়াজ্জমা'ও বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। হেরাতে ১১৮৯ খ্রীষ্টাব্দে হাকীম আজরাকীর মৃত্যু হয়।

ফারসী সাহিত্যের গৌরবময় যুগে ভারতীয় কবি-সাহিত্যিকরাও বিশেষ অবদান রেখেছেন। ভারতীয় কবিদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য রোকন উদ্দীন হামজা, রাশীদ শিহাব এবং খাজা মঈন উদ্দীন চিশ্তী। এঁদের মধ্যে রাশীদ শিহাব গজনীতে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি স্থায়ীভাবে লাহোরে অবস্থান করেছেন। কবি হিসেবে ছিলেন তিনি খুবই শক্তিশালী। তাঁর একটি গীতি-কবিতার অনুবাদ এইরূপ ঃ

কয়েকটি মনোরম নার্সিসাস শাখা
কয়েকটি সদ্যফোটা কুড়ানো গোলাব···
মনে হয় মুখহীন চোখের বিকাশ
অথবা সে চোখহীন মুখের বিস্ময়।······

অন্যতম তাপস-শ্রেষ্ঠ ও সূফী সাধক খাজা মঈন উদ্দীন চিশতী দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইস্পাহানে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার সঙ্গে তিনি খোরাসানে গমন করেন এবং ফারসী মরমী কবিদের কেন্দ্রভূমি নিশাপুরে শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর আফগানিস্তানের হেরাতে অবস্থান করে চিশতীয়া তরিকাভুক্ত সুফীতত্ত্বে জ্ঞান লাভ করে ভারতে আগমন করেন। কিছুদিন তিনি তাঁর পূর্ববর্তী সাধক লাহোরে অবস্থিত হুজবিরীর মাজারে অবস্থান করেন। উল্লেখ্য যে, এই সময়ে তিনি পাঁচ বছরেরও অধিককাল সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করে হিন্দুশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

লাহোর, মুলতান ইত্যাদি স্থান পরিভ্রমণ করে তিনি হিন্দুদের কেন্দ্রভূমি রাজপুতনায় চলে আসেন এবং অতঃপর আজমীরে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। এটা মোহাম্মদ ঘোরীর দিল্লী বিজয়ের পূর্ববর্তী ঘটনা। তাঁর অমায়িক ব্যবহার, ধর্মপ্রাণতা এবং মহৎ গুণাবলীতে হিন্দুরাও দলে দলে শিষ্যত্ব গ্রহণ শুরু করলো। সাতা-নব্বই বছর বয়সে এই সূফী সাধক আজমীরে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মাজার শরীফ হিন্দু-মুসলমান উভয়ের কাছে তীর্থস্থান স্বরূপ।

কবি হিসেবেও তাঁর খ্যাতি সুবিদিত। তাঁর কাব্যে সূফী-দর্শন স্পষ্ট এবং আধ্যাত্মিকতার স্পর্শে উজ্জীবিত। একটা উদাহরণ দিচ্ছি ;

আমার একক বন্ধু আমার হৃদয়ে বাস করে ;
রাজার গোপন কক্ষে রাজা ছাড়া প্রবেশ নিষেধ।
একজন রাজা আছে আমার এ হৃদয় প্রাসাদে ;
যদি সে বাইরে থাকে সাগর জমিন সবকিছু
তখন আমার কাছে জানি একান্তই ক্ষুদ্র মনে হয়।...

ফারসী সাহিত্যের গৌরবময় যুগের গদ্য রচনার উল্লেখে বলা যায় যে, এই দীর্ঘ সময় সীমায় যেসব কবিদের আবির্ভাব ঘটেছে তাঁরা কাব্য-রচনার পাশাপাশি গদ্য রচনাও করেছেন এবং এ সম্পর্কে প্রত্যেক কবির আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁদের গদ্য রচনা অর্থাৎ ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভুগোল, জ্যোতিষশাস্ত্র, সঙ্গীত শাস্ত্র, অলঙ্কার শাস্ত্র, যৌন-শাস্ত্র, ভেষজ বিজ্ঞান, ভ্রমণ কাহিনী, চিঠিপত্র, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়ছে। উল্লেখ্য যে, গৌরবময় যুগের তিনজন 'মসনবী' রচয়িতা যেমন সানাই, আত্তার ও রুমী তাঁদের 'মসনবী'তে যে কেবল কবিতাই সন্নিবেশিত করেছেন তাই নয় সেখানে রয়েছে, রাজা-বাদশাহ, সামাজিক জীবন-চিত্র, নীতি-কথা, পশু-পাখীর জীবন-কথা ও পীর-পয়গম্বরদের জীবন-চরিত সম্বলিত অনেক শিক্ষামূলক কাহিনী এবং এগুলোও গদ্য-রচনার নমুনা।

তবুও এমন সংখ্যক ঐতিহাসিক ও গদ্য-লেখক রয়েছেন যাঁরা জীবনে সাবলীল গদ্য রচনার জন্যই অমর হয় আছেন। এ প্রসঙ্গে সমরখন্দের নিজাম-ই-আরোদীর 'চাহার মাকালা', কাবুস বা কায়-

কাউসের শিক্ষা ও উপদেশাবলীতে পূর্ণ চুয়াল্লিশ খণ্ডে সমাপ্ত 'কাবুস-নামা' ইত্যাদির উল্লেখ বহুবার করা হয়েছে। গদ্যরচনায় এই সময়কার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে নিজাম উল-মুলকের। ওমর খৈয়্যামের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু নিজাম উল-মুলক খোরাসানের তুস নগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি সালজুক সুলতানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। সুচারুরূপে রাজকার্য পরিচালনা করা ছাড়াও তিনি ছিলেন একজন উচ্চমানের গদ্য-লেখক; শিল্প-সাহিত্য, সঙ্গীত ও বিজ্ঞানের সমঝদার। শিক্ষার প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল অসাধারণ। 'নিজামীয়া বিশ্ববিদ্যালয়' নামে খ্যাত বলখ, হেরাত, নিশাপুর, বাগদাদ প্রভৃতি স্থানের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলো আজও নিজাম-উল মুলকের স্মৃতি বহন করে অম্লান রয়েছে। কেননা এসব তিনিই প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন। শিক্ষার প্রতি যে তাঁর অনুরাগ ছিল উপরোক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ সে কথাই সপ্রমাণ করে।

নিজাম উল-মুলকের শ্রেষ্ঠ রচনা 'সিয়াসত নামা' (রাজনীতি বা শাসন পদ্ধতির গ্রন্থ)। পঞ্চান্ন অধ্যায়ে সমাপ্ত এই সুবৃহৎ গ্রন্থটি ১০৯১ থেকে ১০৯২ সালের মধ্যে লিখিত হয় এবং গ্রন্থটিতে রাজা, মন্ত্রী, বিদেশের সঙ্গে সম্পর্ক, রাজ্যশাসন, শাসন সংক্রান্ত নিয়মাবলী, জাতি, ধর্ম, উপদেশ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা স্থান পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইসমাইলীয়া সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, নীতি এবং উদ্ভব সম্পর্কিত এমন নিখুঁত চিত্র অন্য কোথাও চিত্রিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। ১০৯২ খ্রীষ্টাব্দে নিজাম উল-মুলককে হত্যা করা হয় এবং এই কর্ম সম্পাদন করে তাঁরই সহপাঠী সন্ত্রাসবাদী নেতা হাসান বিন সাবাহ্-এর অনুগামী লোকেরা। 'সিয়াসত নামা'র ভাষা অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল।

ফারসী সাহিত্যের গৌরবময় যুগের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা প্রখ্যাত আরবী লেখক আবদুল্লাহ্ ইবনে মুকাফ্ফার 'কালিলা ওয়া দিমনার' ফারসী অনুবাদ। এই দুরূহ কাজটি সম্পাদন করেন নাসর আল্লাহ ইবন মোহাম্মদ। ১১৪৪ সালের মধ্যে তিনি 'কালিলা ওয়া দিমনার' অনুবাদ সমাপ্ত করেন। নাসর-আল্লাহ লাহোরের শেষ গজনবী সুলতানের প্রাধানমন্ত্রী পদে পর্যন্ত উন্নীত হয়েছিলেন।

এই সময়কার উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিকদের মধ্যে রয়েছেন ইবন আল বলখী, আলী বিন জায়েদ বায়হাকী, ইবনে ইসফনেদীয়ার, রাভান্দী, ইবনে জাফর, ইবনে মুনাব্বার, সোহরাওয়ার্দী, আওফী, মিনহাজ সিরাজ প্রমুখ। ইতিহাসের বিভিন্ন শাখা যেমন দেশ, জাতি, রাষ্ট্র. রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম, উপদেশ সম্বলিত ঐতিহাসিক কাহিনী ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁরা গবেষণাধর্মী আলোচনা করেছেন। এঁদের উল্লেখযোগ্য ইতিহাস-গ্রন্থের মধ্যে ইবন আল্ বলখীর 'ফারস নামা'; আলী বিন জায়েদ বায়হাকীর 'তারিখ ই-বায়হাকী'; ইবনে ইসদানদীয়ারের 'তারিখ-ই-তাবারিস্তান'; রাভানদীর তারিখ-ই-সালজুক'; ইবনে জাফরের বিখ্যাত আরবী ঐতিহাসিক উতবীর 'তারিখ আস্-সুলতান মাহমুদে'র ফারসী অনুবাদ 'তারিখ-ই-সুলতান মাহমুদ'; আওফীর 'লুব' এবং 'তারিখ-ই-আদাব'; মিনহাজ সিরাজের 'তারিখ-ই-গজনবী, ঘোরী ওয়া সুলতানুল হিন্দ' ইত্যাদির নাম করা যায়। প্রত্যেকটি গ্রন্থই খুব তথ্য-সমৃদ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য সূত্র দ্বারা গ্রথিত।

উপরোক্ত গ্রন্থসমূহের মধ্যে আওফীর 'তারিখ-ই-আদাব' এবং 'লুবাব' একটু ভিন্ন স্বাদের ভিয়েনে পূর্ণ। 'তারিখ-ই-আদাব' তিনি ১২২৮ সালের মধ্যে সিন্ধু প্রদেশে অবস্থানকালে রচনা করেন। এবং এই গ্রন্থে ফারসী সাহিত্যের তৎকালীন পূর্ণ ইতিহাস সন্নিবেশিত হয়েছে। এই ধরনের সাহিত্যের ইতিহাস ইতিপূর্বে আর দ্বিতীয়টি রচিত হয় নি।

'হেকায়েত নামা' গ্রন্থটিও নানা কারণে উল্লেখের দাবি রাখে। এতে সাহিত্যের কিছু আলোচনা স্থান পেলেও এই গ্রন্থের সবচেয়ে যা উপভোগ্য তা এই যে, এতে দুই হাজারেরও অধিক উপদেশধর্মী গল্প সন্নিবেশিত হয়েছে। গল্পগুলো সত্যি হৃদয়ে দাগ কাটে। গ্রন্থটি তিনি দিল্লীর প্রথম স্বাধীন সুলতান কুতুব উদ্দিন আইবেকের জামাতা সুলতান ইলতুতমিশকে উৎসর্গ করেন। আওফী সুলতান কুতুব উদ্দিন আইবেকের রাজদরবারে চাকরিও করতেন এবং তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দিল্লীতেই কাটিয়েছেন যদিও তাঁর জন্ম হয়েছিল আফগানিস্তানে।

মিনহাজ সিরাজের 'তারিখ-ই গজনবী, ঘোরী ওয়া সুলতানুল হিন্দ' গ্রন্থটিও ফারসী ইতিহাস-সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। মিনহাজ সিরাজ তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে গজনবী, ঘোরী এবং ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমান সুলতানদের পরিচয় এমন সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন যে, তা পড়তে গেলে মনে হয় তা উপন্যাসের স্বাদে ভরপুর। প্রসঙ্গতঃ সম্রাজ্ঞী রাজিয়ার উল্লেখ করা যায়। রাজিয়ার সাহসিকতাপূর্ণ জীবন-কাহিনী তিনি এমন নিখুঁতভাবে চিত্রিত করেছেন যে, তা শুধু আমাদের উৎসাহেরই উদ্রেক করেনা— আমাদের গৌরব বলেও স্বীকার করে নেয়া যায়। বলা যায়, ফারসী সাহিত্যের গৌরবময় যুগ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গৌরবের চিহ্নেই চিহ্নিত।

৩

আধুনিক-পূর্ব যুগ

ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত সময়সীমাকে ফারসী সাহিত্যের আধুনিক-পূর্ব যুগ বলে চিহ্নিত করা হয়। এই সুদীর্ঘ সময়কালে অর্থাৎ প্রায় সাতশত বছরে ফারসী সাহিত্যের অঙ্গন প্রথম কয়েক শতাব্দী যেমন বেশ কিছুসংখ্যক কবি-সাহিত্যিক দীপ্ত প্রতিভার আলোকে উজ্জ্বল করে রেখেছিলেন তেমনি পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ফারসী সাহিত্যের গতিতে মন্দা ভাবও লক্ষ্য করা গেছে। রাজ-শাসনের পৃষ্ঠপোষকতা যে সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করতে পারে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখিত সূচনা-পর্ব এবং গৌরবময় যুগে লক্ষ্য করেছি। আধুনিক-পূর্ব যুগেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

দশম, একাদশ এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট আমরা লক্ষ্য করেছি। গজনবী, সালজুক, ঘোরী এবং তৎপরবর্তী শাসকদের নানা টানা-পোড়েনেও আমরা ফারসী সাহিত্যের শরীরে কলঙ্করূপ ক্ষতচিহ্নের উদ্ভব ঘটাতে দেখিনি। কিন্তু এর আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চেংগীজ খানের আবির্ভাবে। ১২১৯ সালে চেংগীজ খান তুর্কীস্তান, খোরাসান, সেইস্তান এবং আজারবাইজানে অভিযান চালান এবং ১২২৭ সাল অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত লুঠতরাজসহ অভিযান অব্যাহত থাকে। ফলে স্কুল, কলেজ, পাঠাগার ইত্যাদি তো নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়ই, তদুপরি চলে নৃশংস হত্যাকাণ্ড। এই হত্যাকাণ্ডের শিকারে বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক, কবি-সাহিত্যিক অনেকেই নিপতিত

হন এবং অনেকে প্রাণরক্ষায় দেশত্যাগ করেন। সমগ্র ইরানীয় ভূখণ্ড তখন শ্মশানে পরিণত হয়।

উল্লেখ্য যে, ইতিহাস-খ্যাত অত্যাচারী এই চেংগীজ খান সম্পর্কে আতা মালিক-ই-জুবায়নীর 'তারিখ-ই-জাহান গুশা' (বিশ্ব বিজয়ীর ইতিহাস) গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তবে একটি আশ্চর্য ঘটনা এই যে, সানজর রাজদরবারের কবি আনওয়ারী গণনা করে একবার বলে দিয়েছিলেন যে, দেশে ঝড়ের তাণ্ডবলীলা হয়ে যাবে এবং তিনি দিনক্ষণও ঘোষণা করেছিলেন। ঘটনাক্রমে সেদিন ঝড় হয়নি এবং কবি আনওয়ারী রাজরোষে পতিত হয়েছিলেন কিন্তু পরে জানা যায় সেই সময়ে জন্মগ্রহণ করে ঝড়ের তাণ্ডবলীলার চেয়েও ভীতিপ্রদ দুর্ধর্ষ চেংগীজ খান। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বেও সামান্য ইংগিত দেওয়া হয়েছে।

ফারসী সাহিত্যের কালক্রম বর্ণনায় আমরা রাজনৈতিক সম্পর্কিত বিশদ আলোচনায় অগ্রসর হবো না। তবে সংক্ষেপে এই টুকুই বলবো যে, ১২৫৬ সালে চেংগীজ খানের পৌত্র হালাকু খান যখন ইরানীয় ভূখণ্ডের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন তখন তিনি পূর্ব-পুরুষ চেংগীজ খানের প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণের ব্রত অবলম্বন করেন এবং সেই সঙ্গে মুসলিম গৌরব পুনরুদ্ধারে বদ্ধপরিকর হন। ফলে দেশের সাহিত্যিক, কবি, বুদ্ধিজীবী সকলকে সাদরে আহবান জানান এবং দেশবিদেশ থেকে পণ্ডিত ব্যক্তিদেরও আবির্ভাব ঘটান। এই সময়ে অন্যান্য রাজন্যবর্গরাও মোংগলদের শাসন মেনে নেয় এবং দেশে একটা স্থিতি অবস্থা ফিরে আসে। তখন রাজশক্তিও তৎপর হয়ে উঠেন দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নতি বিধানে। কেননা যে দেশ শিল্প ও সাহিত্যে যত উন্নত বিশ্বের দরবারেও তার আসন তত উন্নত। তাই দেখা যায়, ফারসী সাহিত্যের আধুনিক-পূর্ব যুগেও মোংগল, তৈমুর এবং তৈমুর পরবর্তী শাসকদের কার্যকরী ভুমিকা সাহিত্যের উন্নতি বিধানে যথেষ্ট ক্রিয়া করে।

আধুনিক-পূর্ব যুগের কবিদের উল্লেখে প্রথমেই নাম করতে হয় সাদী (রঃ)-এর। তাঁর পুরো নাম শায়েখ মাসলাহ্ উদ্দীন সাদী আল-সিরাজী এবং সর্বসাধারণের কাছে তিনি সাদী নামেই পরিচিত। তাঁর জন্ম হয় ১১৮৪ (কেউ কেউ যেমন ব্রাউন, আরবেরী, আরবুথনট

প্রমুখ ১১৮৫, ১১৯১, ১১৯৩ সাল বলে উল্লেখ করেছেন) খ্রীষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ঘটে ১২৯২ (কেউ কেউ জন্ম সালের মতো মৃত্যু তারিখও ১২৯১, ১২৯৩ বলে উল্লেখ করেছেন) খ্রীষ্টাব্দে।

সাদীর সুদীর্ঘ জীবনকে প্রধানতঃ তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন শিক্ষা জীবন, ভ্রমণ-কেন্দ্রিক জীবন এবং সাহিত্য জীবন। জন্মকাল থেকে শুরু করে ১২২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর শিক্ষা জীবন এবং এই সময় তিনি বাগদাদেই অতিবাহিত করেন। বাগদাদ কলেজে শিক্ষালাভ সমাপ্ত করে তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন এবং শিক্ষা গ্রহণ উভয়ের জন্য বিশ্ব ভ্রমণের প্রস্তুতি নেন। উল্লেখ্য যে, বাগদাদের শিক্ষা জীবনে তিনি প্রখ্যাত সূফী-সাধক শেখ শিহাব উদ্দীন সোহরাওয়ার্দীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন এবং জানা যায় এই মহাপ্রাণ সুফী সাধকের প্রভাবেই তিনি সুফী-দরবেশে উন্নীত হন।

১২২৬ সাল থেকে ১২৫৬ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ সুদীর্ঘ তিরিশ বছর তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যেমন সিরিয়া, হেজাজ, মিশর, ভারতবর্ষ ইত্যাদি পরিভ্রমণ করেন। জানা যায়, তিনি এই সময়ে চৌদ্দবার পবিত্র হজ্জব্রতই পালন করেন। বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে যে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান তিনি অর্জন করেন সে সম্পর্কে তাঁর নিজের জবানীতেই শোনা যাক ঃ

> ভ্রমণ করেছি আমি পৃথিবীর দেশ-দেশান্তরে,
> সকলের সাথে কথা নির্বিঘ্নে বলেছি প্রাণ ভরে।
> আমার লাভের অঙ্ক সর্বত্র বেড়েছে বহু গুণে,
> নতুন কানের জন্ম হয়েছে তাদের কথা শুনে।

১২৫৬ সাল থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর কাল তিনি অতিবাহিত করেছেন শিরাজে এবং এই সময়কালই তাঁর সুফী ও সাহিত্য-জীবন। সাদীর সাহিত্য-দর্শন তাঁর নিজের বক্তব্যেই সুস্পষ্ট। তাঁর দর্শন-তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'আমার দর্শন-তত্ত্বের সন্ধান আমি পেয়েছি অন্ধের কাছ থেকে। কারণ অন্ধ লোকেরা সম্মুখের পথ পরীক্ষা না করে একটি পা'ও অগ্রসর হয় না।' এতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, সাদী তাঁর সাহিত্যকর্ম

সম্পর্কে কতটা সতর্ক ছিলেন এবং তাঁর সমগ্র সাহিত্য-কর্মে এই দর্শন পরিব্যাপ্ত। এবং এজন্যই শুধু সাদীর সাহিত্য নয় সেই সঙ্গে সাদী নিজেও সমগ্র বিশ্বে নন্দিত এবং শ্রদ্ধেয়।

ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতে সাদী ফারসী সাহিত্যে এক আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। কেননা এমন সহজ, সরল এবং সাবলীল ভাষায় ইতিপূর্বে আর কেউ লেখেন নি। অথচ প্রত্যেকটি রচনায়ই রয়েছে সূক্ষ্ম অনুভূতি এবং দর্শনের তত্ত্বকথা। আরবী ও ফারসী উভয় ভাষায় তিনি ছিলেন অত্যধিক সুপণ্ডিত এবং এই দুই ভাষায়ই তিনি সমৃদ্ধ করেছেন তাঁর সাহিত্য-কর্ম।

কাব্যের সুললিত ঝংকার সমন্বিত উপদেশধর্মী বিভিন্ন ধরনের গল্প সম্বলিত 'গুলিস্তাঁ', 'বোস্তাঁ', আরবী ও ফারসীর কাসিদা, গজল, গজলিয়্যাত কাদিমা, তায়্যেবাত, খাওয়াতিন ইত্যাদি ধর্মীয় কবিতা ও গল্পের সংকলন 'কুল্লিয়াত' তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান। গদ্য ও পদ্য রচনা নিয়ে তাঁর সর্বমোট গ্রন্থের সংখ্যা চব্বিশটি। এসবের মধ্যে 'আল-খাবিসাত' (অপবিত্রতা) গ্রন্থ সম্পর্কে সাদী নিজেই বলেছেন, 'এটি অন্যান্য রচনার গায়ে প্রলেপের জন্য লবণ স্বরূপ। লবণ দিয়ে যেমন মাংস দীর্ঘদিন ঘরে টিকিয়ে রাখা হয় তেমনি অন্যান্য রচনা দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য আল-খাবিসাত-এর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।'

'বোস্তাঁ'র উপদেশধর্মী গল্পগুলোর মধ্যে মাঝে মাঝে সন্নিবেশিত হয়েছে কবিতা—ঠিক যেন সোনার উপর সোহাগার মতো। উল্লেখ্য- যে, বোঁস্তা ও গুলিস্তাঁ উভয় গ্রন্থ রচনায়ই তিনি প্রখ্যাত সূফী কবি সানাই-এর 'হাদিকাতুল হাক্‌কাত' এবং আত্তারের 'ইলাহী নামা' ও 'রিয়াজুল আরফীন' গ্রন্থ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। গুলিস্তাঁ ও বোস্তাঁ গ্রন্থে কি ধরনের রচনা সন্নিবেশিত হয়েছে নমুনা স্বরূপ 'গুলিস্তাঁ' থেকে একটি নমুনা উদ্ধৃত করছি ঃ

'তারা লোকমানকে জিজ্ঞেস করলো, 'কাদের কাছ থেকে আপনি নম্রতা-ভদ্রতা শিক্ষা করেছেন ?' তিনি উত্তর দিলেন, 'অভদ্র ব্যবহার, এবং অনম্র স্বভাব যা' আমি তাদের মধ্যে লক্ষ্য করেছি তা' বর্জন করেই আমি নম্রতা-ভদ্রতা অর্জন করেছি।'

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাদীর সমগ্র রচনায়ই রয়েছে সূক্ষ্ম-অনুভূতি, প্রকাশভঙ্গীর সাবলীতা এবং উপদেশের উজ্জ্বল-স্বভাব

যা ইতিপূর্বে কোনো কবির রচনায় লক্ষ্য করা যায় নি। তিনি এমন সুন্দর ভাবে কথা বলতে পেরেছেন বলেই জামী তাঁকে 'বুলবুল-ই-সিরাজ', সিরাজের বুলবুল বা মধুকণ্ঠ বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। সেই নাম আজও অক্ষুন্ন রয়েছে।

সাদীর কাসিদা, গজল ও গজলিয়্যাতে কাদিমা ওয়া তায়্যেবাত কখনো আধ্যাত্মিকতা ও সূফী-দর্শনের জ্বলন্ত স্বাক্ষর, কখনো নর-নারীর প্রেম বর্ণনায় মুখর আবার কখনো সুখ-দুঃখ ও মানবতার জয়গানে ভাস্কর। নমুনা স্বরূপ দু'একটা কাব্যানুবাদ উল্লেখ করছি ঃ

১. গুলিস্তাঁ থেকে

ক. সমস্ত মানব জাতি এসেছে একই উৎস থেকে,
একজন ব্যথা পেলে অন্যজন কি করে স্থির থাকে?
অপরের দুঃখে যদি কেবলি নীরব থাকো তুমি
তাহলে মানব নামে কলঙ্ক লেপন করো তুমি।

খ. বন্ধু নিয়ে জেলে থাকো, সেই ভালো, মনে শান্তি পাবে,
অচেনা লোকের সাথে বাগানে ভ্রমণ করে কভু
কেউ কি পেয়েছে আহা শান্তি কোনো কালে?

গ. যার কোনো ঘর নেই সারাটি পৃথিবী তার ঘর,
যেখানেই রাত্রি নামে সেখানেই সাধুদের ঘর।

ঘ. খারাপ রমণী যদি থাকে কভু সে সৎ-সংসারে
সে সংসার হয় যেন নরক-সদৃশ।
সংসর্গে আসার আগে বন্ধু চিনে নাও।

২. বোস্তাঁ থেকে

ক. আমার মতোন কেউ শিশুদের দুর্ভোগ বোঝেনা,
যেহেতু শৈশব কালে আমার পিতার মৃত্যু হয়;
আমার মাথায় আমি তখন মুকুট পরে থাকি,—
যখন দুঃখীর দুঃখ আমার মাথার, পরে রয়।

খ. অনাথে আশ্রয় দিয়ে মুখ থেকে ধুলো ঝেড়ে নাও,
এবং তার পা থেকে সহাস্যে সে কাঁটা তুলে দাও;

যখন অনাথ কাঁদে তোমার সম্মুখে দুঃখ ভরে,
তখন দিওনা চুমো তোমার ছেলের মুখ, পরে।

গ. যে নিজে না খেয়ে থেকে অন্যদের খাদ্য দান করে,
সেই ভালো, তার কাছে রোজা রাখা শ্রেয় শত গুণে;
না হলে অযথা কেন নিজেকে এমন কষ্ট দেয়া—
অসময়ে খাওয়া তার সময়ের স্তুতি বাক্য শুনে?

৩. গজল থেকে

এই কি বসন্ত হাওয়া? নাকি সে আমার প্রেয়সীর
দেহের সুঘ্রাণে ভরা মায়াময় বার্তা সুরভির।
প্রেমের মায়াবী ফাঁদে যে পাখী আটকা আছে পড়ে—
আসবে না ফিরে তুমি বিশ্রামের এই অবসরে?
সমগ্র রজনী আমি মোমের মতোন জ্বলি একা,—
মোম-অগ্নি দেখা যায়, অন্তরের অগ্নি যায় দেখা?
প্রতিটি মুহূর্ত আমি তোমার প্রতীক্ষা করে থাকি,
টুংটাং শব্দে বলি, 'তোমায় কারাভাঁ এলো নাকি?'
পৃথিবীতে সুখে আছি, যেহেতু প্রিয়ার মুখ-চ্ছবি
কেমন মায়ায় ঘিরে রেখেছে এ পৃথিবীর সবই।

বিষের পেয়ালা আমি কি আনন্দে দিতে পারি মুখে
আমার প্রেয়সী যদি সাকী হয় মহা উৎসুকে!
সহাস্যে যন্ত্রণা আমি নিতে পারি, যদি যন্ত্রণায়
আমার প্রেয়সী এসে সুকোমল দু'হাত বুলায়।
বেদনা-জখম সব কিছু নয় এ আমার কাছে—
যতক্ষণ প্রেয়সীর মায়াবী মালিশ জানা আছে।
আনন্দ ও দুঃখ সব একাকার প্রেম-মহিমায়,
হে সাকী শারাব দাও, যন্ত্রণা মিশবে পিয়ালায়।

প্রেমের দিনের মতো একটিও নেই দীপ্ত দিন—
প্রেমের প্রভাত আসে—আসে নাকো সাঁঝ সে মলিন।

গায়ক সে চলে যায়, গান তার মনে জেগে রয়—
প্রেমের আরম্ভ আছে শেষ তার নেইকো নিশ্চয়।...

ত্রয়োদশ শতাব্দীর আর একজন উল্লেখযোগ্য কবি ইস্পাহানের কামাল উদ্‌দীন। তিনি সাদীর সমসাময়িককালে জন্মগ্রহণ করেন। তবে তিনি খুব বেশী দিন জীবিত ছিলেন না এবং খুব সম্ভব ১২৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাঁর পিতা জালাল উদ্‌দীনও ফারসী কাব্য-জগতে অন্যতম নামকরা কবি ছিলেন। কামাল উদ্‌দীনের অধিকাংশ কবিতাই স্তুতিবাচক এবং সেসব কবিতা খাবারিজম-এর শেষ সুলতান এবং তাঁর পুত্রের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। এঁরা উভয়েই চেংগীজ খানকে বাধা দিয়ে সাহসিকতার পরিচয় প্রদান করেছিলেন। তদুপরি তাঁরা সাদীর প্রতি ছিলেন অতিমাত্রায় অনুরক্ত। মোংগলগণ যখন ইস্পাহান আক্রমণ করে পাশবিকতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে তখন এই কবি অল্প বয়সেই নিহত হন।

কামাল উদ্‌দীন জন্মগ্রহণ করেন অত্যধিক ধনী পরিবারে এবং ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন অত্যধিক অমায়িক এবং উদারপন্থী। এজন্য তাঁর সমসাময়িকগণ তাঁকে অবজ্ঞার চোখে দেখতো এবং এই মানসিকতার পরিচয় তিনি তাঁর কাব্য-কর্মেও কিছুটা বিধৃত করেছেন। তাঁর অধিকাংশ কবিতাই স্তুতিবাচক। তবে সূফীদর্শন ভারাক্রান্ত কিছু কিছু কবিতাও সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মোংগল আক্রমণের ভয়াবহতা চিত্রিত করেও তিনি কিছু কবিতা লিখেছেন। মোংগল হত্যাকাণ্ড সম্পর্কিত কয়েকটি লাইন এইরূপ ঃ

দেশের জন্য করবে দুঃখ এমন কেউ তো বেঁচে নেই,
অসৎদেরে করবে ঘৃণা এমন কেউ তো বেঁচে নেই!
কালকে ছিল হাজার জন একটি লোকের জানাজায়,
আজকে নেই একটি লোক হাজার লোকের শোকে হায়!

মোংগল হত্যাকাণ্ড চিত্রিত করে কাব্যরূপ দেওয়ার অল্পদিন পরে কবিও শিকার হন মোংগল হত্যাকাণ্ডের। জানি না, তাঁর জন্য শোক করার কেউ ছিল কি না। কিন্তু সমগ্র বিশ্বই তাঁর জন্য এখন শোক করছে।

সাদীর সমসাময়িক আর একজন উল্লেখযোগ্য কবি হামাদানের ইরাকী। তিনি ছিলেন অত্যধিক প্রতিভাসম্পন্ন। বাল্যকালেই তিনি কুরআনে হাফিজ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন এবং সতেরো বছর বয়সেই কলেজ শিক্ষা সমাপ্ত করেন। শিক্ষা-দীক্ষা এবং ঐতিহ্যে ইরাকীদের পরিবার ছিল অত্যধিক খ্যাতিমান। সূফীবাদের অন্যতম অগ্রনায়ক হিসেবে তাঁর খ্যাতিও সুবিদিত এবং সাদীর মতো তিনিও বহুদেশ পরিভ্রমণ করেন। উল্লেখ্য যে, ভারতের মুলতানেই তিনি সুদীর্ঘকাল অর্থাৎ পঁচিশ বছর অতিবাহিত করেন। এই সময়ে তিনি প্রখ্যাত সূফী-সাধক শায়েখ যাকারিয়ার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন এবং সূফীতত্ত্বে তাঁর জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ করেন। অতঃপর তিনি পবিত্র মক্কায় যান হজ্জব্রত পালনের জন্য। ফেরার পথে অনেক দেশ পরিদর্শন করে দামেস্কে অবস্থান করেন এবং সেখানেই আনুমানিক ১২৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

ইরাকীর কাব্য-জীবনে তথা সূফী-দর্শনে দুইজন প্রখ্যাত সূফী সাধকের প্রভাব বিশেষ ক্রিয়া করে। তাঁদের একজন ভারতের শায়েখ যাকারিয়া এবং অন্যজন দামেস্কের কোনাভী। কোনাভী ছিলেন বিশ্ব-খ্যাত আরব দার্শনিক ইবন-আল আরাবীর অনুসারী এবং ইরাকীর জীবনেও আল-আরাবীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এবং এই প্রভাব ইরাকীর প্রখ্যাত কাব্য-গ্রন্থ 'লামাত' বা 'সহসা সচকিত আলো'-তে পরিব্যাপ্ত। 'লামাত' কাব্য-গ্রন্থটি সাদীর অমর গ্রন্থ 'বোস্তাঁ' ও 'গুলিস্তাঁ'র অনুকরণে রচিত। গদ্য-পদ্য উভয় রীতিই এর মধ্যে বর্তমান তবে তিনি মাঝে মাঝে আরবী কবিতার উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন অবলীলাক্রমে। তাঁর কবিতা থেকে কিছু অংশের অনুবাদ এখানে পেশ করছি ঃ

আমিতো রয়েছি বেঁচে কেবল তোমার প্রেম বলে,
আমার আত্মার ঘরে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই।
তোমার প্রশান্তি মাখা কী সুন্দর মুখের আশ্রয়ে
একমাত্র স্থির থাকি, নতুবা যে ক্ষিপ্ত আমি সদা।
তোমার উজ্জ্বল মুখ নিয়ে তুমি এই বুকে থাকো—
সেই তো আমার সুখ, বেদনার সব উপশম!
হে আমার প্রিয়তমা, হাতখানি বুকে তুলে নাও ;

বেদনায় জর্জরিত তোমার বিরহে এই আমি।
আমাকে নাও না টেনে তোমার ও ঘরের আশ্রয়ে
আমার মতোন দুঃখী পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

কেরমান অঞ্চলের খাজুও ত্রয়োদশ শতাব্দীর অন্যতম খ্যাতিমান কবি। মালিক শত্র কিংবা দৌলত শাহ্-এর 'মানাকিবুশ শোআরা' কিংবা 'মাজালিসুল উস্সাক' প্রভৃতি গ্রন্থে খাজু সম্পর্কে খুব একটা বিস্তৃত আলোচনা না থাকলেও তিনি যে শক্তিশালী কবি তাতে সন্দেহ নেই। তিনিও বহু দেশ পরিভ্রমণ করেন। তাঁর কাব্য-কর্ম ধর্মীয় ভাবধারা এবং উপদেশ কেন্দ্রিক। তাঁর বর্ণনা প্রতীকাশ্রয়ী এবং তথ্যসমৃদ্ধ। যেমন,

জলের উপরে জন্ম এই পৃথিবীর;
অতএব ক্ষণস্থায়ী, বাতাসে উড়িয়ে আনা পাতা—
যে কোনো মুহূর্তে ফের উড়ে যেতে পারে।
নার্সিসাসের মতো চোখ মেলে দেখো,
দেখবে এখানে কতো সৌন্দর্যের অপার বিস্ময়।
প্রতিটি মুহূর্তে সূর্য ভিন্ন দেহে ভিন্ন আলো ফেলে—
এ পৃথিবী অবিশ্বাসী, একে তুমি বিশ্বাস করো না।

দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দী ফারসী সাহিত্যে যে উন্নতির চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে তার রেশ ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দীতেও আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি। ত্রয়োদশ শতাব্দী জন্ম দিয়েছে রুমী, সাদী, কামাল, ইরাকী এবং খাজুর মতো প্রতিভাধর কবি ও সূফী-দার্শনিক—যাঁদের সম্পর্কে ইতিপূর্বে সামান্য আলোকপাত করা হয়েছে।

চতুর্দশ শতাব্দীতেও ফারসী কাব্যজগতে এমন কয়েকজন জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটেছে, যাদের আলোকে ফারসী সাহিত্য-আকাশ সত্যি আলোকিত এবং ভাস্বর। এইসব জ্যোতিষ্মান প্রতিভার প্রথম সারিতে আছেন সিরাজের বুলবুল হাফিজ, খাজুন্দের কামাল উদ্দীন খাজুন্দী, ভারতবর্ষের আমির খসরু এবং হাসান প্রমুখ। এঁদের মধ্যে আমির খসরুই বয়োজ্যেষ্ঠ। হাফিজ এবং কামাল উদ্দীন খাজুন্দী সমসাময়িক এবং হাসান সামান্য কনিষ্ঠ।

আমির খসরু ১২৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কে জন্মগ্রহণ করেন এবং মোংগল আক্রমণের সময় দেশত্যাগ করে ভারতের আগ্রায় এসে বসতি স্থাপন করেন। তুর্কী-আফগান শাসনের সময় তিনি ছিলেন ভারতের সবচেয়ে বড় কবি। ১৩২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দিল্লীতে মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর আধ্যাত্মিক জগতের গুরু প্রখ্যাত সূফী-সাধক নিজাম উদ্‌দীন আওলিয়ার মাজারের নিকটবর্তী গিয়াসপুরে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

আমির খসরু আরবী ও ফারসী ভাষায় অত্যন্ত সুপণ্ডিত ছিলেন। কবি-খ্যাতি ছাড়াও সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবে আমীর খসরু এই উপমহাদেশে একটি জনপ্রিয় নাম। গদ্য ও পদ্য উভয় রীতিতে তিনি প্রচুর লিখেছেন এবং সর্বমোট নিরানব্বইটি গ্রন্থের তিনি প্রণেতা। উল্লেখ্য যে, কাব্য-রচনার ক্ষেত্রে তিনি নিজামী এবং রুমী কর্তৃক প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন এবং তাঁর সুদীর্ঘ পাঁচটি কবিতার সংকলন 'খামছা' নিজামীর 'পাঁনচ গনজ'-এর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এতে আঠার হাজার সমিলের কাব্য-ছত্র সংযোজিত হয়েছে।

আমির খসরুর প্রেমের কবিতার সংকলন 'ইশ্‌কিয়া' ফারসী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। নর-নারীর প্রেম ছাড়াও এতে অধ্যাত্ম-প্রেমের দৃষ্টান্ত প্রচুর। বলা যায় যে, গুজরাটের হিন্দু রাজকন্যা দেবলা দেবীর সঙ্গে সুলতান খিজির খানের প্রেমসূত্র যে পরবর্তী-কালে পরিণয়ে গ্রথিত হয় এই কাহিনীও আমির খসরু সুললিত কাব্য-ঝংকারে লিপিবদ্ধ করেছেন 'ইশ্‌কিয়া' কাব্য-গ্রন্থে।

আমির খসরুর আধ্যাত্মিক প্রেম-সম্বলিত গীতি-কবিতা বা গজল-সমূহ এখনও সুর সহকারে, বিশেষ করে, সুফী-দরবেশগণ গেয়ে থাকেন। নিম্নোদ্ধৃত কাব্যাংশে আধ্যাত্মিক-প্রেম রহস্যের ব্যাপার কিছুটা উপলব্ধি করা যাবে ঃ

একদা কবরস্থানে গিয়ে আমি বিদায়ী বন্ধুর
স্মরণে ক্রন্দন করে বললাম, 'তোমরা কোথায় ?'
আমার আত্মার সেই বন্ধুরা সকলে কি মধুর
স্বরে শুধু প্রতিধ্বনি তুলেছিল, 'তোমরা কোথায় ?'

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমির খসরুর বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থের সংখ্যা নিরানব্বইটি। সবগুলো গ্রন্থের নাম সংগ্রহ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। উপরে উল্লেখিত 'খামছা' ও 'ইশকিয়া' ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'লায়লা ওয়া মজনুন' রোমান্স কাব্য। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে ফেরদৌসী, রুমী প্রমুখ কবিরা একই বিষয়ের উপর যে ধরনের রোমান্স-কাব্য লিখেছেন এটি সে সব থেকে ব্যতিক্রমধর্মী। এই গ্রন্থটি যখন তিনি রচনায় হাত দেন তখন তাঁর মা এবং ছোট ভাই মৃত্যুবরণ করে। সেই দুঃখপূর্ণ চিত্রটিও তিনি পরিস্ফুট করেছেন অত্যধিক কাব্যিকভাবে। শুরু এইরূপ ঃ

امسال دو نوروز اخترم رفت
هم مادر وهم برادر رفت

আমার তারকা থেকে এখন তো দুটো জ্যোতি নাই
একটি আমার মাতা এবং অন্যটি ছোটো ভাই।

আমির খসরুর 'ইশকিয়া' কাব্য-গ্রন্থ থেকে দুটো কবিতার অনুবাদ নিম্নরূপ ঃ

১. বসন্ত

সময় এসেছে বলে হাওয়ারা কেমন ক্ষিপ্ত হয়ে
ছুটে চলে বাগানের দিকে ;
পৃথিবী কৃপণ নয়, ঘাসের জাজিম পেতে সেও
প্রকৃতিকে সাজিয়েছে কী সুন্দর করে।
গাছে গাছে ফুলের বাহার
আপন গতিতে নদী গেয়ে চলে সুমধুর গান
কৃষ্ণচূড়া জ্বালিয়েছে অনির্বাণ আগুনের শিখা।

মেঘ থেকে বৃষ্টি ঝরে পড়ে,
আমার সে প্রেয়সীর বিদায়ের পালা।
এমন মুহূর্তে কভু বিদায়-বিয়োগ ভালো লাগে ?
আমার প্রেয়সী, আমি, আর ওই মেঘ
তিনজন একসাথে কাঁদি আর কাঁদি।......

২. সৌন্দর্যের সমুদ্র

জয়ঢাক, ভিতরে শূন্যতা ঢের ফাঁকা······
অথচ আওয়াজে তার দুই কান বন্ধ হয়ে আসে।
পৃথিবীর আসল সম্রাট
এক ঘটি পানি আর একটি রুটিতে তুষ্ট থাকে।

প্রেম, যন্ত্রণায় ভোগে
কিন্তু সে আসল প্রেমিকার জন্য নয়—
সে তখন এর মাঝে হৃদয়ের তৃপ্তি খুঁজে পায়।

শৃঙখল বন্দীর কাছে বন্ধন স্বরূপ
অথচ তা সিংহের কাছে নয়—
তার কাছে সে শৃঙখল গলার মালিকা।

গরীবের ভাগ্যে যদি মোটা ভাত এবং কাপড়
জুটে যায় সে তখন আনন্দ-সম্রাট ;
খাপে যদি তলোয়ার নিশ্চিন্তে ঘুমায়
সে তখন আসল শাসক।

সাধুর সাধুতা ফুটে ওঠে
খ্যাতিমান হবার পরেতে—
বিধবার সাজগোজ মুখের জৌলুস
পুনরায় বিয়ের প্রস্তাব।······

আমির খসরু শুধু কবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ এবং সর্বোপরি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। তিনি ছিলেন সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুগলকের অত্যধিক প্রিয়পাত্র এবং সুলতানের অনুগ্রহে আমির খসরু প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মতান্তরে আমিরের পদে উন্নীত হন। তাঁর অমর গ্রন্থ 'তুগলকনামা'য় গিয়াসউদ্দিন তুগলকের মহানুভবতা এবং গুণাবলী কীর্তিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মোংগলগণ যখন মুলতান আক্রমণ করেন তখন মুলতানের পতন ঘটে এবং আমির খসরুকে বন্দী অবস্থায় বলখে নিয়ে যাওয়া হয়। অতঃপর তাঁকে মুক্তি

দেওয়া হলে তিনি পুনরায় দিল্লীতে ফেরৎ আসেন এবং এখানেই চুয়াত্তর বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাঁর বাবা আমির সাইফউদ্দীন মাহমুদও ছিলেন ফারসী সাহিত্যের অন্যতম প্রথিতযশা ব্যক্তি।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শায়েখ কামাল উদ্‌দীন খাজুন্দী এবং হাফিজ দু'জনই ছিলেন সমসাময়িক কিন্তু হাফিজ অবস্থান করতেন সিরাজে এবং কামাল তাব্রিজে। তাঁদের মধ্যে জীবনে দেখা হয়নি কিন্তু পত্রালাপ হয়েছে ঘন ঘন। দু'জনই কবি-খ্যাতি ছাড়াও সূফী দরবেশ হিসেবে পরিগণিত এবং অসংখ্য ভক্ত ও শিষ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। 'মানাকিবুশ শো'আরা', 'তারিখ-ই-জাহান গুশা,' 'মাজালিসুল উস্‌সাক' প্রভৃতি গ্রন্থের বক্তব্য অনুসারে জানা যায় যে, কামালের সংসর্গ ছিল তাঁর কবিতার চেয়ে উৎকৃষ্ট এবং হাফিজের কবিতা ছিল তাঁর সংসর্গের চেয়ে শ্রেয়। এই বক্তব্যে দুই কবির কাব্য সম্বন্ধে একটি ধারণা পাওয়া যায়।

কামাল উদ্‌দীন ট্রান্‌স-অক্‌সাসের খাজুন্দে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি তাব্রিজে অবস্থান করতেন এবং এখানেই জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যু-তারিখ নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেন ১৩৯০, কেউ বলেন ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দ ইত্যাদি। দৌলত-শাহ্ তাঁর মৃত্যুর তারিখ ১৩৯০ বলে উল্লেখ করলেও আবার 'মাজালিসুল উসসাক' গ্রন্থেই কামাল উদ্‌দীনের কবরের শিলালিপি দৃষ্টে ১৪০৫—১৪০৬ খ্রীষ্টাব্দ বলে জানা যায়। শিলালিপিতে লেখা আছে ঃ

کمال از کعبهٔ رفتی بدر یار
هزات آفرین مردانه رفتی ٥

কামাল, তুমি গিয়েছ চলে কাবা থেকে বন্ধুর কাছে,
হাজার শান্তি নামুক আজি সুমহান তোমায় ঘিরে।

কামাল ছিলেন ফরিদ উদ্‌দীন আত্তারের অনুসারী এবং তাঁর কাব্য-কর্মেও আত্তারের প্রভাব সুস্পষ্ট। কামালের 'দিওয়ান' বা কাব্য-সংকলন প্রকাশিত না হলেও তাঁর বহু কবিতা বহু সংকলন গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এমনকি ভিয়েনার ইমপেরিয়াল

লাইব্রেরীতে তাঁর একটি পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। তাঁর কবিতায়ও সূফী-দর্শন প্রকট এবং প্রতীকধর্মী শব্দ ব্যবহারে তিনি প্রকাশ নৈপুণ্যকে করেছেন মহিমান্বিত। একটি উদাহরণ দিচ্ছি ঃ

হাওয়ার চিরুনী যেন আমার বন্ধুর কেশরাশি
সুবিন্যস্ত করে দেয় ; ভালো থাকো আল্লার ইচ্ছায়!
তুমিতো অটুট আছো, স্থির চিত্ত খাড়া সে 'আলিফ'
আমরা যেন সে 'লাম' মাঝখানে দুঃখ ভরা ফাঁক।
কেমন শান্তিতে আর্দ্র তোমার দুচোখ, দুই ঠোঁটে
মিষ্টির আমেজ যেন নির্বিকার, সদা লেগে আছে ;
তোমার বিরহে ক্ষুণ্ণ আমার এ হৃদয়ের চিড়ে
শান্তির মালিশ দেবে এই কথা ভাবতে পারি না।
কামাল, ভেবো না তুমি ; তোমার বন্ধুর দুই ঠোঁটে—
জীবন্ত জীবন-সুরা, সেই সুরা মালিশ তোমার।

মোংগল এবং তৈমুর উভয় শাসনকালের সময়সীমায় এবং চতুর্দশ শতাব্দী আলোকিত করা ফারসী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হাফিজ চতুর্দশ শতাব্দীর কোন এক সময়ে পারস্যের সিরাজে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম শামস্ উদ্‌দীন মোহাম্মদ খাজা হাফিজ। সারা বিশ্বে তিনি 'হাফিজ' নামেই পরিচিত। ফারসী সাহিত্যে অসামান্য অবদান সংযোজন করে তিনি ১৩৯১ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

তিনি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন কবি। তিনি বাল্যকালেই পবিত্র কুরআন মুখস্থ করে 'হাফিজ' খ্যাতি অর্জন করেন এবং তাঁর পুরোনাম বাদ দিয়ে সেই 'হাফিজ' হিসেবেই সমগ্র বিশ্বে তিনি পরিচিত। তাঁর জন্মস্থান 'সিরাজ'কে তিনি প্রাণের চেয়েও প্রিয় মনে করতেন এবং এ কারণে মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি 'সিরাজ'-র কোলেই ছিলেন। বাগদাদ, ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থান থেকে সাদর আমন্ত্রণ পেয়েও তিনি নিজ দেশ ছেড়ে কখনো বাইরে যাননি। 'সিরাজ' এবং তার পারিপার্শিবকতা তাঁকে মন্ত্রের মতো মোহিত করে রেখেছিল ঃ

মসূলের স্নিগ্ধ হাওয়া রোকনাবাদের মিষ্টি পানি
দেয় না বাইরে যেতে, সর্বক্ষণ দেয় হাতছানি।

তাঁর বহু কবিতায় এই ধরনের আবেগ-প্রবণতা দেশমাতৃকার প্রতি নিবেদন করা হয়েছে।

হাফিজের যৌবনকালের কবিতাগুলোতে প্রেম প্রচ্ছন্ন এবং সে প্রেম নারীর রূপ-বর্ণনা এবং বিলাসিতায় আকীর্ণ। যৌবনবতী সুন্দরী নারীর মুখাবয়বের কালো তিল কবির কাছে এমন সৌন্দর্য নিয়ে প্রতিভাত হয়েছে যে, কবি সেই তিলকে প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন সমগ্র সাম্রাজ্যও তার কাছে কিছু নয়। কবির ভাষায়ঃ

> আগার আঁ তুর্কে সিরাজী বদস্ত আঁরা দিলে মাঁরা,
> বখালে হিন্দুয়াশ বখশাম সমরখন্দ ওয়া বোখারারা।

> "প্রাণ যদি মোর ফিরে দেয় সেই তুর্কী-চাওয়ার মন-চোরা,
> একটি কালো তিলের লাগি বিলিয়ে দেব সমরখন্দ
> ও বোখারা।"

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হাফিজ তাঁর মতের পরিবর্তন করেন এবং কাব্য ও ধর্ম জগতের এক ভিন্ন প্রাসাদে প্রবেশ করেন। এবং সে প্রাসাদ সূফীদর্শনের প্রাসাদ—যে প্রাসাদ তৈরী কেবল প্রেম দিয়ে। হাফিজের ভাষায় 'সব কিছু লয়প্রাপ্ত হবে কিন্তু প্রেমের কোন ধ্বংস নেই' এবং সেই প্রেমই আল্লাহ্। প্রেমের মহিমায় মহাপ্রেমের সঙ্গে মিশে যেতে পারলেই তো পরম পাওয়া। এই সাধনায় হাফিজ উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন বলে তাঁর কাব্য, দর্শন সবকিছু প্রেমের মহিমায় ভাস্বর এবং জয়গানে মুখর।

হাফিজের কবিতায় এমন সব প্রতীক ও ব্যাখ্যা আশ্রয় লাভ করেছে যে, একশ্রেণীর মুসলমানরা তাকে 'রহস্যময় ভাষা' বলে অভিহিত করেন। তাই হাফিজ বর্ণিত প্রেমকে তাঁরা জৈব-ক্ষুধার নিবৃত্তি বলে চিহ্নিত করতেও ভুল করেননি। ফলে হাফিজের মৃত্যুর পর তাঁর জানাজা নিয়ে প্রশ্ন উঠে এবং ধর্মপ্রাণ শরীয়তপন্থী মুসলমানরা জানাজায় অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং বিনা জানাজায় দাফন করার পক্ষে রায় দেয়। কিন্তু তাঁর অগণিত ভক্ত এবং আত্মীয়-স্বজনরা এক সুন্দর উপায়ে এই বিতর্কের সমাধান করেন। তাঁরা টুকরো টুকরো কাগজে হাফিজের গজল লিখে একটি পাত্রে সংস্থাপন করে একজন মাসূম শিশুকে তার মধ্য থেকে

একটি উঠিয়ে আনতে নির্দেশ দেন। বলা ছিল, যে ধরনের গজল উঠে আসবে সেই গজলের অর্থ অনুসারেই তাঁর দাফনকার্য সমাধা হবে। এতে ইমাম রাজী হলেন। সেই মাসূম অর্থাৎ নিষ্পাপ শিশু পাত্র থেকে এক টুকরো কাগজ তুলে নিতেই তার মধ্যে উঠে এলো ঃ

قدم دریغ مدار از جنازهٔ حافظ
که گرچه غرق گنا هست میرود بهشت

হাফিজের লাশ দেখে পিছিও না তোমরা ভাই সবে,
পাপে-পঙ্কে ডুবে থেকে হাফিজ বেহেস্তে কিন্তু রবে।

অতঃপর বিশেষ সম্মানের সঙ্গে হাফিজের লাশ সিরাজের নিকটবর্তী মসূলে দাফন করা হয়। মসূলে হাফিজের মাজার এখনও তীর্থস্থান স্বরূপ।

প্রখ্যাত সমালোচক এবং সংকলক রিজা কুলী খানের 'মাজমাউল ফুসাহা' এবং 'রিয়াজুল আরফীন' গ্রন্থদ্বয়ে হাফিজের কাব্য-দর্শন ও জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাতে জানা যায়, হাফিজের ভক্তরা তাঁকে 'লিসানুল গায়াব' (অদৃশ্য-ভাষ্য) এবং 'তারজামানুল আসরার' (রহস্যের উন্মোচক) বলে অভিহিত করতেন। আধ্যাত্মিক জগতের এমন উন্নত পর্যায়ে হাফিজ পেঁীছেছিলেন যে, শিষ্যরা অনেক জটিল বিষয়ের সমাধান তাঁর কাছে খুঁজে পেতেন।

হাফিজের মৃত্যুর পর তাঁর জনৈক ভক্ত সাইয়ীদ কারীম আনোয়ার সমস্ত কবিতা সংগ্রহ করে 'দীওয়ান-ই-হাফিজ' নামে একটি কাব্য সংকলন প্রকাশ করেন এবং এতে পাঁচশত নিরানব্বইটি কবিতা স্থান পেয়েছে। এই কবিতাসমূহ বিভিন্ন ধরনের এবং বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক। তবে অধিকাংশ কবিতাই আধ্যাত্মিক-ভাবনা প্রসূত এবং সূফীদর্শনে বাঙময়। দু'একটা উদাহরণ দিচ্ছি ঃ

ফুলের বাগান আর বসন্তের হাওয়ার মতন
এমন খুশীর কিছু আর আছে এই পৃথিবীতে?
কোথায় আমার সেই প্রিয়তম সাকী?
এখনো আসে না কেন জীবনের সুখবর দিতে?

আনন্দ মুহূর্ত সব যা নাকি তোমার হাতে আসে
পুরস্কার মনে করে তুলে নাও ইচ্ছার থলিতে—
বিলম্ব করো না তুমি, কে জানে কখন এর শেষ?

তোমার জীবন সে তো বন্ধুর একটি চুলে বাঁধা,
বিলম্ব করো না তুমি, তোমার দুঃখের সমভাগী
তুমি ছাড়া কেউ নয়—তাহলে সে বেদনা কোথায়?

অযথা ভাগ্যের ঘাড়ে দোষ দিয়ে কেন শান্তি চাও?
জীবনের গতি আর ইরামের আনন্দ বাগান
সুরার আনন্দ ছাড়া বুঝিনাকো অন্য কোনো মানে।

হাফিজের কাব্যে ব্যবহৃত দর্শন, এমনকি প্রত্যেকটি শব্দের অন্তরালে একটি করে প্রতীক অন্তর্লীন আছে। উল্লেখ্য যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্য বা ভক্তদের মধ্যে দু'টি দলের সৃষ্টি হয়। একটি দল হাফিজের কবিতা সুর সহকারে গানে রূপ দিয়ে গেয়ে বেড়াতো এবং এই সঙ্গে মদ্য-পানের প্রাচুর্যও ছিল প্রচুর—অপর দল সম্পূর্ণ বিপরীত এবং তাঁরা ধর্মীয় দিক ব্যাখ্যা করেই তাঁকে সূফী শ্রেষ্ঠ মনে করে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন। শেষোক্ত দল হাফিজের গজল-গানে ব্যবহৃত শব্দাবলীর প্রতীক-আশ্রয়ী শব্দকোষ পর্যন্ত তৈরী করেছেন। দু'একটা উদাহরণ দিচ্ছি ঃ

মদ ঃ ধ্যান, সাধনা, প্রেম, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি,
ঘুম ঃ ধ্যান বা সাধনার চরম পর্যায় অর্থাৎ সাফল্য। এমন কি মৃত্যু।
সৌন্দর্য ঃ সৃষ্টিকর্তা নিজে।
চুল ঃ সৃষ্টিকর্তার গৌরব, স্ফূরণ ইত্যাদি।

এমনি ধরনের প্রতীক ব্যবহারে হাফিজের কবিতা বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত। কাজেই হাফিজকে বুঝতে হলে সূফীতত্ত্বে জ্ঞান থাকা চাই—নইলে তাঁর প্রতি জঘন্য অন্যায় করা হবে। হাফিজের খ্যাতি আজ সমগ্র বিশ্বে এবং একথা তো তিনি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা হিসেবে ঘোষণাই করে গেছেন ঃ

হাফিজ, মন্ত্রের মতো তোমার খ্যাতি সুদূরের ওই মিসর-চীনে
কয় আর রোমে জানি, একই কথা বলবে সবাই তোমায় জিনে।

হাফিজের বাণী সফল হয়েছে। শুধু মিসর, চীন, রুম এবং রোম নয়, সারাবিশ্বে হাফিজ আজ নন্দিত।

দিল্লীর হাসানও ফারসী কাব্য-সাহিত্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। আমির খসরুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হাসানও প্রখ্যাত সূফী-দরবেশ নিজাম উদ্দীন আওলিয়ার অত্যধিক প্রিয় শিষ্য ছিলেন। শুধু কাব্য-ক্ষেত্রে নয়, গদ্য রচনার ক্ষেত্রেও হাসানের বিচরণ অবাধ ছিল। প্রখ্যাত সমালোচক শিবলী নোমানীর ফারসী-সাহিত্য সম্পর্কিত উর্দু গ্রন্থ 'শি'রুল আজম'-এ ফেরদৌসী থেকে শুরু করে ফারসী সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কবিদের যে আলোচনা স্থান পেয়েছে তাতে হাসানকে বিশিষ্ট কবি ও সুলেখক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাছাড়া তাঁর সুললিত ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গীর সুকৌশল সম্পর্কেও ইংগিত দেওয়া হয়েছে। হাসান বিভিন্ন ধরনের কবিতা লিখে ফারসী সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর 'দীওয়ান' থেকে কিছু গজল বা গীতি-কবিতার অনুবাদ পেশ করছি ঃ

১. তুমি তো প্রদীপ্ত আলো আমাদের জীবনের ঘরে,
তোমার ও প্রেম ছাড়া এ হৃদয়ে আর কিছু নেই।
কিনেছি তোমার প্রেম আমার আত্মার দাম দিয়ে—
এবং এটাই লাভ ; পৃথিবীতে আর কিছু নেই।

২. শোনো সাকী, হারায়েছি সবকিছু যা ছিল আমার
একান্ত আপন—এই পৃথিবী, হৃদয়, আত্মা সব ;
তাতে কোনো ক্ষতি নেই তুমি যদি থাকো এই পাশে—
জীবনের যে পিয়ালা পেয়েছি তা সবচেয়ে দামী।

৩. তোমার মায়াবী প্রেম, সেও যেন আরেক জগত ;
সে প্রেমের দরজায় পেঁছা মানে বেহেস্তে প্রবেশ।
তোমার প্রেমিক যারা ভয়াবহ কঠিন দোজখ
পুষ্পিত বাগান বলে মনে করে সদা হাস্যে থাকে।

৪. শোনো সাকী, আমাদের এই রাত্রি সুদীর্ঘ অনেক,
বেহদ শারাব দাও, ইচ্ছার দরজা সব খোলা ;
তোমার মুখের দিকে চেয়ে আমি সিজদায় রত—
সেই তো বন্দেগী মোর, অন্য কোনো কানুন জানি না।

৫. ভীষণ নীরব আমি, আমার সে নীরবতা দিয়ে
ভরিয়ে দিয়েছি সুখে সমগ্র পৃথিবী। ধ্যানমগ্ন
সে এখন। কী সুন্দর। নীরবতা, ধ্যানের জগত—
নীরবতা, তারো এক প্রেমের চেহারা আছে জানি।

ইতিপূর্বে বহুবার বলা হয়েছে যে, আধুনিক-পূর্ব যুগের সুদীর্ঘ সময়কালে এতো সব কবি-সাহিত্যিকদের আবির্ভাব ঘটেছে যে, সবার সম্পর্কে আলাদা করে কিছু বলা অসম্ভব ব্যাপার। 'আতশ কদা', 'হফত ইকলীম,' 'মাজমাউল ফুসাহা,' 'শি'রুল আজম' প্রভৃতি গ্রন্থে চতুর্দশ শতাব্দীর আরও এমন সব কবিদের উল্লেখ আছে যাঁদের অবদানও একেবারে উপেক্ষার নয়। এঁদেরকে 'সানিয়া' বা দ্বিতীর সারির কবি বলে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং উল্লেখযোগ্য ফারসী সংকলন গ্রন্থে তাঁদেরও কবিতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই দ্বিতীয় সারির কবিদের মধ্যে রয়েছেন বদর-ই-শাস, ক্বানিয়ী, পূর-ই-বাহা, ইমামী, মাইজুদ্দিন হামগার, কিরমানের আওহাদ উদ্‌দীন, মারাঘা অঞ্চলের আওহাদী, ভুসঞ্জ প্রদেশের রাবিয়ী, হুমামুদ দীন-ই-তাবরিজী, আফজাল-ই-কাশী, আমির-ই-আওমানী, সাইফ উদ্দীন-ই-ইসফারাঙ্গী, রফী উদ্‌দীন আবহারী, ফরিদ-ই-আহওয়্যাল, কোহিস্তানের নিজারী, মাগরিবী এবং আরও অনেকে। এঁদের কাব্য-কর্মের ধারা বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত। এঁরা কেউ মুখর হয়েছেন নারীর-রূপ বর্ণনায়, কেউ প্রকৃতির চিত্র চিত্রণে আবার কেউ বা ফেরদৌসী, সানাই, আন-ওয়ারী, আত্তার হাফিজ, রুমী এঁদের অনুসরণে নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করার চেষ্টায় তৎপর হয়েছেন। এবং এঁদের অনেকেই তাঁদের কাব্য-প্রচেষ্টায় সূফী-দর্শন প্রস্ফুটিত করেছেন অবলীলাক্রমে। উদাহরণ-স্বরূপ বদর-ই-শাসের নাম করা যায়। বদর-ই-শাস তাঁর 'লকব' বা পদবী যার অর্থ দাঁড়ায় পূর্ণিমার চাঁদ। তাঁর সময়ে তিনি 'বদর-ই-শাস' মানে পূর্ণিমার চাঁদ হিসেবেই পরিচিত ছিলেন।

চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে শুরু করে গোটা পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত ফারসী সাহিত্যের এক স্থিতি অবস্থা বলে আখ্যায়িত করা যায়। এই সুদীর্ঘ সময়সীমায় একমাত্র প্রথম শ্রেণীর কবি জামী। জামীর সমপর্যায়ের আর কোন কবি জন্মগ্রহণ না করলেও

কবির সংখ্যা ছিল প্রচুর। প্রতিভা হিসেবে জামীর কথা স্বতন্ত্র কিন্তু অন্যান্য কবিরাও যে প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন না এমন নয়--তবে ইতিপূর্বে রাজশক্তি যেভাবে কবি-সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় দরাজ দিল ছিলেন, তেমনটি পঞ্চদশ শতাব্দীতে লক্ষ্য করা যায়নি।

১৩৮৭-১৩৯০ সালের মধ্যে তুর্কো-মোংগল সুলতান তৈমুরলঙের ক্ষমতা দখল সাহিত্য জগতেও এক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। ইতিপূর্বে আমরা চেংগীজ খানের ভয়াবহতা লক্ষ্য করেছি এবং তৈমুরলঙও তাঁর চেয়ে কম ছিলেন না বলা চলে। তিনি তুর্কীস্তান, খোরাসান, আজারবাইজান, ইরাক, সিরিয়া, এশিয়া মাইনর, ককেশাস এবং রাশিয়ার কিছু অংশ বিজয় করেই ক্ষান্ত হননি—এসব অঞ্চলে লুণ্ঠতরাজ এবং ধ্বংসযজ্ঞের সৃষ্টি করেছিলেন। ফলে সাহিত্যক্ষেত্রেও প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়েছিল।

চেংগীজ খানের উত্তরপুরুষগণ যেমন সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠেছিলেন তেমনি তৈমুরলঙের পুত্র-পৌত্রগণের মধ্যেও এমনি একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় এবং এই প্রবণতা কার্যকরী হয় তৈমুরলঙের মৃত্যুর পরে। এ ব্যাপারে অগ্রণীয় ভূমিকা পালন করেন তৈমুরলঙের পুত্র শাহ-রোখ মীর্জা। শাহ-রোখ মীর্জা এবং তাঁর উপদেষ্টা ইউসুফ আমিরী, এমনকি তাঁর পুত্র বাইসনগর শিল্পী, সাহিত্যিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, বুদ্ধিজীবীদের উদাত্ত আহবান জানান এবং তাঁদেরকে উৎসাহিত করতে শুরু করেন। উল্লেখ্য যে, তৈমুরলঙের পৌত্র বায়কারা মীর্জা, সিকান্দার, উলুগ বেগ প্রমুখরাও দেশে কবি-সাহিত্যিকদের মর্যাদা ফিরিয়ে আনবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। তৈমুর শাসনকাল স্থায়ী হয় প্রায় আশি বছর অর্থাৎ ১৩৮৭ থেকে ১৪৬০ পর্যন্ত এবং এই সময়সীমায় তৈমুরের উত্তর-পুরুষদের মধ্যে অনেকেই সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ এবং পৃষ্ঠপোষকতা প্রদর্শন করেছেন।

তৈমুর-শাসন আমলে রচিত দৌলত শাহ' এর 'মাজালিসুল উসসাক' গ্রন্থে দশজন আরবী কবি ছাড়াও ১৩৪ জন প্রখ্যাত ফারসী কবির শ্রেষ্ঠ কবিতা, জীবনী, আলোচনা ইত্যাদি স্থান পেয়েছে।

এই গ্রন্থে তৈমুর শাসক মীর্জা আবু সাঈদের কাল অবধি অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত যেসব কবিদের উল্লেখ আছে তাদের মধ্যে তৈমুর যুগে রয়েছেন বোরানদাক, আবু ইসহাক, সায়্যীদ কাসেম আনোয়ার, আওহাদ সাব্‌জওয়ারী, ইবাদ নিশাপুরী, সায়্যীদ নিজামাতুল্লাহ, কাত্তিবী, আরফী, আমির শাহী কুদসী, জামী এবং আরও অনেকে। এঁদের মধ্যে একমাত্র জামীই প্রথম শ্রেণীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি এবং এই সময়কালের অতুলনীয় প্রতিভা।

উপরে উল্লেখিত কবিদের মধ্যে বোরানদাক ছিলেন তৈমুরের পৌত্র বায়কারা মীর্জার সভাকবি এবং কবিকে তাঁর কাব্য-প্রতিভা ও ব্যঙ্গ-রসাত্মক কবিতার জন্য প্রতি মাসে এক হাযার স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করতেন বলে জানা যায়। আবু ইসহাক ছিলেন তৈমুরের আর এক পৌত্র সিকান্দারের প্রিয়পাত্র। আবু ইসহাকের কবিতা সম্বলিত একটি 'দীওয়ান'-এর সন্ধান পাওয়া যায়। আবু ইসহাক ছিলেন ভোজনবিলাসী এবং তাঁর এমন কোন কবিতা নেই যাতে খাদ্য ও মিষ্টির ব্যাখ্যা না আছে। তাঁর অধিকাংশ কবিতাই ছিল রসাত্মক ও ব্যঙ্গধর্মী।

শাহ-রোখ মীর্জার অন্যতম ছেলে বাইসগর-এর রাজদরবার আলোকিত করেছিলেন প্রখ্যাত সূফী-কবি ও দার্শনিক সায়্যীদ কাসীম আনোয়ার। তাঁর আধ্যাত্মিক চিন্তা এবং সজ্জনতার জন্য তাঁকে বলা হতো 'আলোকদাতা' ও 'সত্যের সমুদ্রের ডুবুরী'। এই কবিই হাফিজের কাব্য-সংকলন 'দীওয়ান' প্রকাশ করেছিলেন বলে আগেও উল্লেখ করা হয়েছে।

হেরাতের আরফীও (জন্ম ঃ ১৩৮৯, মৃত্যু ঃ ১৪৪৯) ছিলেন সূফী প্রভাবে প্রভাবান্বিত এবং তাঁর কাব্য গ্রন্থ 'হালনামা' (ধ্যানের কাব্য)-তে আধ্যাত্মিক স্পর্শজাত কবিতা ছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ক গীতি-কবিতা। আরফীর কবিতার দুটো লাইন এইরূপ ঃ

بر پلک سرخ دیدهٔ من داروی سفید
باشد بعینه نمک سوده بر کباب ○

আমার এ লাল চোখে রয়েছে যে শ্বেতাভ প্রলেপ,
সুস্বাদু কবাব জুড়ে ছড়ানো সে লবণের গুঁড়ো।

আরফীও যে আবু ইসহাকের মতো ভোজনবিলাসী কিংবা খাদ্যের প্রতি লোল-জিহবা ছিলেনা পূর্বপৃষ্ঠার দুটো লাইনেই তা বুঝা যায়।

তৈমুর শাসন আমলের অতুলনীয় প্রতিভা জামী। তাঁর পুরো নাম মোল্লা নূর উদ্‌দীন আবদুর রহমান জামী। ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর খোরাসানের জাম অঞ্চলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। তৈমুর সুলতান মীর্জা আবু সাঈদের শাসন আমলে তিনি রাজকীয় মর্যাদায় আসীন ছিলেন। জামীকে ফারসী সাহিত্যের সর্বশেষ শ্রেষ্ঠ কবি বলে আখ্যায়িত করা হয়। জামীর কবিতায় এক সঙ্গে সাদীর নীতি-বোধ, রুমীর উচ্চাভিলাষ, হাফিজের সারল্য এবং নিজামীর আবেগ অনুসৃত। তাঁর সমগ্র জীবনই তিনি ব্যয় করেছেন নিরলস সাহিত্য সাধনায় এবং গদ্য ও পদ্য রচনা মিলিয়ে তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশটি। এসবের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'দীওয়ান' (তিন খণ্ডে সমাপ্ত), 'মসনবী' (৭ খণ্ডে সমাপ্ত), 'নাফাহাতুল ইনস', 'সাবাআ,' 'বাহারিস্তান,' 'হফত আওরঙ্গ,' 'ইউসুফ জোলায়খা' ইত্যাদি।

উপরোক্ত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'দীওয়ান'-এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে গজল বা গীতিকবিতা, 'মসনবী'তে পবিত্র কুরআন, হাদীস, রাসূলে করীম, পীর-পয়গম্বর, সাধু-দরবেশ, মরমীবাদ, আরবী ব্যাকরণ, ছন্দ-প্রকরণ, সঙ্গীত ইত্যাদি সম্পর্কিত বিশদ আলোচনা ও মাঝে মাঝে কবিতা সংযোগ করে যথার্থতা প্রমাণ করেছেন। 'নাফাহাতুল ইন্‌স' সূফীতত্ত্বের তথ্য ও তত্ত্ব উভয়ই স্থান পেয়েছে বিশদভাবে। 'ইউসুফ-জোলায়খা' প্রেম-ধর্মী রোমান্স কাব্য এবং 'হফত আওরঙ্গ' সাতটি দীর্ঘ কবিতার সংকলন। কবিতাগুলোর নাম অনুসারেই বোঝা যায় যে, তিনি কিসব বিষয়বস্তুর অবতারণা ও ব্যাখ্যা এতে করেছেন :

১. সিলসিলাতুদ্‌ দাহাব (স্বর্ণ বা হীরের হার)
২. সালামান ওয়া আবসাল (সালামান ও আবসালের রোমাণ্টিক কাহিনী)
৩. তুহফাতুল আহরার (সত্যের উপহার)

৪. সোবহাতুল আবরার (ধার্মিকের গোলাব বা পুরস্কার)
৫. ইউসূফ জোলায়খা (ইউসূফ-জোলায়খার প্রেমকাহিনী)
৬. লায়লা ওয়া মাজনুন (লায়লী-মজনুর প্রেমকাহিনী)
৭. খিরাদ নামা-সিকান্দারী (আলেকজাণ্ডারের বুদ্ধিমত্তা)

'বাহারিস্তান' (বসন্ত বাগান) গ্রন্থটি গদ্য ও পদ্যে রচিত। সাদীর 'গুলিস্তাঁ' ও 'বোস্তাঁ' গ্রন্থের অনুসরণে 'বাহারিস্তান' রচিত এবং কাহিনীগুলোর বক্তব্যেও একই রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। জামীর দর্শন, চিন্তা-শক্তি, প্রকাশভঙ্গীর ক্ষমতা সব মিলিয়ে তাঁর রচনাকে করেছে মহিমান্বিত। ইতিপূর্বে উল্লেখিত 'মানাকিবুশ শোআ'রা,' 'তারিখ-ই-জাহান গুশা', 'মাজালিসুল উস্‌সাক,' 'আতশ কদা' এমনকি 'মাজমাউল ফুসাহা' প্রভৃতি গবেষণা গ্রন্থে জামীর ভাষা, বক্তব্য এবং দর্শন সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে এবং ফারসী সাহিত্যে যে সাতজন স্তম্ভ আছে, যা এর আগেও একবার উল্লেখ করা হয়েছে, জামীকে সেই সাত স্তম্ভের এক স্তম্ভ বলে কীর্তিত করা হয়েছে। ফারসী সাহিত্যে একটি সুন্দর মন্তব্য আছে। তা এই যে, ফেরদৌসীর 'শাহনামা', রুমীর 'মসনবী', হাফিজের 'দীওয়ান', নিজামীর 'পাঁনচ গনজ', জামীর 'হফত আওরঙ্গ' প্রভৃতি কোনো কালেই মুছে যাবার নয় এবং এইসব গ্রন্থই গোটা ফারসী সাহিত্যের প্রতিনিধিত্ব করতে সমর্থ। এবং এজন্যই জামীকে 'ফারসী সাহিত্যের বতারা' বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। জামীর 'বাহারিস্তান' থেকে দুটো কাব্যাংশের অনুবাদ এখানে পেশ করছি ঃ

১. প্রেমিকের প্রতি

আমরা ছুটেছি শুধু অতিদূর সম্মুখের পানে
পাহাড় পর্বত নদী পার হয়ে কী এক আহ্বানে—
সমস্ত কষ্টের ঘাম অবজ্ঞায় ফেলেছি যে দূরে,
যেহেতু পৌঁছবো মোরা ইচ্ছার মঞ্জিলে ঘুরে ঘুরে।
জীবনের সব কষ্ট একটি আকাঙ্ক্ষা ঘিরে আছে—
উৎস সন্ধানে হেঁটে মহান মিলন শুধু যাঁচে।

২. গজল থেকে

যেহেতু তোমার মুখ রয়েছে আমার অন্তরালে
যেমন সে চাঁদ থাকে অন্ধকার রাত্রির আড়ালে,
অশ্রুর-তারকা জ্বালি অহরহ, অথচ আঁধার
বিনষ্ট না হয়ে শুধু এ হৃদয়ে থাকে নির্বিকার।

আমরা এখানে আছি কর্মময় জীবন বাগানে
নদীর মতোন গতি মিলনের উৎস-সন্ধানে ;
আমরা এখানে শুধু হাতাহীন কলসী কানায়
চুমো দিয়ে পার হই দিনরাত কী এক ইচ্ছায়।

এইখানে এসো সাকী! তোমার সুরার মন্ত্র দিয়ে
সমগ্র 'বৃহৎ' পাপ ধুয়ে দাও ক্ষমা ব্রত নিয়ে।
এবং ইমাম যদি পবিত্র সে কালামের গুণে
মসজিদে বুঁদ হয়ে পড়ে থাকে ; আমি জেনে শুনে
সরাইখানায় যাবো, কেননা সুরার মোহমায়া
সেখানে ধ্যানস্থ রাখে, যেই ধ্যান জীবনের কায়া।

তোমার ঠোঁটের ছোঁয়া লেগেছে কি সুরা-পিয়ালায় ?
আমি তো নেশায় মত্ত ; বলতে পারি না আমি হায়
এটা কি তোমার ঠোঁট, নাকি ওই দীপ্ত পিয়ালার ?

যেমন আটকা থাকে জালে পাখী, হৃদয় আমার
তেমনি রয়েছে বাঁধা ; দুরু দুরু প্রতিটি স্পন্দন
তোমার চুলের টানে উঠে নামে, আশ্চর্য কেমন !

তোমার মায়াবী প্রেমে জামী তো অজ্ঞান হয়ে আছে,
সুরা না পিয়ালা ? এই জ্ঞান আজ নাই তার কাছে।

ইতিপূর্বে ফারসী সাহিত্যের 'আধুনিক-পূর্ব যুগ' চিহ্নিত আলোচনায় মোংগল ও তৈমূর-শাসন আমলের উল্লেখযোগ্য কবিদের কাব্য-কর্ম সম্পর্কে সামান্য ইংগিত দেওয়া হয়েছে মাত্র। তাঁদের কাব্য-প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের গদ্য-রচনারও উল্লেখ করা হয়েছে।

মোংগল ও তৈমুর-শাসনকালে ফারসী সাহিত্যে এমন সব বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সংকলক, জ্যোতির্বিদ, অঙ্কশাস্ত্রবিদ, ঐতিহাসিক, ভূগোলবিদ ইত্যাদি রয়েছেন, যাঁদের গদ্য রচনা সত্যি প্রশংসার দাবি রাখে।

এইসব পণ্ডিত ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছিল ইরাক, আজার-বাইজান, খোরাসান, ট্রান্‌স অক্সিয়ানা, ভারত প্রভৃতি অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গা থেকে। তাঁদের সামগ্রিক প্রচেষ্টায় ফারসী সাহিত্য সত্যি উন্নত হয়। ইতিহাস, দর্শন, ভূগোল, আলোচনা, সংকলন ইত্যাদি বিষয়ে যাঁরা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে নাসির উদ্‌দীন তুসী, জোবায়নী, রাশীদ উদ্‌দীন আমির, ওয়াসাফ, হামদ-আল্লাহ্‌ মোস্তাউফী, বারনী, শারাফ উদ্‌দীন আলী ইয়াজদী, হাফিজ-ই-আবরু, আবদুর রাজ্জাক, দৌলত শাহ্‌, ইবন খাল্লীকান, লুৎফী আলী বেগ, আমিন আহমদ-ই-রাজী, মীর খবন্দ, আমির আলী শায়ের নবাই, কাশিফী, খবন্দ মীর প্রমুখের নাম বিশেষ-ভাবে স্মরণীয়।

চেংগীজ খানের পৌত্র হালাকু খানের রাজদরবারের উর্ধ্বতন কর্মচারী নাসির উদ্‌দীন তুসী খোরাসানের তুস নগরে ১২০১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত দার্শনিক, ভেষজবিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিদ এবং সুলেখক। ১২৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন এবং এই সুদীর্ঘ সময়ে রাজকার্য পরিচালনা ছাড়াও তিনি সাহিত্য-ক্ষেত্রে বেশ কিছু মূল্যবান সম্পদ সংযোজন করেছেন। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'আখলাখ-ই-নাসিরী'। তাছাড়া তিনি ধর্মীয় উপদেশ, পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা সম্বলিত গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। তিনি আরবী ও ফারসী—উভয় ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন এবং সৌর-জগৎ সম্পর্কিত তাঁর কিছু রচনা আজ পর্যন্ত পথ-প্রদর্শক হিসেবে কাজ করে। উল্লেখ্য যে, হালাকু খানের সময় মারাঘা-তে যে আবহাওয়া নির্দেশক কেন্দ্র স্থাপিত হয়, তা নাসির উদ্‌দীন তুসীরই অবদান।

জোবায়নী-র পুরোনাম আতা মালিক-ই-জোবায়নী (জন্ম ১২২৫, মৃঃ ১২৮৩)। প্রথম অবস্থায় তিনি মোংগল সুলতান আবু সাঈদের রাজদরবারে চাকরি-রত ছিলেন এবং পরবর্তীকালে তিনি হালাকু

খানের অধীনেও চাকরি করেন (১২৫৬ খ্রীঃ)। ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বাগদাদের পতনের পর তিনি বাগদাদের গভর্নর পর্যন্ত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যধিক মেধাবী এবং শিল্প-সাহিত্যের সমঝদার। তিনি দীর্ঘদিন 'আসাসীনদের স্বর্গ' বলে কথিত 'আল-আলামুত' লাইব্রেরীতে পড়াশুনা করে তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করেন। বলা যায় যে, এই আসাসীন বা ইসমাঈলীয়াদের প্রথম নেতা হাসান আল-সাব্বাহ্ যাকে বলা হয়ে থাকে 'পর্বতের বৃদ্ধ মানুষ' ওমর খৈয়্যাম এবং নিজাম উল-মুলকের সহপাঠী ছিলেন। হাসান আল-সাব্বাহ-এর দলকে তখনকার দিনে সন্ত্রাসবাদী-বামপন্থী বলে কীর্তিত করা হতো। মোংগল আক্রমণের সময় এই আল-আলামুতও ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

জোবায়নী শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে শিল্পী-সাহিত্যিকদের উৎসাহিত করতে শুরু করলেন। কেননা, তিনি নিজেও ছিলেন সুপণ্ডিত ও সুলেখক। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'তারিখ্-ই-জাহান গুশা' (বিশ্ব-বিজয়ের ইতিহাস)। তিন খণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থের—

(১) প্রথম খণ্ডে আছে চেংগীজ খানের পূর্ব-পুরুষ ও উত্তর-পুরুষদের নির্ভরযোগ্য তথ্য ;

(২) দ্বিতীয় খণ্ডে আছে খাবারিজম শাসক এবং তাদের বিরোধী দলীয়দের তথ্য-নির্ভর কাহিনী এবং

(৩) তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে ইসমাঈলীয়া সম্প্রদায়ভুক্ত শিয়াদের বিস্তৃত আলোচনা, ফাতেমীদের কথা, সন্ত্রাসবাদী এমনকি ফারসী নেতা হাসান আল-সাব্বাহ্দের দলীয় সমস্ত ঘটনা ; এমনকি ফারসী সাহিত্যের তদানীন্তন সময় পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য তথ্য।

এই ধরনের গ্রন্থ ইতিপূর্বে রচিত হয়নি এবং আজ পর্যন্ত এ গ্রন্থটির মূল্য একটুও কমেনি। জানা যায়, জোবায়নীর পূর্বে রচিত আবু সোলায়মান দাউদ বিনাকিতী এবং খাজা আবরু যে বিশ্ব-ইতিহাস বা 'তারিখ-ই-জাহান' রচনা করেছিলেন তা জোবায়নীর রচনার কাছে ম্লান হয়ে যায়।

জোবায়নীর পরেই নাম করতে হয় রশীদ উদ্দীন আমীরের (জন্ম আনুমানিক ১২৪৭ খ্রীঃ)। তিনি প্রথম জীবনে ইরানের

মোংগল শাসনকর্তা আবাকা খানের চিকিৎসক ছিলেন কিন্তু পরবর্তী-কালে নিজের প্রতিভাবলে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদে উন্নীত হন। কিন্তু রাজনৈতিক চক্রান্তে পড়ে তাঁকে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয় এবং ১৩১৮ খ্রীষ্টাব্দে ফাঁসীর মাধ্যমে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। এই বিপর্যয়ের মূলে ছিল সুলতান আবু সাঈদের অনুচরেরা। কিন্তু চেংগীজ খানের উত্তরপুরুষ গজন খান এবং খোদাবান্দার শাসন সময়ে রশীদ উদ্দীনের স্থান ছিল বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ। রশীদ উদ্দীনের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা 'জামা-উত-তারিখ' (ইতিহাস সংগ্রহ)। এতে মোংগল-দের তথ্য-সম্বলিত ইতিহাস, হিব্রু, প্রাচীন ইরান, মুসলিম, তুর্কী, চীনা, ভারতীয় প্রভৃতির বিস্তৃত আলোচনা স্থান পেয়েছে। তাছাড়া তিনি আরবী ভাষা সম্পর্কিত ইতিহাস গ্রন্থও রচনা করেন।

এই সময়কার আরেকজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ওয়াসাফ। ওয়াসাফ তাঁর 'লকব' বা পদবী—আসল নাম আবদুল্লাহ বিন ফজল-আল্লাহ। ওয়াসাফের বিশ্ব-খ্যাত ইতিহাস-গ্রন্থ 'তারিখ-ই-ওয়াসাফ' (ওয়াসাফ-ইতিহাস)। এই গ্রন্থে চেংগীজ খান থেকে শুরু করে তাঁর অধস্তন আবু সাঈদ পর্যন্ত যে কাহিনী বিবৃত হয়েছে তা প্রশংসার দাবি রাখে। ফারসী গদ্যে উৎকৃষ্ট নমুনা হিসেবে তাঁর রচনা স্বীকৃত। কারণ এমন আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য ইতিপূর্বে অন্য কারও গদ্য রচনায় দেখা যায়নি। তিনি একজন সুকবিও ছিলেন।

হামদ-আল্লাহ্ মোস্তাউফীও একজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও সমালোচক। তাঁর পুরো নাম খাজা হামদ-আল্লাহ মোস্ত-আউফী বিন আবু বাকার আল কাজবিনী। তিনি ফারসী সাহিত্যে হামদ-আল্লাহ্ মোস্তাউফী, হামিদ উদ্দীন মোস্তাউফী অথবা কেবল আউফী কিম্বা কাজবিনী নামে পরিচিত। আমরা এখানে তাঁকে হামদ আল্লাহ্ মোস্তাউফী নামেই চিহ্নিত করবো। ১২৮১ সালের মধ্যে কাজবিন শহরে তাঁর জন্ম। ১২৯৩ সালে তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'তারিখ-ই-গুজিদা' (নির্বাচিত ইতিহাস) প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে রাসুলে করীম, চার খলিফা, খোরাসান ও পারস্যের রাজা-বাদশাহ্দের জীবনী ছাড়াও রয়েছে প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিকদের জীবনী ও সাহিত্য-কর্মের ফিরিস্তি। এমনকি এতে ইসমাঈলীয়া সম্প্রদায়ের নেতা হাসান আল-সাব্বাহ্, যাঁকে উক্ত সম্প্রদায় চিহ্নিত করেছেন 'সর

গুজাস্ত-ই-সাইয়্যেদেনা' অর্থাৎ 'আমাদের প্রভুর অভিযান'—সম্পর্কেও নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তাছাড়া মোস্তাউফীর আর একটি সমালোচনা গ্রন্থ 'লুবাবুল আলবাব'ও ফারসী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় 'তারিখ-ই-গুজিদা' প্রকাশের এগারো বছর পর। এতে ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য সবকিছুর আলোচনা স্থান পেয়েছে। মোস্তাউফী 'শাহনামা'র অনুকরণে কাব্য-রীতিতে ইরানের এবং মোংগল রাজবংশের ইতিহাসও রচনা করেন।

একই সময়ে ভারতবর্ষের জিয়া উদ্দীন বারনীও ইসলামের ইতিহাস লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। 'তারিখ-ই-ইসলামীয়া' ছাড়া তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহ্'। উল্লেখ্য যে, তিনি প্রখ্যাত কবি আমির খসরু ও হাসানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তাঁদের মতো বারনীও নিজাম উদ্দীন আওলিয়ার অন্যতম ভক্ত ছিলেন এবং সূফী তত্ত্বে দীক্ষা গ্রহণের পর বারণীও সূফী-দর্শন সঞ্জাত কিছু কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহ্' গ্রন্থে ভারতে তুগলক শাসনের পুর্ণ বিবরণ পেশ করা হয়েছে।

তৈমুরীয় শাসক শাহ রোখের পুত্র সুলতান ইব্রাহীমের কাছেও ফারসী সাহিত্য ঋণী। কেননা তাঁরই উৎসাহে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক শারাফ উদ্দীন আলী ইয়াজদী (মৃত্যু ১৪৫৪ খ্রীঃ) রচনা করেন 'জাফরনামা' এবং 'তারিখ-ই-সাহিব কিরানী।' দুটি গ্রন্থই ফারসী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। কবি হিসেবে তার খ্যাতি সুবিদিত। অনুরূপভাবে আল-কাজবিনীর ভূগোলশাস্ত্র সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 'আতহারুল বালা', দৌলত শাহের দশজন আরবী কবি এবং একশত চৌত্রিশজন ফারসী কবির জীবনী ও কাব্য সমালোচনা সম্বলিত 'মাজালিসুল উস্সাক', লুৎফী আলী বেগের কবি ও কাব্য সমালোচনা সম্পর্কিত গবেষণা গ্রন্থ 'আতশ কদা', আমিন আহমদ ই-রাজীর সাহিত্য সমালোচনা গ্রন্থ 'হফত ইকলীম,' ইবনে খাল্লী-কানের রাজা-বাদশাহ ও কবি সাহিত্যিকদের জীবনী সংক্রান্ত 'ওয়াফায়াতুল আয়ান' আমীর আলী শায়ের নবাইর 'লিসানুত তায়ের' (পাখীর ভাষা), মীর খবন্দ-এর 'রওজাতুস সাফা' (সত্যের বাগান), কাশিফীর উপকথাধর্মী 'কালিলা ওয়া দিমনার' অনুকরণে রচিত 'আনোয়ার-ই-সোহেলী' এবং পবিত্র কুরআন হাদীসের ব্যাখ্যা

সম্বলিত 'আখলাখ-ই-মোহসীনী' (সৌন্দর্যের স্বভাব) প্রভৃতি ফারসী সাহিতেরে অমূল্য সম্পদ।

ফারসী সাহিত্যের সূচনা পর্ব থেকে শুরু করে মোংগল ও তৈমুর শাসন আমল পর্যন্ত কথা সাহিত্য পদবাচ্য উপন্যাস ও ছোটগল্প বলতে 'শাহনামা' কিংবা মসনবীর গল্পগুলোকেই বোঝায়। এর সঙ্গে আরও যোগ করা যায় কাশিকীর 'আনোয়ার-ই-সোহেলীর' গল্পসমূহ। আধুনিক সংজ্ঞা অনুসারে যাকে ছোটগল্প বা উপন্যাস বলা হয় ফারসী সাহিত্যে এসবের উদ্ভব পরের ঘটনা অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে। এ সম্পর্কে আধুনিক ফারসী কথা সাহিত্য শীর্ষক আলোচনায় আলোকপাত করার আশা রাখি।

তৈমূর-শাসনের পতনের পর ফারসী সাহিত্য দুটো ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে থাকে। একটি ছিল পারস্যের সাফাভী রাজ-শাসন কেন্দ্রিক এবং অপরটি ভারতবর্ষের সম্রাট বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মোঘল রাজ-শাসন কেন্দ্রিক। উভয় রাজ-শাসনই দেশের কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী এবং বুদ্ধিজীবীদের প্রাধান্য দিতে শুরু করলেন এবং দেশও শিল্প-সাহিত্যে সমৃদ্ধ হতে থাকলো। উল্লেখ্য যে, সাফাভী রাজবংশ ছিল গোঁড়াপন্থী শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত এবং মোঘলগণ সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত। সাফাভী রাজ-শাসন শিয়াদের প্রতি একটু পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করতে প্রয়াস পান, ফলে কাব্যক্ষেত্রেও এই ধারার লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠে। অপরপক্ষে, মোঘলদের মধ্যে এর বিপরীত-ধর্মীতা লক্ষ্য করা যায় এবং তাঁরা দেশ-জাতি নির্বিশেষে সকল কবি-সাহিত্যিকদের আহবান জানান মোঘল দরবারে এসে সাহিত্য ও শিল্পের পরিচর্যা করতে। এ ব্যাপারে উৎসাহব্যঞ্জক সাড়াও পাওয়া যায়। মোঘল সম্রাট আকবরের সময়ই এই প্রবণতা অধিক মাত্রায় লক্ষ্য করা যায়। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বাদাউনী উল্লেখ করে-ছেন, প্রায় একশত সত্তর জন কবি, যাঁদের জন্ম ছিল পারস্যে, তাঁরা ভারতে আসেন। শিবলী নোমানী তাঁর 'শিরুল আজম' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন একমাত্র সম্রাট আকবরের রাজদরবারে এসেছিলেন একান্ন জন কবি এবং তাঁদের সবারই জন্মস্থান ছিল পারস্যের বিভিন্ন স্থানে। এমনকি কবিরা ভারতে আসার আগ্রহ তাঁদের কাব্য রচনার মাধ্যমেও প্রকাশ করেছেন। প্রখ্যাত কবি সায়ীব-এর দুটো লাইন থেকেই অপর কবিদের ইচ্ছার ইংগিত পাওয়া যাবে ঃ

همچو عزم سفر هند که در هر دل هست
رقص سودای تو در هیچ سری نیست که نیست

একটি মাথাও নেই যে মাথায় ইচ্ছারা না নাচে
ভারত-দর্শন তরে ; প্রতিটি হৃদয়ে সে আকাঙ্ক্ষা
দীপ্ত হয়ে আছে।

আসল প্রসঙ্গে আসা যাক। তৈমূর-শাসনের পর পঞ্চদশ শতকের শেষ দশক, পুরো ষোড়শ শতক এবং সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত আর যাই হোক কাব্যক্ষেত্রে এক ভিন্ন গতি লক্ষ্য করা যায়। এই রীতি আর কিছুই নয় কাব্যের প্রাচীন রীতি বদলিয়ে তাঁর মধ্যে আধুনিকতার স্পর্শ দেওয়া। তৈমূর-শাসনের শেষ এবং শ্রেষ্ঠ কবি জামী থেকেই এর উন্মেষ ঘটে এবং তৎপরবর্তী মীর আলী শায়েব নবাই, কাতিবী, আমীর শাহী প্রমুখ কবিরাও এ ব্যাপারে যথেষ্ট প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। এই লক্ষণ আরও স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় আরও পরে অর্থাৎ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে, বিশেষ করে সিরাজের উরফী (মৃত্যু ঃ ১৫৯০-৯১ খ্রীঃ) ভারতের ফৈজী (মৃত্যু ঃ ১৫৯৫-৯৬) এবং সর্বশেষে ইস্পাহানের সায়ীব (মৃত্যু ঃ ১৬৬৯-৭০ খ্রীঃ) প্রমুখের রচনায়। এঁরা কবিতার আকৃতি-প্রকৃতি এমনকি বিষয়বস্তুতেও পরিবর্তন আনতে প্রয়াস পান। এই পরিবর্তনে অবশ্যি বিদেশী প্রভাব, বিশেষ করে অটোম্যান তুর্কী কবিতার প্রভাব বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল। তুর্কী সমালোচকরা এ ব্যাপারে নানাভাবে আলোকপাত করেছেন।

ইতিপূর্বে বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, আরবী সাহিত্যের মতো ফারসী সাহিত্যেরও কাব্য-শাখা বেশী বিস্তৃত এবং সমৃদ্ধ। এবং এই পরিচয় আমরা ইতিপূর্বের ‘সূচনা-পর্ব’, ‘গৌরবময় যুগ’ এবং সালজুক, মোংগল এবং তৈমূর শাসন আমলের কবিদের কাব্য-কর্মেও পেয়েছি এবং তৈমূর পরবর্তী সাফাভী এবং মোঘল শাসন আমল অথবা তার পরেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। বলা যায় যে, পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা বিভিন্নধর্মী সমালোচনা এবং কবি

সাহিত্যিকদের জীবনী সম্বলিত 'চাহার মাকালা,' 'মাজালিসুল উসসাক', 'আতশ কদা', 'হফত ইকলীম', 'ওয়াফায়াতুল আয়ান', 'লিসানুত তায়ের', 'রওজাতুস শাফা', 'শিরুল আজম' প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ করেছি। তৈমূর পরবর্তী যুগে এই ধরনের আর একটি গ্রন্থ মীর্জা সাম রচিত 'তোহফা সামী।' মীর্জা সাম ছিলেন সাফাভী সুলতান ইসমাঈলের পুত্র। 'তোহফা সামী'তে কবি-সাহিত্যিকদের জীবনী ও কাব্যসমালোচনা স্থান পেলেও তা ছিল পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট। কেননা শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত এই রাজকুমার অনেক কবি যাঁরা জীবনে মাত্র দু'একটা কবিতা লিখেছেন তাঁদেরকেও এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত কবিদের তো কথাই নেই। তদুপরি রাজপরিবারের কবিদের সম্পর্কেও ছিল তাঁর ভয়ানক পক্ষপাতিত্ব। চারশতের ঊর্ধ্বে কবিদের জীবনী এতে অন্তর্ভুক্ত হলেও তন্মধ্যে নাম করবার মত ছিল মাত্র জন পঞ্চাশেক। এঁদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কবি মাত্র কয়েকজন। যেমন ফিগানী (মৃত্যু ঃ ১৫১৯), ফৈজী (মৃত্যু ঃ ১৫৯৫-৯৬), উরফী (মৃত্যু ঃ ১৫৯০-৯১), নাজিরী (মৃত্যু ঃ ১৬১২-১৩), তালিব-ই-আমোলী (মৃত্যু ঃ ১৬২৬-২৭), সায়ীব (মৃত্যু ঃ ১৬৬৯-৭০) এবং আবু তালিব কালীম (মৃতু ঃ ১৬৫১) প্রমুখ।

ফারসী কাব্য-সাহিত্যে 'হিদায়াত' নামে প্রখ্যাত সমালোচক রিদা কুলী খানের 'মাজালিসুল ফুসাহা' গ্রন্থে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীরই তিনশত উনষাট জন কবির জীবনী পত্রস্থ হয়েছে এবং এঁদের মধ্যে পাঁচ জন; যেমন—কাসান অঞ্চলের সাবা, বিস্তামের ফরোগী, সিরাজের কানী, ইস্পাহানের মিজমার ও নাশাতকে প্রথম শ্রেণীর; সিরাজের বিসাল এবং হিদায়াত অর্থাৎ লেখক নিজেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং ইস্পাহানের কোরোশ এবং সিরাজের ওয়াই-কারকে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত কবি বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। আমরা এখানে মাত্র কয়েকজন কবি সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করবো।

কাব্য-সাহিত্যে 'হাতিফী' নামে খ্যাত মওলানা আবদুল্লাহ্ (মৃত্যু ঃ ১৫২০ ডিসেম্বর অথবা ১৫২১ সালের জানুয়ারী) ষোড়শ শতাব্দীর অন্যতম নামকরা কবি। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত সূফী-কবি জামীর আপন ভাগ্নে। কাব্য-ক্ষেত্রে হাতিফী ফেরদৌসী, নিজামী এবং হাফিজের অনুসারী ছিলেন। ফেরদৌসীর 'শাহনামা'র অনুকরণে

(অবশ্যি ছন্দের ব্যাপারে এটা প্রযোজ্য) তিনি রচনা করেন 'শাহনামা-ই-হজরত-ই-শাহ্ ইসমাঈল'। সাফাভী সম্রাট শাহ্ ইসমাঈলের প্রশংসাই এতে কীর্তিত হয়েছে। অনুরূপভাবে নিজামীর 'পাঁনচ গনজ' অথবা 'খামছার' অনুকরণে তিনি রচনা করেন 'লায়লা ওয়া মজনুন', 'খসরু ওয়া শিরীন' ইত্যাদি; 'হফত পয়করের' অনুকরণে 'হফত মানজার' এবং 'সিকান্দারনামা'র অনুকরণে 'তৈমুরনামা'। তাঁর অধিকাংশ কবিতাই ঐতিহাসিক তথ্য-নির্ভর এবং সহজ, সরল ও সাবলীল। একটি উদাহরণ ঃ

اگر بیضۀ زاغ ظلمت سرشت -
نهی زیر طاوس باغ بهشت
بهنگام آن بیضه پروردنش -
ز انجیر جنت دهی ارزنش
دهی آبش از چشمۀ سلسبیل -
بدان بیضه دم در دمد جبرائیل
شود عاقبت بیضۀ زاغ زاغ -
برد رنج بیهوده طاوس باغ

অাঁধারে আড়াল করে যদিবা কাকের ডিম তুমি
বেহেশ্‌তে রেখে আসো চুপিসারে ময়ূরের নীচে ;
এবং সে ডিম যদি ফোটার প্রাক্‌কালে, বেহেশ্‌তী
কমলার রস দিয়ে সিক্ত করো, অথবা যদিবা
সলসবিলের ধারা বয়ে যায় ডিমের উপরে—
অথবা জিব্রীল যদি সেই ডিমে ফুঁ দেন কখনো,
তথাপি সে ডিম থেকে কাকের বাচ্চাই আসে জেনো ;
অযথা সে ময়ূরের হয়রানি, কষ্ট বেশুমার।

হাতিফীর পরেই নাম করতে হয় সিরাজের ফিগানীর। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। আনুমানিক ১৫১৪ থেকে ১৫১৯ সালের মধ্যে তাঁর মৃত্যু ঘটে। সূফী-দরবেশ হিসেবেও তাঁর খ্যাতি সুবিদিত এবং এজন্য তাঁকে 'বাবা ফিগানী'ও বলা হতো। শিবলী নোমানী-এর

'শিরুল আজম' গ্রন্থে ফিগানীকে বলা হয়েছে 'রিয়াদুস্ শোআরা' অর্থাৎ কবিতায় নতুন স্টাইলের স্রষ্টা। রিদা কুলী খান তাঁর 'রিয়াজুল আরফীন' গ্রন্থে ফিগানীর উল্লেখ করেছেন বটে কিন্তু তাঁর অপর সমালোচনা গ্রন্থ 'মাজমাউল ফুসাহা'য় ফিগানীকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছেন। অথচ 'আতশকদা' এবং তোহফা-ই-সামী' গ্রন্থদ্বয়ের দু'জন লেখকই, যথাক্রমে লুৎফী আনী বেগ এবং সাম মীর্জা ফিগানীর প্রশংসা করেছেন। ফিগানী ক্লাসিকধর্মী কবিতার পরিবর্তন সাধন করে নতুন-স্টাইল সৃষ্টিতে ছিলেন মগ্ন। তাছাড়া কাব্যে স্তুতিবাদও তিনি পরিহার করার পক্ষপাতি ছিলেন। নমুনা স্বরূপ তাঁর কাব্যাংশ থেকে কিছু অনুবাদ পেশ করছি ঃ

১. সৌন্দর্য কটাক্ষ নয়, নয় কোনো যাদুর প্রকাশ,
সৌন্দর্য-রহস্য কিছু প্রকাশের উর্ধ্বে জেনো তুমি।

২. বন্ধুর হৃদয় তুমি কখনো বিদীর্ণ করো না কো—
পবিত্র কাবার চেয়ে মানুষের হৃদয় বৃহৎ।

৩. প্রাণের কুসুম, তুমি পৃথিবীতে বেশ সুখে থাকো—
কেবল যন্ত্রণাটুকু স্মৃতির-হৃদয়ে জেগে থাক!

ষোড়শ শতাব্দীর অন্যতম খ্যাতিমান কবি ফৈজী। তাঁর পুরো নাম শেখ আবুল ফয়েজ। তিনি ছিলেন মোঘল সম্রাট আকবরের সভা-কবি এবং প্রখ্যাত ঐতিহাসিক 'আইন-ই-আকবরী'র লেখক আবুল ফজলের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁর বাবা শেখ মোবারকও ছিলেন একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি। ফৈজীর আরবী, ফারসী এবং সংস্কৃতে ছিল সমান দখল। তাঁর কাব্য প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে সম্রাট আকবর তাঁকে 'সুলতানুস শায়ের' বা কবি-সম্রাট উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। মূল সংস্কৃত থেকে ফৈজীই প্রথম মহাভারতের ফারসী অনুবাদ করেন। নিজামীর 'খামছা'র অনুকরণে ফৈজীও 'মারকাজ-ই-আদবার' (গোলক-কেন্দ্র), সোলেমান ওয়া বিলকিস (সোলেমান ও শেবার রাণী), নাল ওয়া দামান (সংস্কৃত গল্পের পটভূমিতে রচিত রোমান্স কাব্য) ইত্যাদি। অনুরূপভাবে নিজামীর 'হফত পয়কর'-এর অনুসরণে 'হফত কিশওয়ার' (সাত মুল্লুক) এবং ফেরদৌসীর 'শাহনামা' এবং নিজামীর 'সিকান্দারনামা'র অনুকরণে

রচনা করেন 'আকবরনামা'। এসব ছাড়াও রয়েছে তাঁর কাব্য সংকলন 'দীওয়ান'। দীওয়ানে নয় হাজার সমিলের কাব্য-ছত্র ছাড়াও রয়েছে গজল, রুবাই, কাসিদা এবং অন্যান্য খণ্ড কবিতা। 'দীওয়ান' কাব্যগ্রন্থটি তিনি সম্রাট আকবরকে উৎসর্গ করেন। শিবলী নোমানী তাঁর 'শিরুল আজম' গ্রন্থে ফৈজীকে ষোড়শ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, ফৈজীর 'খামছা'য় যে সব রোমান্স-কাব্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেসব বর্ণনা এবং আবেগ সৃষ্টিতে পূর্ববর্তী কবিদের চেয়েও উত্তীর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছে বলে অনেক সমালোচকের ধারণা। এখানে তাঁর রোমান্স কাব্য 'নাল ওয়া দামান' থেকে কিছু অনুবাদ পেশ করছি। উল্লেখ্য, এই অংশটুকু সম্রাট আকবরের প্রশংসায় নিবেদিত ঃ

প্রেমের আগুন যদি আমাকে পোড়ায়
যেমন পুড়িয়ে ফেলে অবলীলাক্রমে
সব কিছু, তবে আমি সহজ নিয়মে
কাদা থেকে চাঁদ গড়ে দিব যে তোমায় !

আমার হৃদয় কুঁজো সে আগুনে গলে
কী স্বচ্ছ দর্পণ হবে, পৃথিবীর ছবি
সে দর্পণে ফুটে ওঠে, কী আনন্দে সবি
হাসবে দর্পণে নেচে দীপ্ত কৌতুহলে।

হ্যাঁ, আমি যাদুর রাজা, যাদু-মন্ত্র বলে
কেটে ফেলি শব্দ রাজ্য যখন তখন,
যেমন সে অগ্নিশিখা পোড়ায় কেমন
সব কিছু। কলমের আশ্চর্য কৌশলে
অন্ধকার রাত্রে জাগে প্রাচীন যুগের
হাজার মুখর ছবি, সুপ্ত মানবের।

কবির আত্মবিশ্বাস সম্পর্কে তিনি যে কতটা সচেতন ছিলেন তা তাঁর কাব্য-কর্মই প্রমাণ করে। কবি আরও বলেন ঃ

আমার কুটির জুড়ে চাঁদ আছে আলোর প্রস্বরে,
সূর্য তুমি ফিরে যাও, এসো না কখনো এই ঘরে।

ফৈজীর সমসাময়িক সিরাজের উরফী (মৃত্যু ঃ ১৫৯০-৯১ খ্রী ঃ)-ও একজন খ্যাতিমান কবি। সম্রাট আকবরের আমন্ত্রণে উরফীও তাঁর রাজদরবারে এসে যোগদান করেন। এবং মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত উরফী ভারতেই অবস্থান করেছেন। মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাঁর কাব্যধারা বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত। গজল, কাসিদা এবং স্তুতিবাচক কবিতা—সব ধারায়ই তিনি অবগাহন করেছেন। শিবলী নোমানীর তথ্য অনুসারে সূফী-দর্শন কেন্দ্রিক 'নাফসিয়া' (আত্ম-তত্ত্ব) তাঁর একমাত্র গদ্য রচনা এবং অবশিষ্ট সবই তাঁর কাব্য-কর্মের ফসল। ইতিপূর্বে উল্লেখিত হাতিফী, ফিগানী, ফৈজী প্রমুখের মতো উরফীও ছিলেন নিজামীর অনুসারী এবং নিজামীর অনুকরণে নিজামীর 'মাখজানুল আসরার' এবং 'খসরু ওয়া শিরীন'-এর মতো দুটো রোমান্স-কাব্য রচনা করেন। দুটি কাব্যগ্রন্থই বেশ সমাদর লাভ করে। তাছাড়া মৃত্যুর তিন বছর আগে অর্থাৎ ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর কাব্য সংকলন 'দীওয়ান' প্রকাশিত হয়। তাঁর সূফী-তত্ত্ব বিষয়ক একটি কবিতার কিছু অংশের অনুবাদ এইরূপ ঃ

হাজীরা তোমাকে খোঁজে হে আল্লাহ। সুদূর মক্কায়,
ইমাম তোমাকে খোঁজে পবিত্র গ্রন্থের সীমানায়—
অথচ তুমিতো আছো না-পাওয়ার রহস্য আড়ালে!
হে আল্লাহ! খুলে ফেলো রহস্য তোমার। হ্যাঁ, তাকালে
সহজে বুঝবে তারা, তারা আছে অন্য কোনো ধ্যানে।

হে আল্লাহ অহরহ তারা তো সজ্ঞানে
তোমার প্রশংসা করে কীর্তনের নানা মহিমায়;
একটি সুন্দর স্বপ্ন তাদের মুখর বর্ণনায়—
অথচ সে স্বপ্ন তারা নিজেরাই দেখেনি জীবনে!

উরফীর সামান্য পরেই নাজিরীর আবির্ভাব (মৃত্যু ঃ ১৬১২-১৩ খ্রীঃ) ফারসী কাব্য সাহিত্যে। খোরাসানে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি সম্রাট আকবরের রাজসভায় আমন্ত্রিত কবি ছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করেন এবং এখানে তাঁর মৃত্যুও ঘটে। শিবলী নোমানী তাঁর 'শিরুল আজম' গ্রন্থে ষোড়শ ও সপ্তদশ

শতাব্দীর যে সাতজন কবিকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করেছেন, নাজিরী তাঁদের অন্যতম। শিবলী নোমানী আরও উল্লেখ করেছেন যে, ফিগানী, ফৈজী, উরফী, নাজিরী এবং সায়ীব তাঁদের কাব্যের সহজ ভঙ্গী, উপমা-নির্বাচন এবং প্রকাশ নৈপুণ্যে কবিতাকে এতই মনো-মুগ্ধকর এবং হৃদয়গ্রাহী করেছেন যে, এসবের মধ্যে 'হোসনে তালিল' (অনুপম সৌন্দর্য) এবং 'ইরসালুল মাসাল' (অনন্য উপমা) সত্যি উপভোগ করার মতো। নাজিরীর কবিতার সূক্ষ্ম-দর্শন সত্যি ভাবিয়ে তোলে ঃ

আমার আকাঙক্ষা শুধু অতি ক্ষুদ্র এমন পৃথিবী
যেখানের অধিবাসী আমি তুমি, আর কেউ নয়।
আঘাত দিইনি আমি পৃথিবীর কোনোও হৃদয়ে
কেননা সে হৃদয়েতে তোমার এ ভালবাসা আছে।

উল্লেখ্য যে ফৈজী, উরফী, নাজিরী প্রমুখ প্রতিভাবান কবি ছাড়াও সম্রাট আকবরের রাজসভা অলঙ্কৃত করে অবস্থান করছিলেন বহু কবি। শিবলী নোমানীর মতে একান্নজন কবি কেবল পারস্য থেকেই এসেছিলেন। অপরপক্ষে 'মুন্তাখাবাত উল-তাওয়ারিখ' গ্রন্থের লেখক প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বাদাউনী যে ফিরিস্তি পেশ করেছেন তাতে সম্রাট আকবরের রাজদরবারে কমপক্ষে ১৬৭ জন কবি ছাড়াও ছিলেন ৩৮ জন শায়েখ বা ধর্মীয় নেতা, ৬৯ জন পণ্ডিত এবং ১৫ জন দার্শনিক ও ডাক্তার।

নাজিরীদের সমসাময়িক আর একজন প্রথম শ্রেণীর কবি তালিব-ই-আমোলী। পারস্যের আমোলে তাঁর জন্ম হলেও তিনি ভারতে চলে আসেন এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজদরবারে সভাকবি নিযুক্ত হন। বলা যায় যে, সম্রাজ্ঞী নূরজাহান তালিব-ই-আমোলীর কাব্য প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে যথেষ্ট সমাদর করতেন। সম্রাজ্ঞী নূরজাহান নিজেও ছিলেন একজন প্রতিভাদীপ্ত কবি। তালিব-ই-আমোলী জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভারতেই অবস্থান করেন এবং ১৬২৬-২৭ সালের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়। আমোলীর কবিতায় আধুনিক ভাবধারা স্পষ্ট। তাঁর দুটো কবিতার কিছু অংশের অনুবাদ পরপৃষ্ঠায় পেশ করছি ঃ

১. সকালে গোলাব কুঁড়ি কেমন হাসছে চোখ মেলে,
ইসার শ্বাসের মতো সতেজ হাওয়ারা খেলা করে।
গোলাব-পাঁপড়ি জুড়ে ঢেউয়ের মতন খেলে খেলে
হাওয়ার ময়ূর নাচে শিশিরের সমুদ্র উপরে।

২. আমার কবিতা, কথা, প্রতিটি শব্দের কারুকাজ
মুক্তো হয়ে জন্ম নেয় তোমার ও ভালবাসা থেকে ;
দুইটি বছর আমি নীরবে জ্বলেছি মুখ ঢেকে
কেবল তোমার প্রেম পাবো বলে ; মিথ্যে সব সাজ।

তোমাকে পারিনি দিতে আমার বুকের এই জ্বালা—
এখন ভুলেছি সব ঘরবাড়ী আত্মীয় সমাজ
প্রেমের ভিখারী হয়ে পথে পথে ঘুরি আমি আজ
আমার জীবন ঘরে এঁটে দিলে প্রেমহীন তালা !

উপরোক্ত কবিতাটি সম্রাজ্ঞী নূরজাহানকে নিবেদিত বলে 'তারজীবন্দ' গ্রন্থের লেখক হাতিফ-ই-ইস্পাহানী অনুমান করেন।

আমোলীর পরেই নাম করতে হয় হামাদানের আবু তালিব কালিমের। তিনিও ভারতে আসেন এবং সম্রাট শাহজাহানের রাজদরবারে সভাকবি হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। শিবলী নোমানী তাঁকে সপ্তদশ শতকের প্রথম শ্রেণীর কবি বলে উল্লেখ করেছেন। উপমা নির্বাচনে এবং নৈপুণ্যে তাঁর দক্ষতা ছিল অপরিসীম। ভারতীয় দর্শনে তাঁর জ্ঞান ছিল অগাধ এবং তাঁর কাব্য কর্মেও এই লক্ষণ সুস্পষ্ট। ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে তার মৃত্যু হয়। তাঁর কবিতার নিদর্শন ঃ

বেগবান স্রোতের মতন
তোমার ও ভালবাসা আমার হৃদয় বালুচরে
ছুটে এসে ফিরে যায় আপন প্রস্বরে।
ভাগ্যের পেছনে শুধু আমরা দু'জন

ঘুরেছি ফেরারী হয়ে কিছুই না পেয়ে, অকারণ।
যেমন সিঁধেল চোর খুঁজে ফিরে মওকা মতন
ধনীর সম্পদ নিতে যখন সে ঘুমে অচেতন—
তেমনি আমরা শুধু ঘুরেছি নীরবে
নকল হীরের উৎসবে।

যখন কারাভঁা যামে ঘুণ্টি কিন্তু বাজে না তখন।
আরম্ভ অথবা শেষ আমাদের কিছু জানা নেই
কাব্য-গ্রন্থ খুলে দেখি প্রথম ও শেষ পাতা নেই।

তাব্রিজের মীর্জা মোহাম্মদ আলীর কবি-নাম সায়ীব। শিবলী নোমানী সায়ীবকে ফারসী সাহিত্যের সর্বশেষ শ্রেষ্ঠ কবি বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এমন কাব্য-জগতে বিচরণ করেন, যে জগতে পরবর্তী কবিরাও পদচারণা করেছেন। সায়ীবও গজল লিখেছেন কিন্তু সে গজল ছিল প্রাচীন ধারা বিবর্জিত। তাছাড়া তাঁর কাব্যের শিল্পচাতুর্য অনেক কবিরই ঈর্ষার উদ্রেক করেছিল। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমন্ত্রণে তিনি ভারতে আসেন এবং জাহাঙ্গীর রাজদরবারের অমাত্য জাফর খানের সঙ্গে সায়ীবের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব জন্মে এবং জাফর খান যখন কাশ্মীরের শাসনকর্তা তখন কবি তাঁর সঙ্গে কিছুদিন কাশ্মীরেও অবস্থান করেন। কিছুদিন পর তিনি তাঁর জন্মভূমি পারস্যে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সাফাভী সম্রাট শাহ আব্বাসের সভাকবি নিযুক্ত হন। এবং এখানেই ১৬৭৭-৭৮ সালের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়।

সায়ীবের কাব্য-কর্মের বুদ্ধিদীপ্ত ভাবে স্বভাবতঃই কাব্য-পিপাসুদের আকৃষ্ট করে। মূল ফারসীসহ দু'একটা নমুনা দেয়া যাকঃ

از تیرآه مظلوم ظالم امان نیابد
پیش از نشانه خیزد از دل فغان کمان را

অত্যাচারী বোঝে নাকো তীরবিদ্ধ দীর্ঘশ্বাস কিছু,
দীর্ঘশ্বাস শুরু হয় ধনুকের তীর-ছোঁড়া থেকে।

شگوفه با ثمر هرگز نگردد جمع یکجا
محالست اینکه با هم نعمت و دندان شود پیدا

ফুল আর ফল কভু একস্থানে করো নাকো জমা;
দাঁত আর স্বাদ জানি পাশাপাশি চলে না কখনো।

উপরে উল্লেখিত প্রথম শ্রেণীর কবিরা ছাড়াও সপ্তদশ শতকের আরও অনেক কবি রয়েছেন, যাঁরা সমালোচকদের মতে দ্বিতীয়

শ্রেণীভুক্ত হলেও তাঁদের অবদান একেবারে উপেক্ষার নয়। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আস্তারাবাদের সাহাবী (মৃত্যুঃ ১৬০১-১৬০২), খাবানসারের জোলালী (মৃত্যুঃ ১৬১৫), একই অঞ্চলের জালাল আসীর (মৃত্যুঃ ১৬৩৯–৪০), মাসহাদের কুদসী (মৃত্যুঃ ১৬৪৬-৪৭), তেহরানের সালীম (মৃত্যুঃ ১৬৪৭-৪৮), মাজানদারানের আমানী (মৃত্যুঃ ১৬৫১), কাবুলের সাদ উদ্‌দীন আনসারী (মৃত্যুঃ ১৬৬১-৬২) প্রমুখ।

আঠার শতক ফারসী সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক অনুর্বর কাল বলে কথিত। রাজনৈতিক বিবর্তনই এই অনুর্বরতার মূলে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। আঠার শতকের ফারসী কবি ও কবিতা সমালোচনা জাতীয় দু'টি গ্রন্থ যথাক্রমে হাতিফ-ই-ইসফাহানীর 'তারজীবন্দ' এবং শায়েখ মোহাম্মদ আলী হাজিনের 'তাজকীরাত্-উল মু'আসিরিন' উল্লেখের দাবি রাখে। শেষোক্ত গ্রন্থের লেখক শায়েখ মোহাম্মদ আলী হাজিন পারশ্যের শাসনকর্তা নাদির শাহের রোষে নিপতিত হলে সেখান থেকে ভারতে চলে আসেন এবং এখানেই পঁচাশি বছর বয়সে, ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি একাধারে ছিলেন কবি ও গদ্য লেখক। তাঁর স্মৃতিকথাধর্মী গ্রন্থই 'তাজকীরাত উল-মু'আসিরিন'। এই গ্রন্থে স্মৃতিকথার পাশাপাশি সমসাময়িক কবিদের জীবনীও স্থান পেয়েছে এবং এতে প্রায় একশত জন কবির উল্লেখ আছে। এইসব কবিদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান মোল্লা মোহাম্মদ মমিন, কবি-নাম দা-ঈ (মৃত্যুঃ ১৭৪২-৪৩); মোল্লা মোহাম্মদ হোসাইন, কবি-নাম রফীক (মৃত্যুঃ ১৭৫৭-৫৮) ; ইস্পাহানের সায়্যীদ মোহাম্মদ, কবি-নাম সুআলা ; তাব্রীজের সায়্যীদ মাহমুদ, কবি-নাম সাদীক ; ইস্পাহানের মীর্জা জাফর, কবি-নাম সাফী ; একই অঞ্চলের সোলায়মান, কবি-নাম সাবাহী ; একই অঞ্চলের মীর্জা মোহাম্মদ আলী, কবি-নাম সুবুহ্ ; কোম এলাকার আগা তকী, কবি-নাম সাহ্‌বা ; সায়্যীদ আবুল বাকী, কবি-নাম তালিব, হজর জারির অঞ্চলের আকা মোহাম্মদ, কবি-নাম আশিক, একই অঞ্চলের তোফান ; বাদাখশানের গিয়াসী ; ভারতের সায়্যীদ মোহাম্মদ হাসান, কবি-নাম গালিব, ইস্পাহানের মীর সায়্যীদ আলী, কবি-নাম মোস্তাক ; সায়্যীদ আহমদ, কবি-নাম হাতিফ ; ভারতের

জেবুন্নেসা, কবি-নাম মখফী মীর্জা আবদুল কাদির, কবি-নাম বায়দিল ; এবং আরও অনেকে।

এঁদের কবিতার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, এঁরা ক্লাসিকধর্মী কবিতার ভাব, বিষয়বস্তু, গঠন-আকৃতি ইত্যাদি পরিহার করে নতুনত্বের স্পর্শ দিতে অতিমাত্রায় উদ্যোগী ছিলেন। তাছাড়া অনেকেই কাব্যে স্তুতিবাদ এবং ব্যক্তিবিশেষের প্রশংসা বর্জন করে স্তুতি-মুক্ত কবিতা লেখার পক্ষপাতী ছিলেন। নিম্নে দু'চার জন কবি ও তাঁদের কাব্যকর্ম সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করছি।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের কন্যা জেবুন্নেসা ফারসী কাব্য জগতে মখফী নামে খ্যাত। তিনি কাব্য-রচনায় অত্যধিক শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন এবং তাঁর গজল ফারসী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। শিবলী নোমানীর তথ্য অনুসারে জানা যায়, জেবুন্নেসা আওরঙ্গজেবের রাজদরবারের জনৈক অমাত্যের সঙ্গে প্রেমে পড়েন এবং এই প্রেম ছিল অত্যন্ত গোপনীয়। কিন্তু গোঁড়াপন্থী সম্রাট তা জানতে পেরে সেই অমাত্যকে ফাঁসির আদেশ প্রদান করেন। ফলে জেবুন্নেসার জীবনে নেমে আসে এক চরম দুঃখ। এবং এই দুঃখই তাঁকে পরবর্তী জীবনে কবি হতে সহায়তা করে। তাঁর অধিকাংশ কবিতায়ই এই দুঃখবাদ প্রকট। যেমন,

১. জলপ্রপাত

প্রপাত তুমি, অমন করে কাঁদছো কেন দিবারাত ?
সে কোন দুখে দিবসযামী তোমার চোখে অশ্রুপাত ?
পাহাড় চূড়ে আছড়ে মাথা সুদূর পানে বয়ে চলো—
তোমার চলা ব্যথার গান, শুনছি আমি সারারাত।

২. প্রেমিকের প্রতি

কালকে সারাটি রাত তোমার প্রেমের অগ্নি-শিখা
আমার বিশুষ্ক বুক পুড়িয়েছে দাউ দাউ করে ;
এবং নিঃশ্বাস বেয়ে স্ফুলিঙ্গের জ্বলন্ত দাহিকা
ঘুমের পোশাক সব পুড়িয়েছে সকালের ঘরে।

স্বপ্নের ভিতরে দেখি তোমার প্রেমের শব দেহ
কেমন জ্বলছে সুখে ভালোবাসা-উজ্জ্বল কাফনে ;

যেমন কাচের মাঝে সল্‌তে পুড়িয়ে ঝাড়বাতি
কী উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে আলোকিত আনন্দের ক্ষণে।

তখন লিখেছি আমি তোমার প্রেমের কাব্য-কথা ;
শব্দের উপরে সব বিন্দুগুলো ঝাড়-বাতি হয়ে
জ্বলেছে তারার মতো তোমার প্রেমের বিনিময়ে—
সলতে না পুড়ে কভু আলো দেয় শুনেছ একথা ?

৩. কবি ও কবিতা

আমিতো লুকিয়ে আছি আমার এ কাব্যের ভিতরে,
যেমন লুকিয়ে থাকে সুঘ্রাণ সে গোলাবের মাঝে ;
গোলাব নির্যাস যদি পাবার কামনা কেউ করে—
সে যেন আমার কাব্য আত্মার আকুতি দিয়ে পড়ে।

সল্‌তে না পুড়লে যেমন আলো হয় না তেমনি জেবুন্নেসা নিজেকে নীরবে পুড়িয়ে যে প্রেম-অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে গেছেন তা পৃথিবীর প্রাসাদ চিরদিন আলোকিত করে রাখবে। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পৃথিবী থেকে নিঃশেষ হন।

জেবুন্নেসার পরেই নাম করতে হয় মীর্জা আবদুল কাদির বায়দিলের। মোঘল শাসনের শেষ পর্যায়ে তিনি মোঘল দরবারের শেষ সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর পিতৃগোষ্ঠী তুর্কীস্তানের অধিবাসী হলেও তাঁরা সপ্তম শতক থেকেই ভারতে অবস্থান করছিলেন এবং ভারতের পাটনায় ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে বায়দিলের জন্ম হয়। আপন প্রতিভা বলে তিনি শুধু মোঘল দরবারের খ্যাতিমান কবি ছিলেন না, বরঞ্চ ছিলেন সম্মানীয় কবি।

বায়দিল ছিলেন অত্যন্ত স্পষ্টবাদী এবং এই লক্ষণ তাঁর সমগ্র রচনায় প্রতিফলিত। কোনো সম্রাট বা রাজশক্তির প্রশংসায় যেমন তিনি উম্মুখ ছিলেন না তেমনি গোঁড়াপন্থী ধর্মীয় নেতাদের সমালোচনা করতেও পশ্চাদ্‌পদ ছিলেন না। তাঁর মতে ধৈর্য, মানবতা, ন্যায়বিচার এবং প্রেম ইত্যাদিই আসল মনুষ্যত্বের লক্ষণ এবং তাঁর সমগ্র কাব্য-কর্ম এইসব গুণাবলী কেন্দ্র করেই আন্দোলিত। গজল, রুবাইয়্যাত ও কাসিদা ধরনের অসংখ্য কবিতা তিনি লিখেছেন

কিন্তু তাঁর কাব্য-ধারায় ছিল সম্পূর্ণ নতুন স্টাইল এবং বর্ণনা পরিপাট্যেও সেসব নতুনত্বের দাবিদার। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য-গ্রন্থের মধ্যে 'বাহার' (সমুদ্র), 'মসনবী', 'ইরফান' ইত্যাদি ফারসী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। 'ইরফান' কাব্য গ্রন্থে তিনি নাট্য-রীতিতে ঘটনার প্রবাহ সুললিত কাব্য ঝংকারে প্রবাহিত করেছেন। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর কবিতার কিছু নমুনা ঃ

১. পৃথিবী-তত্ত্ব

পৃথিবীর আশা ভরা জীবন যৌবন ধনমান
সকালে ঘাসের বৃন্তে শিশিরের ফোটা টলোমলো ;
ঘোড়ার মতন মৃত্যু সেইদিকে শুধু ধাবমান
যেমন আগুন ছুটে শুকনো খড়ের সন্নিধান।
আনন্দ ভক্ষণ করে নিরাশার অস্তিত্ব সকল,
ঠোঁটের সমস্ত দুঃখ নাশ হয় হাসিতে কেবল।

২. একমাত্র তুমি

কী যে ধ্যানে তন্ময় ছিলাম গতরাতে,
যা দেখেছি সকল কিছুই তুমি ছিলে ;
চোখ মেলে দেখবো তোমায়, সরে গেলে।
কী যে ধ্যানে তন্ময় ছিলাম গতরাতে।

যা শুনেছি কথার আওয়াজ পৃথিবীতে
সে সব তো তোমার কথাই কানে বাজে ;
এ হৃদয়ে যখন ছিলাম কান পেতে
তুমি শুধু বলছো কথা আমার মাঝে।

এ পৃথিবী নয়কো কিছুই ধুলো ছাড়া,
মিছে মায়া জালের বাঁধন মিছে সবি,
তবে কেন আড়ালে এমন থাকো হারা—
এই কথা ভাবছি কেবল আমি কবি।

আমি একা নইকো প্রমাণ সৃষ্টি তব,
স্বপ্ন মাঝে একাকী যখন ডুবে থাকি ;

তবু আমি তোমার স্মৃতিই বুকে রাখি,
কেননা এ আমার হৃদয় আশী নব।

দুই চোখে দেখি না যা এই মনে দেখি—
তুমি আছ এসব কথাই কাব্যে লেখি।

৩. রুবাইয়্যাত

তোমার দুঃখে গাই না আমি গান,
সকলি মিথ্যে, মিথ্যে এ অভিমান;
গুম্‌রে মরি দুঃখের হাহুতাশে
ধুঁয়ো বিহীন আগুনে জ্বলে প্রাণ।

মোঘল সাম্রাজ্যের পতন এবং ব্রিটিশ আধিপত্য বিস্তারের পর ফারসী সাহিত্যের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে ভারতের আর কোনো স্থান রইলো না। তখন ফারসী সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ালো আফগানিস্তান ও পারশ্য। পারশ্যের কাজার শাসন একাদশ ও দ্বাদশ শতকের ফারসী সাহিত্যের গৌরবময় যুগের পুনরুদ্ধারে বদ্ধপরিকর হলেন। উনবিংশ শতাব্দীর কাজার শাসনের সময় একদল প্রতিভাবান কবির প্রচেষ্টায় ফারসী সাহিত্যের গৌরব আবার বৃদ্ধি হতে থাকলো। এই সময়ে কাব্য-জগতে যাঁরা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করলেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইস্পাহানের সায়্যীদ মোহাম্মদ, কবি-নাম সাহাব (মৃত্যু: ১৮০৭-৮); আরদিস্তানের সায়্যীদ হোসাইন-ই-তাবাতাবী, কবি-নাম মীজমার (মৃত্যু: ১৮১০-১১); কাসান অঞ্চলের ফতেহ্ আলী খান, কবি-নাম সাবা (মৃত্যু: ১৮২২-২৩); ইস্পাহানের নাশাত (মৃত্যু: ১৮২৮-২৯); সিরাজের বিসাল (মৃত্যু: ১৮৪৬); সিরাজের কানী (মৃত্যু: ১৮৫৩-৫৪); বিস্তানের ফারোগী (মৃত্যু: ১৮৮৫); জামাদাকের ইয়াগমা, ইস্পাহানের সোরোশ, আফগানিস্তানের মেহের দীল খান, কবি-নাম মাশরেকী; একই অঞ্চলের গোলাম মোহাম্মদ খান, কবি-নাম তারজী; একই অঞ্চলের ওয়াসী; কাশ্মীরের হামিদ; আফগানিস্তানের ওয়াসিল এবং আরও অনেকে। এঁদের কয়েকজনের কাব্য-কর্ম সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করছি।

সাহাবের অধিকাংশ কবিতাই স্তুতিবাচক এবং তাঁর গজল এবং কাসিদাও পূর্ববর্তী কবিদের ক্লাসিকধর্মিতা থেকে মুক্ত হতে পারে

নি। তাঁর কাব্য সংকলন 'দীওয়ানে' বিভিন্নধর্মী কবিতা স্থান লাভ করলেও অধিকাংশ কবিতাই রাজশক্তির প্রশংসায় নিবেদিত। তাঁর স্মৃতিকথা জাতীয় গ্রন্থ 'রাশাহাত-ই-সাহাব' ফারসী সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থে সমসাময়িক কবিদের জীবনীসহ কাব্য সমালোচনাও স্থান পেয়েছে।

মীজমার ছিলেন কাজার সুলতান ফতেহ্ আলী শাহ্-এর রাজদরবারের সভাকবি। ইতিপূর্বে উল্লেখিত রিদা কুলী খান হিদায়াতের তিনটি প্রখ্যাত সমালোচনা গ্রন্থেই মীজমারের কবিতার ভূয়শী প্রশংসা করা হয়েছে। তবে তিনি অতিমাত্রায় গজনবী ও সালজুক শাসন আমলের কবি যেমন ফেরদৌসী, নাসির খসরু, মাসুদ সাদ, ওমর খৈয়্যাম, হাফিজ, আনওয়ারী প্রমুখের অনুসারী ছিলেন। তাঁর কাব্য-প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে সুলতান ফতেহ্ আলী খান তাঁকে 'মুজতাহিদুশ্ শোয়ারা' (সৈনিক কবি) উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। তাঁর কবিতার নিদর্শন এইরূপ:

রাত্রি

যখন সে রাজকন্যে রাতের আলয়ে তার মুখ
ঢেকে দিলো সযতনে নীল ওড়নায়;
হাজার তারকা এসে উজ্জ্বল আলোর মহিমায়
কেমন রাঙিয়ে দিলো আকাশের বুক।

সে মুহূর্তে মনে হলো বেহেস্তের অপরূপ হুর
সৌন্দর্য লীলায় যেন আছে ভরপুর।
অজস্র হুরীর মাঝে একটি সম্রাজ্ঞী, বাকী সব
আজ্ঞাবহ দাসী হয়ে করে কলরব।
সে সম্রাজ্ঞী চাঁদ পূর্ণিমার,
তারকারা দাসী যেন তার!

মীজমারের চেয়ে বয়সে সামান্য ছোট সাবাও কাজার সুলতান ফতেহ্ আলী শাহ-এর 'মালিকুশ শোয়ারা' বা সভাকবি ছিলেন। মীজমারের মতো সাবাও পূর্ববর্তী কবিদের অনুসরণ বা অনুকরণ-প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ পরিহার করিতে পারেননি। ফেরদৌসীর শাহনামার

অনুকরণে রচিত তাঁর 'শাহিনশাহ্ নামা' ফারসী সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলে অনেক সমালোচকই মন্তব্য করেছেন। রিদা কুলী খান হিদায়াতের মতে 'শাহিনশাহ্ নামা' শাহনামার অনুকরণে রচিত হলেও বিষয়বস্তু ও ছন্দ-বৈচিত্র্যের জন্য গ্রন্থটিতে আলাদা স্বাদ পাওয়া যায়। তাঁর অন্যান্য কাব্য-গ্রন্থের মধ্যে 'খোদা-বন্দ নামা', 'ইবরাত নামা' এবং 'গোলশান-ই-সাবা' বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। তদুপরি বিভিন্ন ধরনের কবিতাসহ তাঁর একটি 'দীওয়ান' গ্রন্থও আছে।

মীজমার ও সাবার মতো নাশাতও কাজার সুলতান ফতেহ্ আলী শাহ্র রাজদরবারের সভাকবি ছিলেন। আরবী, ফারসী ও তুর্কী ভাষায় সুপণ্ডিত নাশাত তিনটি ভাষায়ই লিখতে পারতেন তবে ফারসী কবি হিসেবেই তিনি সমধিক পরিচিত। নাশাতের গজল ফারসী সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তাঁর গজলের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ক্লাসিকধর্মী গজলরীতি থেকে তাঁর গজল ভিন্ন এবং গজলের বিষয়বস্তুতেও তিনি ভিন্ন স্বাদ পরিবেশন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। নিজের রচনা সম্পর্কে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক এবং এই সতর্কতা তাঁর কাছে ছিল আনন্দ এবং নিজেকে তিনি 'নাশাত' বা আনন্দ বলেই মনে করতেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে উচ্চারিত একটি লাইন তাঁর নিজের সম্পর্কের বক্তব্যই প্রকাশ করে :

از قلب جهان نشاط رفته

পৃথিবীর বক্ষ থেকে আনন্দ চলে গেলো।

শুধু তাঁর নিজস্ব বক্তব্য নয়—ফারসী কাব্যে তিনি আনন্দেরই সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাব্য-গ্রন্থ 'গানজিনা' (রতন)-এর সর্বত্র এই আনন্দ-গোলাব প্রস্ফুটিত। একটি উদাহরণ :

যদিবা বিদ্রূপ করে গোঁড়াপন্থী মোল্লারা আমাকে
তাহলে আমার জন্য খোলা আছে মুক্ত শুঁড়িখা[illegible]
যদিবা আমার কাছে মদ্য-কেনা [illegible]
তাহলে বিকাবো [illegible] চুলের প্রকাশ ?
[illegible]তো সহাস্যে নাচায় বিলকুল !

আমার প্রেয়সী শোনো, অযথা তাকাও কেন ওই
সকাতর দৃষ্টি মেলে আমার ও সঙ্গীদের পানে ;
আমার হৃদয়-কথা বন্ধুরা তো জানে না কিছুই
একমাত্র আমি জানি এ 'আনন্দ' সে কোন আহবানে !
বন্ধু সব, ফিরে যাও, আনন্দে বিষাদ দিয়ো নাকো,
সে আছে আমার প্রাণে এই কথা স্থির জেনে রাখো।
আমার বাগানে ফুল এতে নেই এতটুকু ভুল
এবং সেখানে আমি আনন্দ গানের বুলবুল।

মীর্জা মোহাম্মদ শফী কাব্য-জগতে যিনি বিসাল নামে খ্যাত তিনিও কাজার সুলতান ফতেহ্ আলী শাহ্-এর রাজদরবারে সভা-কবি ছিলেন। প্রখ্যাত কবি ও সমালোচক বিসমিল তাঁর কবি ও কবিতা বিষয়ক 'তাজকিরা-ই-দিলগুশা' গ্রন্থে বিসালকে ঊনবিংশ শতাব্দীর 'আজিমুল মিসাল' (অতুলনীয়) কবি বলে উল্লেখ করেছেন। রিদা কুলী খানও তাঁর 'মাজালিসুল ফুসাহা' সহ আরও দুটি গ্রন্থে বিসমিলের মন্তব্য সমর্থ করেছেন। বিসমিল ছিলেন বিসালের ব্যক্তিগত বন্ধু এবং এজন্য তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কেও মন্তব্য করতে পিছপা হননি। তিনি বলেছেন, বিসাল যেমন প্রতিভাধর কবি ছিলেন তেমনি সেই সঙ্গে ছিলেন অতিমাত্রায় 'আঁদাক জুদ্‌রন্‌জ' অর্থাৎ স্পর্শকাতর। বারো হাজার সমিলের ছত্র সম্বলিত গজল ও কাসিদা নিয়ে তাঁর 'দীওয়ান' ফারসী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তাছাড়া তিনি প্রখ্যাত আরবী লেখক জামাখশারীর অমর গ্রন্থ 'আতওয়াকুজ্ জাহাব' (স্বর্ণ-হার) ফারসীতে অনুবাদ করেন। কি বিষয়বস্তু, কি প্রকাশনৈপুণ্য সবদিক দিয়ে তাঁর কবিতা প্রশংসার দাবিদার। এখানে তাঁর চারটি 'রুবাইয়্যাত'-এর অনুবাদ পেশ করছি :

১. কারও হৃদয়ে আঘাত দিয়ো না তুমি,
প্রতিটি হৃদয় আল্লার আবাস ভূমি,
যেহেতু একদা ফিরবে সেখানে ফের—
ফতেহ্ আজ সে পথ বিনষ্ট করো না তুমি।
মীজমারের মতো সাবাত [illegible] গোপনে থাকে,
প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ পরিহার করিতে পারে [illegible] :

কী যে আলো তুমি ! তোমার আলোর মোহে—
সারাটি পৃথিবী পতঙ্গ তোমার ডাকে।

৩. প্লাবনের মতো দুচোখে জলের ঢল,
অথচ হৃদয়ে জ্বলে যে ঢের অনল :
কি অবাক কাণ্ড ! আগুনের দাবদাহ
জ্বলে জ্বলে হয় নীরবে প্রেমের জল।

৪. যে খোদা তোমার পবিত্র কাবায় আছে
গীর্জায় থাকেনা, শুনেছো এ কার কাছে ?
কাবায় তোমার যদি বা পথ না থাকে,
যাও সে গীর্জায়, সেখানেই খোদা আছে।

সুলতান ফতেহ্ আলী শাহ্-এর রাজদরবার আলো করা আর একজন কবি মোহাম্মদ হাবীব যিনি কাব্য-ক্ষেত্রে কানী নামে পরিচিত। ১৮০৭ কিংবা ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পারশ্যের সিরাজে তাঁর জন্ম হয়। ইতিপূর্বে উল্লেখিত বিসমিল এবং রিদা কুলী খান হিদায়াত যথাক্রমে 'তাজকিরা-ই-দিলগুশা' ও 'মাজালিসুল ফুসাহা' গ্রন্থে যেমন বিসালকে উনিশ শতকের 'অতুলনীয়' কবি বলে উল্লেখ করেছেন তেমনি তাঁরা কানীকে 'শায়েরুল আজম' বা শ্রেষ্ঠ কবি বলে উল্লেখ করেছেন। কানীর কাব্য-কর্মে যা সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তা এই যে, তিনি প্রশংসাব্যঞ্জক কবিতা লিখলেও তা ব্যক্তিবিশেষ বা রাজাবাদশাহ্-কেন্দ্রিক নয়—সে প্রশংসা ও স্তুতিবাদ নিসর্গপ্রীতি অথবা প্রকৃতির রূপ বর্ণনায় সীমাবদ্ধ। তাঁর বর্ণনা এবং প্রকাশ-চাতুর্যে কখনো কখনো প্রকৃতি মায়াময়ী রূপসী নারী হয়ে প্রতিভাত হয়েছে। অথবা প্রত্যেকটি বস্তু জীবন্ত হয়ে চোখের সামনে ধরা দিয়েছে। কাব্যে পূর্ববর্তী কবিদের প্রভাব না থাকলেও তাঁর গদ্য রচনা সম্বলিত 'কিতাব-ই-পরীশান' গ্রন্থটিতে সাদীর 'গুলিস্তাঁ'-এর রচনা-রীতি অনুকরণ করা হয়েছে। কানীর 'দীওয়ান' থেকে 'রাবী' বা বসন্ত কবিতাটি এইরূপ ঃ

নদীর দু'তীর জুড়ে হাসির মতন কাশফুল
সে কি সেই বেহেস্তের হুরীদের চুলের প্রকাশ ?
কেমন ঢেউয়ের মতো সহাস্যে নাচায় বিলকুল !

তুমি কি দেখেছো কভু পাথরে পাথর ঘষে ঘষে
অগ্নির স্ফুলিঙ্গ হয়। ক্ষতি নেই, তাকাও হরষে
পর্বতের পাদদেশে, অজস্র ফুটন্ত লাল চেলী
যেন সে পাথর ঠোকা লাল বর্ণ অগ্নির সহেলী
কেমন ছিটকে পড়ে হয়ে আছে মায়া এক রাশ।

সুলতান ফতেহ্ আলী শাহ্-এর উত্তরাধিকার সুলতান নাসির উদ্‌দীন শাহ্-এর রাজদরবার আলো করে কয়েকজন কবির আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁদের মধ্যে ফারোগী, ইস্পাহানের সরোশ এবং মাহমুদ খান প্রমুখ প্রধান।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আফগানিস্তানেও কয়েকজন প্রতিভাদীপ্ত কবির আবির্ভাব ঘটেছিল। এই কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা দানে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন আফগানিস্তানের প্রথম আমির মোহাম্মদ জে, আমির দোস্ত মোহাম্মদ খান, আমির আবদুর রহমান খান এবং অন্যান্য। এই সময়কার উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে রয়েছেন মেহের দীল মাশ্‌রেকী এবং গোলাম মোহাম্মদ খান তারজী, ওয়াসী, হামিদ, ওয়াশিল এবং আরও অনেকে। ইতিপূর্বেও এঁদের নামোল্লেখ করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে মেহের দীল মাশরেকী এবং গোলাম মোহাম্মদ খান তারজী ছিলেন রাজপরিবারভুক্ত। মাশরেকী প্রথম আমির মোহাম্মদ জে-এর ভাই এবং তারজী ভাতিজা। তারজী পরবর্তী জীবনে ধর্মসংস্কারক নেতা সৈয়দ জামাল উদ্‌দীন আফগানীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে দামেস্কে চলে যান এবং সেখানেই ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মৃত্যুবরণ করেন। কাব্যে প্রাচীনরীতি পরিহার করে আধুনিকতার স্পর্শ দেওয়াই ছিল এঁদের প্রধান লক্ষ্য। মাশরেকী এবং তারজী উভয়েই ছিলেন খ্যাতিমান কবি। এঁদের দু'জনের দুটো কবিতার অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করছি এবং কাব্যের বিষয়বস্তুতেই স্পষ্ট যে তাঁদের মনোভঙ্গী কতটা আধুনিক দৃষ্টিসঞ্জাত ছিল। মাশরেকীর 'মোমবাতি' শীর্ষক কবিতা ঃ

একদা সে এক সাধু বলেছিল মোমের প্রদীপে ;
'চতুর্দিকে আলো দাও, অন্ধকার তোমার ও নীচে।'
প্রদীপ সে হেসে বলে, 'আলো জ্বেলে পরের সমীপে

সেই তো আনন্দ মোর, নিজের এ দুঃখ মানি মিছে।
পরের আনন্দ লাগি নিজেকে বিলিয়ে দিই আমি
সেই তো আমার সুখ—এটাই আমার কাছে দামী।'

অপরপক্ষে গোলাম মোহাম্মদ খান তারজী প্রকৃতির বর্ণনায় কতটা মুখর লক্ষ্য করবার মতো। প্রাচীন রীতি অনুযায়ী রাজা-বাদশার প্রশংসা কীর্তন থেকে কবি কতটা পরাঙমুখ হয়েছেন সহজেই উপলব্ধি করা যায়। তারজীর 'নাসিম' বা বসন্ত হাওয়ার অনুবাদঃ

বসন্তের স্নিগ্ধ হাওয়া কেমন ছুটেছে ওই দূর
প্রস্ফুটিত ফুলের বাগানে ;
ফুলের পাঁপড়ি থেকে মেশ্‌কের মতো সুখ ঘ্রাণে
করে এ জীবন ভরপুর।
প্রতিটি ফুলের বৃন্তে মনে হয় বিজ্ঞের ভাষণ
ফুটে আছে মর্মবাণী হয়ে ;
এবং সে ভাষা বোঝে বাগান কেয়ারী করা মালী—
আর যে হিসাব রাখে বসন্তের অবাক বিস্ময়ে।
এই সে বসন্ত হাওয়া যে আনে হুরীর মুখে হাসি,
এই সে বসন্ত হাওয়া যে আনে নার্গিসাসের চোখে
ঢুলু ঢুলু ঘুমের আবেশ ;
এবং সে বসন্ত হাওয়া ফুলের খোশবু রাশি রাশি
ছড়িয়ে মানব মনে কী যে এক মহান উৎসুকে
জড়ায় সর্বাঙ্গে তার ফুলের জামার পরিবেশ।

আমির দোস্ত মোহাম্মদ খানের সভাকবি ওয়াসীও ছিলেন খ্যাতিমান কবি। তিনি ক্লাসিকধর্মিতা পরিহার করে প্রকৃতিতে ফিরে আসেন এবং প্রকৃতির চিত্র-চিত্রণে অতিমাত্রায় মুখর হয়েছেন। আর সেখানে প্রকৃতি ও মানুষ কবির চোখে এক হয়ে দেখা দিয়েছে ঃ

যখন তার সে মুখে হাসি ফুটে উঠে
হাজার বাগান যেন ফুটন্ত ফুলের সমারোহে
সেই মুখে সুঘ্রাণ ছড়ায় ;
যখন সে প্রেমিকের কবরের পাশ দিয়ে যায়—

তার সে প্রেমিক যেন কী যে এক মায়াময় মোহে
আত্মার শান্তিতে পায় ফুটন্ত ফুলের সুখ ঘ্রাণ !

আমির আবদুর রহমান খানের সভাকবি ওয়াসিল কিন্তু ক্লাসিক-ধর্মিতা পরিহার করতে পারেন নি। তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় হাফিজ, সাদী, আনওয়ারী প্রমুখের অনুসারী। তাঁর 'গজল' সমূহে হাফিজের প্রভাবই বেশী স্পষ্ট। একটি নমুনা ঃ

একদা বাগান থেকে সে এলো এ সরাইখানায়,
বিজ্ঞদের তুলে দিল লাল সুরা রাঙা পিয়ালায়।
সুগন্ধি মাখে নি তবু চুলে তার ঘ্রাণ ভরা ছিল
সুরাহীন দুটি চোখে নার্সিসাস-নেশা ভরা ছিল।
মনে হলো দুটি চোখ ভালোবাসা ভরা তীক্ষ্ণ তীর
যেমন সে যুদ্ধ ক্ষেত্রে ছুঁড়ে মারে সৈনিক ও বীর।
বাঁকানো চোখের ভুরু মনে হয় সদ্য নয়া চাঁদ,
যখন সে ছবি ফোটে পিয়ালায়—যাদুর আস্বাদ।

উল্লেখ্য যে, ওয়াসিল পূর্বসুরীদের অনুসারী হলেও তাঁর রচনা-শৈলীতে নতুনত্বের ছাপ ছিল। কেননা তিনি সমসাময়িকদের সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করতে পারেন নি।

তৈমুর শাসন পরবর্তী যুগে ফারসী-গদ্য সাহিত্য প্রধানতঃ ঐতিহাসিক রচনা কেন্দ্র করে প্রাধান্য বিস্তার করে। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফারসী সাহিত্য তখন দুটো কেন্দ্র-নির্ভর ছিল। একটি পারস্যের সাফাভী রাজ-শাসন কেন্দ্রিক অপরটি ভারতের মোঘল-শাসন কেন্দ্রিক। এবং এই দুটো কেন্দ্রই ফারসী সাহিত্যের পূর্ব-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখে।

এই সময়কার গদ্য-রচনার উল্লেখে বিশেষ করে কাব্য-সমালোচনা এবং বিভিন্ন ধরনের জীবনী ও ভ্রমণবৃত্তান্ত কেন্দ্রিক রচনা সমূহের বিবরণ ইতিপূর্বের কাব্যালোচনা শীর্ষক বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়েছে। ঐতিহাসিক রচনার মধ্যে খোন্দমীর যাঁর পুরোনাম গিয়াসউদ্দীন মোহাম্মদ বিন হামিদ উদ্‌দীন-এর 'রওজাতুস্‌ সাফা'। উল্লেখ্য যে, এই

গ্রন্থটি তাঁর পিতা মোহাম্মদ বিন খবন্দ শাহ যিনি সাহিত্যজগতে মীর খবন্দ নামে খ্যাত রচনা শুরু করেন কিন্তু ছয়খণ্ড লেখার পরই তাঁর ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হয়। অতঃপর তাঁর উপযুক্ত পুত্র খোন্দমীর গ্রন্থটি সমাপ্ত করেন এবং লেখক হিসেবে খোন্দমীরের স্বীকৃতিই অনেকে দিয়ে থাকেন। খোন্দমীরের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক রচনা 'হাবীব-উস্‌সীয়ার'। অনুরূপভাবে সাফাভী সুলতান শাহ ইসমাঈল প্রথম থেকে শুরু করে শাহ আব্বাস পর্যন্ত সকল সুলতানদের জীবনী ও কার্যক্রম সম্বলিত ইস্‌কান্দারের 'তারিখ-ই-আলম আরা—ই-আব্বাসী' গ্রন্থটিও নানা কারণে উল্লেখের দাবি রাখে। এসব ছাড়াও আরও অনেক মূল্যবান রচনার নাম করা যায়।

মোঘল শাসন আমলে আকবর-এর সময়ই শিল্প-সাহিত্যের সুবর্ণ সময় বলে চিহ্নিত করা যায়। আকবরের প্রধান মন্ত্রী এবং প্রখ্যাত কবি ফৈজীর ভাই আবুল ফজলের 'আকবর নামা' ও 'আইন-ই-আকবরী' যথেষ্ট খ্যাতির অধিকারী। গ্রন্থ দুটিতে আকবর শাসন আমলের সমস্ত বৃত্তান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিত্রিত হয়েছে। আকবরের আদেশে রচিত হয় সচিত্র 'তারিখ-ই-হামজা'। বারো খণ্ডে সমাপ্ত এই গ্রন্থটিতে এমন সব চিত্র শোভিত হয়েছে যে যা সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তদুপরি সম্রাট আকবরের আদেশে সম্পাদকীয় বোর্ড কর্তৃক রচিত ও প্রকাশিত হয় তৈমূরের বিজয় সংক্রান্ত 'জাফর নামা' (বিজয় পুস্তক), চেংগীজ খানের কীর্তি-কাহিনী সম্বলিত 'চেংগীজ নামা', মহাভারতের ফারসী অনুবাদ 'রাজম-নামা'; 'আয়ার দানিস' (জ্ঞানের পরশ পাথর), 'আনওয়ার-ই-সোহেলী'র আধুনিক ও পরিবর্তিত সংস্করণ ইত্যাদি। এসব ছাড়াও হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ রামায়ণ, কৃষ্ণ ও লীলাবতীর মূল সংস্কৃতে লিখিত কাহিনী সমূহ ফারসীতে অনুবাদ করানো হয়। এই সময়কার আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা 'তারিখ-ই-আলফী' বা হাজার বছরের ইতিহাস। বিভিন্ন পণ্ডিতদের বিভিন্ন অধ্যায় লেখার জন্য নিয়োজিত করা হয়েছিল এবং পরে এটি নাসরুল্লাহ্-এর পুত্র আহমদ কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

আকবরের উত্তরাধিকার সম্রাট জাহাঙ্গীর 'তুজক-ই—জাহাঙ্গিরী' নামে একটি স্মৃতিকথা রচনা করেন এবং ফারসী ভাষার অভিধান 'ফরহাংগ-ই-জাহাঙ্গিরী'ও তাঁর পরিশ্রমসাধ্য কাজ।

কবি জামী এবং সাঈবের পত্র-সাহিত্যের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এই দুই কবির পত্রাবলী গ্রন্থাকারে প্রকাশও আধুনিক পূর্বযুগের ফারসী সাহিত্যের অভিনব গদ্য রচনা।

আবদুল করিম খান এবং আবু তালিব খানের ভ্রমণকাহিনী সংক্রান্ত 'সফর-নামা-ই-করিম' এবং 'সফর নামা-ই-তালিব' গ্রন্থ দুটিও উল্লেখের দাবি রাখে। এঁদের সমসাময়িক মাওলানা শায়েখ মোহাম্মদ আলী হাজিনের 'তাজকিরাত উল মু'আসিরিন' সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে। ইতিপূর্বে আরও উল্লেখিত সাম মীর্জার 'তোহ্ফাসামী', রাজীর 'হফত ইকলীম' (সপ্ত প্রদেশ), লুৎফী বেগের 'আতশকদা' প্রভৃতি এই সময়কারই রচনা। ইবনে খাল্লীকানের 'ওয়াফায়াতুল আয়ান' (বিখ্যাত লোকদের শোকগাঁথা) এবং 'রওজাতুল জান্নাত' (বেহেশ্তের অধিবাসী) গ্রন্থ দুটিও উল্লেখের দাবি রাখে এই কারণে যে, গ্রন্থ দুটির প্রথমটিতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত এবং শেষোক্তটিতে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রখ্যাত মৃত ব্যক্তিদের জীবনালোচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে লিথুগ্রাফ করে প্রকাশিত 'নামা-ই-দানিশ' (পরশ পাথর পুস্তক) গ্রন্থটিই ফারসী সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য গদ্য রচনা। অর্ধ ডজন পণ্ডিত ব্যক্তিদের সমবেত প্রচেষ্টায় গ্রন্থটি রচিত হয়। এবং এই গ্রন্থে রাজা-বাদশাহ, পীর দরবেশ. কবি-সাহিত্যিক, চিকিৎসাবিদ, দার্শনিক প্রমুখদের জীবনী স্থান লাভ করেছে।

সোস্তার এলাকার সায়্যীদ নুরুল্লাহ্-এর 'মাজালিসুল মুমীনিন, (বিশ্বাসীদের সম্মেলন) গ্রন্থটিও ফারসী গদ্য রচনার একটি বিশেষ নিদর্শন। উল্লেখ্য যে, গ্রন্থটিতে সুন্নীদের প্রতি শ্লেষপূর্ণ ইংগীত ছিল ফলে সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে এই লেখককে হত্যা করা হয় বলে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা উল্লেখ করেছেন। ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত ইবনে সোলায়মানের 'কিয়াসুল উলেমা' (চিকিৎসকদের কাহিনী), এবং ১৮৭০–১৮৭১ সালের মধ্যে প্রকাশিত মীর্জা মোহাম্মদ আলীর 'নুজুমুস সামা-আ' (আকাশের তারকারাজী) প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য গদ্য রচনা। 'নুজুমুস সামা-আ' গ্রন্থে একাদশ শতক থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত সমস্ত শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত চিকিৎসকদের জীবনী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রকাশিত হাজী জয়নুল আবেদীনের 'বোস্তানুস্ সিয়াহাত' (ভ্রমণের বাগান) গ্রন্থটিও একটি মূল্যবান গদ্য রচনা।

ছোটগল্প বা উপন্যাসের ক্ষেত্রে তেমন কোন উন্নতির লক্ষণ আধুনিক পূর্বযুগে অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত দেখা যায় নি। এই সময়কালে যা কিছু রচিত হয়েছে তা সবই 'কালিল্লা ওয়া দিমনা', 'আনোয়ার-ই-সোহেলী', সাদীর 'গুলিস্তাঁ', জামীর 'বাহরিস্তান', মুঈন উদ্দীন জোবায়নীর 'নিগারিস্তান' ইত্যাদির অনুকরণ।

আধুনিক সংজ্ঞা-সঞ্জাত ছোটগল্প বা উপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত রচনা আরও পরের ব্যাপার—অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর বর্তমান দশক পর্যন্ত এর বিস্তৃতি।

৪

আধুনিক ফারসী সাহিত্য

ফারসী সাহিত্যে আধুনিকতার লক্ষণ বেশ কয়েক শতাব্দী আগে থেকে শুরু হলেও এই লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে। পারস্যের সঙ্গে ইউরোপীয় রাজশক্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও এই আধুনিকতার অন্যতম কারণ। কেননা, ইউরোপীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ফলে তাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাবও ফারসী সাহিত্যে অনুপ্রবেশ করে। তাছাড়া কিছু সংখ্যক কবি সাহিত্যিক এবং পণ্ডিত ব্যক্তি ইংরেজী, ফরাসী, জার্মানী ইত্যাদি ভাষা শিক্ষা করে সেই-সব ভাষার উচ্চতর সাহিত্য ফারসীতে অনুবাদ শুরু করেন। এ প্রসঙ্গে ভোলটেয়ারের 'দি হিষ্ট্রি অব পিটার দি গ্রেট' এবং 'দি হিষ্ট্রি অব চার্লস টুয়েলভ অব সুইডেন'; প্রখ্যাত নাট্যকার মোলের 'লি মেডেসিন মালগে', 'লি মিসানথ্রপে' এবং 'এল' 'ইতোরদি' প্রভৃতির নাম করা যায়। তাছাড়া পাশ্চাত্য দেশের অনুসরণে তাঁরা সাহিত্য রচনাও শুরু করেন। তাঁদের প্রথমদিককার রচনায় পাশ্চাত্যের প্রভাব থাকলেও অল্পদিনের মধ্যে তাঁরা স্বকীয়তায় প্রত্যাবর্তন করতে সমর্থ হন।

তাব্রিজ শহরে একটি উন্নত মানের ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা এবং ১৮৫২ সালে তেহরানে 'দার-উল-ফুনুন' নামে একটি আধুনিক শিক্ষার, কলেজ স্থাপন ফারসী সাহিত্যের উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। কেননা কলেজটি ছিল সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য ধরনের এবং শিক্ষকও আনা হয়েছিল পাশ্চাত্যের পণ্ডিতবর্গের মধ্যে থেকে বাছাই করে।

ফারসী সাহিত্যে আধুনিকতার সংযোগ স্থাপনে পত্র-পত্রিকার ভূমিকাও অনস্বীকার্য। শুধু দেশে নয়, সাহিত্যের প্রচার মাধ্যম হিসাবে ইরানের বাইরে থেকেও তাঁরা পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। প্রসঙ্গতঃ কন্স্টাণ্টিনোপল থেকে ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত 'আখতার';

১৮৯০ সালে মালকুম খান কর্তৃক লণ্ডন থেকে প্রকাশিত 'কানুন' (আইন); ১৮৯৩ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'হাবলুল মতিন', ১৮৯৮ ও ১৯০০ সালে কায়রো থেকে প্রকাশিত যথাক্রমে 'সুরাইয়্যা' এবং 'পরোয়ারিশ' প্রভৃতির নাম করা যায়। তাছাড়া দেশের মধ্যে থেকে প্রকাশিত 'সুর-ই-ইস্রাফীল' (ইস্রাফীলের শিঙ্গা), 'নাসিম-ই-সিমাল' (উত্তরের হাওয়া), 'মুসাব্বাত' (সমতা), 'ইরান শহর' প্রভৃতির ভূমিকাও ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেকটি পত্রিকা আধুনিক সাহিত্যের মূল্যবান রচনা ছাড়াও মতামত প্রকাশে ছিল অত্যন্ত সোচ্চার।

১৯২৬ সালে পাহলবী শাসন ক্ষমতায় আসার পর কায়েমী স্বার্থে সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করলেও তাঁরা জাতীয় জীবনের উন্নয়নে বেশ উৎসাহ ব্যঞ্জক কাজ করেন। এসবের মধ্যে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সাধন, ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে 'পার্শিয়ান একাডেমী' স্থাপন এবং বহু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা প্রভৃতির উল্লেখ অবশ্য করতে হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর রেজাশাহ্ পাহলবীর শাসন ব্যবস্থার পতনের পর শাহ্ রাজশাসনের ক্ষমতা দখল ফারসী সাহিত্যের উন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত করে। কেননা শাহ্ সরকার দেশের কবি-সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবীদের যেমন পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন তেমনি সংবাদপত্র ইত্যাদিকেও স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে উৎসাহিত করেন। ফলে দেশে একটি সুস্থ পরিবেশের সৃষ্টি হয় এবং সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনেও লেখক-বুদ্ধিজীবীরা অগ্রণীর ভূমিকা পালন করতে বদ্ধ-পরিকর হন। সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীতে এতোসব কবি, সমালোচক, গবেষক, কথাশিল্পী, নাট্যকার এবং ঐতিহাসিকদের আবির্ভাব ঘটেছে যে তাঁদের সাহিত্য-কর্ম সম্পর্কে আলাদাভাবে কিছু বলা অসম্ভব ব্যাপার। আমরা এখানে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করবো মাত্র।

১. কাব্য-শাখা

পঞ্চদশ শতকের কবি জামী থেকে কাব্যে আধুনিক ভাবধারার প্রচেষ্টা চলে আসলেও তৎপরবর্তী কবিরা অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর

প্রথমার্ধ পর্যন্ত কাব্যের চারটি বিষয়বস্তু যেমন ঐতিহাসিক, রোমাণ্টিক, স্তুতিব্যঞ্জক ও দর্শনতত্ত্ব এবং চারটি কাব্য-ধারা যেমন গজল, কাসিদা, মসনবী ও রুবাইয়্যাত সম্পূর্ণ পরিহার করতে পারেন নি। তবে তাঁরা বিষয়বস্তু এবং ধারা থেকে ক্রমশঃ সরে আসতে প্রয়াস পাচ্ছিলেন। এবং এর একটা পূর্ণরূপ প্রকাশ পায় ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধ থেকে আর এটাই ফারসী কাব্যের আধুনিক রীতি। এর মূলগত কারণ সম্পর্কে উপরের বক্তব্যে সামান্য ইংগিত দেওয়া হয়েছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিভিন্নধর্মী সংবাদ ও সাহিত্য-পত্রের প্রকাশ সাহিত্যিক মহলে এক অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করেছিল এবং বেশ সংখ্যক কবি সাংবাদিকতাকে তাঁদের সাহিত্য তথা জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন এবং সেই সঙ্গে কাব্য-ক্ষেত্রে তাঁদের অমর অবদান সংযোজন করতে সমর্থ হন। সাংবাদিক কবিদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'আদিবুল মামালিক' ফারহানী (১৮৬০—১৯২০); মীরজাদা ইশ্‌কী (১৮৯৩—১৯২৪); ইরাজ মীর্জা 'জালালুল মুলক' (১৮৭৪—১৯২৫); আদিব পেশওয়ারী (১৮৪২—১৯৩১); আরিফ কাজবিনী (১৮৮৩—১৯৩৪); মোহাম্মদ তকী বাহার 'মালিকুশ শোয়ারা' (১৮৮৬—১৯৫১); আবুল কাসিম লাহুতী (১৮৮৭—১৯৫৭) প্রমুখ। তাছাড়া একমাত্র কবিতা ছিল যাঁদের জীবনের প্রধান অবলম্বন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আল্লামা ইকবাল (১৮৭৩—১৯৩৭), পারভীন ইতেসামী (মৃত্যু ঃ ১৯৪১), দেখোদা (১৮৭৯—১৯৫৬) মোস্তাগনী (মৃত্যু ঃ ১৯৪১), এবং আরও অনেকে।

জন্ম ও মৃত্যু তারিখ দৃষ্টে উপরে উল্লেখিত কবিরা আর জীবিত নেই। বিংশ শতাব্দীতে যাঁদের জন্ম এবং যাঁরা এখনো নিরলস কাব্য-চর্চা করে ফারসী সাহিত্যকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করে চলেছেন তাঁদের মধ্যে নাম করতে হয় ইয়াসামী, পাজমাঁ বখতিয়ারী, কাবুলের নাদিম, একই অঞ্চলের ক্বারী, বায়তাব, খলিলী প্রমূখের। তাছাড়াও আধুনিক কালের আরও অনেক কবি রয়েছেন, সাহিত্য-পত্রিকার পাতা খুললেই যাঁদের রচনা নজরে পড়ে তাঁদের সংখ্যাও একেবারে উপেক্ষার নয়। ফারসী সাহিত্যের কাব্য-শাখা যেমন বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ তেমনি কবিদের সংখ্যাও আশাতীত।

উপরোক্ত কবিরা ক্লাসিকধর্মী কাব্য-রীতির বিষয়বস্তু এবং কাব্য-গঠন যেমন গজল, কাসিদা, মসনবী ও রুবাইয়্যাত সম্পূর্ণ পাল্টে

দিয়ে পাশ্চাত্য ধরনের কবিতা লিখতে শুরু করলেন। অবশ্য, দু'একজন প্রাচীনধর্মী কবিতা লিখতে প্রয়াস পেলেও কাব্য-গঠন এবং বর্ণনা পারিপাট্যে তা সম্পূর্ণ আধুনিক।

'সুর-ই-ইস্রাফীল' সাহিত্য-পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে ফারহানী নারী প্রগতির এক চরম পারকাষ্ঠা-প্রদর্শন করেন। বিংশ শতকের তিনিই প্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা কবি। শুধু কাব্যে নয়, নারী-স্বাধীনতা এবং সমান অধিকার সম্বন্ধে তিনি বেশ সংখ্যক প্রবন্ধও রচনা করেন। এ জন্য তাঁকে 'আদিবুল মামালিক' (দেশের গৌরব) কিংবা 'আদিবাতুজ জামান' (কালের গৌরব) ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত করা হয়। নারীদের সমান অধিকার সম্পর্কিত ভাবনা তাঁর কবিতায় অত্যন্ত সোচ্চার ঃ

> একই আকাশ, চন্দ্র-সূর্য, তারকার নীচে থেকে
> কেউ কি পেরেছে তাদের সে দান বেশী করে নিতে ?
> সমান যদিবা প্রকৃতির দান তবে কেন এই—
> কম আর বেশী ভাগাভাগি নারী আর পুরুষের ?

সাহিত্যে বিপ্লব সৃষ্টিতে বিশ্বাসী আরিফ কাজবিনী তাঁর কাব্য-কর্মে বিপ্লবের ধারা প্রবহমান করতে ছিলেন অতিমাত্রায় উৎসাহী। শুধু কাব্য-কর্মে নয় রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবক্ষয় কেন্দ্র করেও তিনি বেশ সংখ্যক প্রবন্ধ রচনা করেন এবং এগুলো বিদগ্ধ জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। তাছাড়া তিনি সঙ্গীত জগতেও বিপ্লব সাধন করেন। কেননা প্রাচীন গজল রীতির পরিবর্তে তিনি আধুনিক গানের প্রবর্তন করেন এবং তা ফারসী সঙ্গীত জগতে এক আলোড়ন সৃষ্টি করে। বোরখা আবৃতা হয়ে হেরেমে আবদ্ধ থাকতে মেয়েদের তিনি কখনো উৎসাহিত করেন নি। জাতীয় জীবনের উন্নয়ন, সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ এমনকি কাব্যে রোমান্টিকতা প্রবর্তনেরও তিনি ছিলেন ঘোর পক্ষ-পাতি। নারীপ্রগতির পক্ষে উচ্চকণ্ঠ তাঁর জবানীতেই শোনা যাক ঃ

সুন্দরী, বোরখা তোমার দূরে রাখো,
লজ্জার আড়ালে অযথা মুখ ঢ'কো।
ইমামের কথা শোনো না দুই কানে,
আঁধার ঘোচাও হাতের দৃপ্ত টানে।
যদি কেউ এসে থামায় শক্ত হাত—
বলে দিয়ো তাকে আরিফ আছে সাথে।

তেল ও চিরুনী দিয়োনা কভু চুলে,
ওসব এখন উপরে রাখো তুলে।
চুল দিয়ে বাঁধো ভীষণ শক্ত করে—
গোঁড়াদের মুখ; এবং ঘৃণা ভরে
দূরে ফেলে দাও মোল্লার উপদেশ—
অযথা নিজেকে করো না কভু শেষ!

এমনি ধরনের উচ্চারণ তাঁর সমগ্র কাব্য-কর্মে ধ্বনিত। কি বর্ণনা পরিপাট্য, কি বিষয়বস্তু সবটাতেই তাঁর সারল্য লক্ষণীয়। তবে প্রত্যেকটি রচনার অন্তরালে রয়েছে চাপা ক্রোধ এবং প্রতিবাদের ঝড়। তিনি কেবল কবি মাত্র ছিলেন না, মননশীল প্রবন্ধ রচনা এবং সঙ্গীত রচনায়ও তাঁর অবদান যথেষ্ট। তাঁর বহু গান ফারসী সুরের রাজ্যে মায়াজালের সৃষ্টি করেছে। তাঁর একটি কাব্য-সংকলন তাঁর অনুরাগী বন্ধুরা বার্লিন থেকে সাম্প্রতিককালে প্রকাশ করেছেন।

আরিফের স্কুল-ভুক্ত আর একজন কবি মীরজাদা ইশ্‌কী। তিনিও অতিমাত্রায় বিপ্লবপন্থী কবি। প্রাচীন রীতিতে তিনি কিছু গজল লিখলেও সে সবে তিনি বিপ্লব-রসের ভিয়েন সংযোগ করেছেন। তাঁর কাব্য-গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'নওরোজ নামা'। তাছাড়া পারস্যের প্রথম নাট্য-আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি জড়িত ছিলেন। তাঁর অনবদ্য দুটি নাটক গ্রন্থ 'সায়ে কাফন' (কালো কাফন) এবং 'কোরবান আলী' খুবই সমাদর লাভ করে। দুটো নাটকের বিষয়বস্তুই ঐতিহাসিক ঘটনা সম্ভূত অথচ সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা।

কাজার রাজবংশ সম্ভূত ইরাজ মীর্জা আধুনিক ফারসী কাব্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। সুললিত ছন্দ, গীতি-ধর্মিতা

এবং সারল্যের জন্য তাঁর কবিতা ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং এ জন্য তাঁকে দেশবাসী 'জালালুল মুলক' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। তাঁর কাব্যের একটি প্রধান বৈশিষ্টা এই যে, সামাজিক যন্ত্রণা ও সূফী-দর্শন উভয়ই তাঁর কাব্যে আশ্রিত অথচ আধুনিক মনোভঙ্গী-সঞ্জাত। তবে তিনি অতিমাত্রায় গোঁড়াপন্থী বিরোধী ছিলেন এবং নারীজাগরণে তাঁর ভূমিকা ছিল অসামান্য। পারস্যের স্কুল-পাঠ্য পুস্তকে তাঁর অনেক কবিতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দর্শন-তত্ত্ব ভারাক্রান্ত তাঁর একটি কবিতার অনুবাদ পেশ করছি ঃ

রূপসী, তোমরা যারা আছো এই পৃথিবীর মাঝে
অথবা আসবে যারা আগামী দিনের এই ঘরে ;
তাদের মাজার জেনো ইরাজ কবির এ হৃদয়।
ইরাজের বক্ষ ছাড়া প্রেমের সমাধি আর নেই,
কেননা ইরাজ বক্ষে সুপ্ত আছে সব ভালোবাসা।

একমাত্র প্রেম ছাড়া পৃথিবীতে জানিনা কিছুই,
তাই তো আমার বুক প্রেমের সমাধি হয়ে আছে।
যা কিছু করেছি আমি প্রেম আর সুখ ছাড়া নয়—
আমার প্রেমের কাছে জীবিত অথবা হোক মৃত
কোনোই তফাৎ নেই—ভালোবাসা সবখানে এক।

ইরাজ সেই সে কবি যে কখনো প্রেমহীন পথে
বাড়ায়নি একটি পা ; এবং আমার মৃত্যু হলে
প্রেমের পথের মাঝে তোমরা কবর দিয়ে রেখো—
তখনো দু'চোখে আমি প্রেমের সে যাত্রী দেখে নেবো।

আমার মাজার পাশে ভালোবাসা পা ফেলে তোমরা
আমাকে স্মরণ কোরো, তোমাদের স্মরণের ফিতে
আমার আত্মায় জ্বলে আলোকিত করবে পৃথিবী।

ইরাজের পরেই নাম করতে হয় আদিব পেশওয়ারীর। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে পেশওয়ারে তাঁর জন্ম হয়। আফগানিস্তানের গজনীতে তিনি শিক্ষা সমাপ্ত করে পারস্যে পাড়ি জমান। পারস্যের সাবজওয়ার শহরের প্রখ্যাত সূফী দার্শনিক মোল্লা হাদী সাবজওয়ারীর দর্শনতত্ত্বে

শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তিনি সেখানে সুদীর্ঘ তিরিশ বছর অতিবাহিত করেন। অতঃপর গুরুর আদেশ ক্রমে তিনি তেহরানে চলে আসেন এবং কাব্য-চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর অধিকাংশ কবিতাই খোরাসানীয় ক্লাসিকধর্মী এবং দর্শনতত্ত্ব সমৃদ্ধ। তাঁর কিছু কিছু কবিতায় সমাজবিবর্তন এবং স্বাজাত্যবোধের উন্মেষ বর্তমান। ১৯৩১ সালে কবির মৃত্যু ঘটে এবং তাঁর কবিতার সংখ্যা বিশ হাজার সমিলের চরণ বলে জানা যায়। একটি উদাহরণ ঃ

যুবক মুসলিমদের প্রতি ঃ

তোমাদের ভাগ্যে যদি আলোকের সূর্য চাও, তবে
শিরস্ত্রাণ পরে নাও মাথায় কর্মের,
এবং দু'হাতে
ভীষণ কষ্টের তরবারী।

লজ্জা আর অসম্মানে ভরে গেছে যেই দেশ আজ
এবং যেখানে শুধু শত্রুদের দৃপ্ত আনাগোনা
কি করে তা হবে বলো তোমার স্বদেশ?
কি করে তা হতে পারে তোমার সার্থক জন্মভূমি?

'স্বদেশকে ভালোবাসা ঈমানের অঙ্গ ছাড়া নয়',—
বলেছেন এই কথা রাসূলে করীম।
এ প্রেম যদি বা
না থাকে তোমার
তাহলে তোমরা কিন্তু মুসলিম নও।

পারস্য সম্রাটের সভাকবি (মালিকুশ্ শোয়ারা) মোহাম্মদ তকী বাহার আধুনিক ফারসী কাব্যে একটি বিশিষ্ট নাম। আরবী, ফারসী, পাহলবী প্রভৃতি ভাষা ছাড়াও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর প্রভূত জ্ঞান ছিল। তাছাড়া আরমাইক ভাষার প্রাচীন কিউনীফর্ম রীতি সম্পর্কেও তিনি দীর্ঘদিন গবেষণা করেন। রাজনীতির সঙ্গেও তিনি জড়িত ছিলেন। কাব্যে প্রাচীন রীতি সম্পূর্ণ পরিহার না করে তার সঙ্গে আধুনিক রসের ভিয়েন সংযোগ করতেই তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় উৎসাহী। সমস্যা জর্জরিত সমাজের প্রতিও তাঁর দৃষ্টি ছিল নিবদ্ধ। কবিতা ছাড়া

গবেষণা-কর্মেও তাঁর অবদান অসামান্য। কবি ফেরদৌসী, ঐতিহাসিক তাবারী, রাজনীতির বিভিন্ন দল, কবিতার বিষয়বস্তু ও ছন্দঃপ্রকরণ ইত্যাদি বিষয়ক গবেষণাসমৃদ্ধ গ্রন্থ সমূহ ফারসী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থেকেও তিনি কিন্তু যুদ্ধ পছন্দ করেন নি। তাঁর কবিতাই এই স্বাক্ষর বহন করে। সুদীর্ঘ কবিতার কয়েকটি লাইন এইরূপ ;

যুদ্ধ-পেচক ঃ

যুদ্ধের পেচক যেন কোনেদিন ডাকে না এখানে।
পাখার ঝাপটা তার মৃত্যু ডেকে আনে,
যুদ্ধের মতন কিছু ক্ষতিকর পৃথিবীতে আছে ?
বন্ধু হয় বন্ধুহীন সর্বনাশা যুদ্ধের সে কাছে।

লোভীর লোভের নেশা যুদ্ধের কারণ
লোভের কবলে সুপ্ত হাজার মরণ।

মুসলিম জাগরণ ও জাতীয়তাবাদের অগ্রদূত ইকবাল পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন কাশ্মীরের ব্রাহ্মণ পরিবারভুক্ত। তিনি লাহোর, কেম্ব্রিজ, হাউডেলবার্গ এবং মুনিচে শিক্ষা লাভ করেন। মুসলিম দর্শন ও সূফীতত্ত্ব তাঁর অধিকাংশ রচনার উপজীব্য।

উল্লেখ্য যে, এই উপমহাদেশে মুসলিম মনীষার মহত্তম বিকাশ তাঁর হাতেই সংঘটিত হয়। কেননা মুসলিম জাগরণ ও জাতীয়তাবাদের মহাবাণী এমন করে আর কোনো কবির কণ্ঠে উচ্চারিত হয় নি। তাই ইকবালের কবিতা শুধু সাহিত্যসমৃদ্ধির প্রধান বাহক নয়—ফারসী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

উর্দু ও ফারসী উভয় ভাষায় তিনি অজস্র কবিতা লিখেছেন এবং তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা অনেক। তবে ফারসী কাব্য গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'আসরার-ই-খুদী', 'জবুর-ই-আজম', 'রমুজ-ই-বেখুদী', 'পায়াম-ই-মাশরিক', 'আরমাগান,-ই-হিজাজ' ইত্যাদি। কাব্য সাধনায় তিনি ছিলেন মওলানা রুমীর অনুসারী। এবং তা তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন ঃ

রুমীর প্রতি

রুমীর প্রতিভা-দীপ্ত উদ্দীপিত করেছে আমারে।
রহস্যের গ্রন্থ হতে আজ আমি গেয়ে যাই গান,
আত্মা তাঁর অগ্নিকুণ্ড জ্বলন্ত উজ্জ্বল;
আমি শুধু অগ্নিকণা প্রাণ পাই মুহূর্তের তরে।
পতঙ্গের মতো মোরে গ্রাস করিয়াছে তাঁর
দীপ্ত অগ্নি শিখা;
আমার পেয়ালা পূর্ণ করিয়াছে কানায় কানায়,
স্বর্ণ মহিমায় মোর মৃত্তিকারে ফেরায়েছে রুমী;
প্রজ্বলিত অগ্নি-কুণ্ড করেছে সে মোর বিভূতিরে।

সূর্যের ঔজ্জ্বল্য, বিভা কেড়ে নিতে
বালুকণা উঠে এল মরুভূমি থেকে!
পথিক তরঙ্গ আমি তাঁর সমুদ্রের বুকে ফিরে আসি
বিশ্রাম আশায়;
ফিরে আসি তুলে নিতে মুক্তাখণ্ড তাঁর
দীওয়ানা মাতাল আমি মত্ত তাঁর সুরের সুরায়,
জীবন সঞ্চয় করি তাঁর বাণীমূলে।

তখন অনেক রাত্রি, বেদনায় পরিপূর্ণ হৃদয় আমার
আল্লাহ্‌র দরবার মাঝে তুলেছিল তিক্ত ফরিয়াদ;
ব্যথাতুর বিশ্ব মাঝে পান-পাত্র শূন্য দেখে উঠেছিল
আমার বিলাপ।
তার পর ঘুমঘোরে ক্লান্ত চক্ষু; ডুবে গেল অসহ ব্যথায়।

অকস্মাৎ সত্যদ্রষ্টা সে নরের হলো আবির্ভাব
সত্য উপাদানে যিনি লিখিলেন ফোরকান ইরানী ভাষায়,
আমাকে বল্লেন তিনি উন্মত্ত প্রেমিক!
পান করে প্রেমের শারাব,
হৃদয় তন্ত্রীতে হানো কঠিন আঘাত।
তোলো তুমি সীমাহীন যে উদাত্ত সুর,
সুরাপাত্র ফেলে দাও মস্তক আপন,
আঁখি তব দাও অস্তমুখে

ব্যথিত শ্বাসের উৎস করো আজ মৃদু হাসি তব
তোমার অশ্রুর রঙে হোক আজ রুধিরাক্ত
মানুষের বুক।

নীরব কুঁড়ির মতো কতদিন জাগিবে একাকী
সুরভি বিক্রয় করো গোলাবের মতন সহজে।
নিস্পন্দ রসনা তব জীবনের গভীর ব্যথায়!
নিজেকে নিক্ষেপ করো অগ্নিকুণ্ডে ইন্ধনের মতো
নীরবতা ভঙ্গ করো ঘণ্টাধ্বনি সম
কান্নার সহস্র সুর উচ্চারণ করো তুমি প্রতি
অঙ্গ হতে।

অগ্নি তুমি লেলিহান পরিপূর্ণ করো বিশ্ব
তোমার আভায়,

দগ্ধ করো পৃথিবীকে নিজের দহনে,
রহস্য জানিয়ে দাও সে প্রাচীন সুরা বিক্রেতার ;
সুরার তরঙ্গ হও ; স্বচ্ছ হোক তোমার বসন।
ভয়ের আরশি তুমি ভেঙ্গে ফেলো বিপণির মাঝে,
ভেঙ্গে ফেলো সুরার পেয়ালা,
নলের বাঁশীর মতো বাঁশী নিয়ে, এসো তুমি
নলবন থেকে।

লায়লার দ্বার থেকে আনো তুমি বার্তা মজনুর
নতুন সুরের ধারা সৃষ্টি করো তোমার সঙ্গীতে
উদ্যত উৎসাহে আজ জনতারে করো চিত্তবান।
[অনুবাদ ঃ ফররুখ আহমদ]

শুধু কাব্যে নয় মননশীল প্রবন্ধ ও গবেষণায়ও ইকবালের খ্যাতি সুবিদিত। মুসলিম-দর্শনে গবেষণার জন্যই তিনি ডক্টরেট লাভ করেন। ইকবালের কাছে ফারসী সাহিত্য সত্যি ঋণী। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইকবালের মৃত্যু হয়।

ইতিপূর্বে মহিলা কবি 'আদিবুল মামালিক' ফারহানীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর আর একজন নামকরা মহিলা কবি পারভীন ইতেসামী। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে তাব্রিজ শহরে

তাঁর জন্ম। তেহরান কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি নিবিষ্ট চিত্তে কাব্য সাধনা শুরু করেন। কাব্য-জগতে অনুপ্রেরণার মূলে তাঁর পিতার দান অসামান্য। তাঁর পিতা একাধারে ছিলেন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি এবং প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ। ফারহানীর মতো ইতেসামীও ছিলেন নারীপ্রগতিতে বিশ্বাসী এবং এজন্য তাঁর প্রয়াসও সমানভাবে লক্ষ্য করবার মতো। 'দীওয়ান' নামে তাঁর একটি কাব্য-সংকলন প্রকাশিত হয়েছে এবং সাড়ে ছয় হাজার চরণের কবিতা আছে। তাঁর দীওয়ান থেকে 'আঁসু-ই-ইয়াতিম' (অনাথের অশ্রু) শীর্ষক কবিতার অনুবাদ পেশ করছি ঃ

রাজা যায়, রাস্তা দিয়ে রাজা আসে যায়;
হাজার জনতা তাঁকে সালাম জানায়।
একটি অনাথ বলে, 'রাজার মাথায়
অমন মুক্তোর মতো কি সে চমকায়?'

অন্যজন স্বর তোলে, 'বলতে পারি না—
তবে জানি মুল্যবান বস্তু এক, তাই জ্বলে কি না!'
বৃদ্ধা এক ছুটে এসে বলে,
'ওটাতো আমার অশ্রু তোমাদের রক্তের কণিকা
সমস্ত জমাট হয়ে রাজার পাগড়ী মাঝে জ্বলে।'

যেমন ভেড়ার দলে বাঘ এসে ভেড়া শেষ করে
আমাদের সেই দশা, রাজার খপ্পরে আছি পড়ে।
ধার্মিক ইমাম যদি জমিন ও ঘোড়া ক্রয় করে
নিছক ডাকাত ছাড়া কি বলবো তাকে ?
এবং সে রাজা যদি দেশের সম্পদ
পুরে তাঁর একক উদরে,
নিছক ভিক্ষুক ছাড়া কি বলবো তাকে ?

অনাথের অশ্রু পানে তাকাও কৌতূহলে
দেখবে সে অশ্রু নয়, রাজার মানিক শুধু জ্বলে।

তাঁর কবিতার ভাষা সহজ সরল এবং সাবলীল অথচ হৃদয়গ্রাহী। সমাজে বিশেষ দিকের প্রতি ইংগিতবহ তাঁর কাব্যধারা সহজেই

পাঠক ও সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে ১৯৪১ সালে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

আধুনিক ফারসী সাহিত্যে আলী আকবর দেখোদা একটি অনন্য নাম। ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁর জন্ম। তেহরান বিশবিদ্যালয় থেকে আইনশাস্ত্র এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ডিগ্রিলাভ করে তিনি পাশ্চাত্যের অনেকগুলো দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি আরবী, ফারসী, ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় অত্যন্ত পণ্ডিত ছিলেন এবং তিন ভাষায় সমানভাবেই লিখতে পারতেন। তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন কাজভিনের অত্যন্ত ঐতিহ্যবাহী একটি শিক্ষিত পরিবার। পারিবারিক সাহিত্যস্পৃহাই তাঁকে সাহিত্যিক হতে উদ্বুদ্ধ করে।

'সুর-ই-ইস্রাফীল' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে যখন তাঁর 'চারান্দ পারান্দ' (হ-য-ব-র-ল) প্রকাশিত হয় তখন তা সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং উচ্চ প্রশংসিত হয়। অবশ্যি এই রচনা তিনি 'দাখভ' এই ছদ্মনামে প্রকাশ করতেন। রচনাগুলোর অন্তর্নিহিত রূপ ছিল সমাজের গলদের প্রতি ইংগিত এবং পুনর্জাগরণের আহবান। এই রচনাসমূহই পরে 'আখলাখ-উল-আশরাফ' (সম্ভ্রান্তদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য) নামে প্রকাশিত হয়। রম্যরচনায়ও তাঁর হাত ছিল অত্যন্ত পরিপক্ব।

লোকসাহিত্যের প্রবাদ, ছড়া, ধাঁধা ইত্যাদি নিয়ে তিনি চারখণ্ডে সমাপ্ত 'আমসাল ওয়া হিকাম' রচনা করেন। গ্রন্থটি ১৯৩১ সালে তেহরান থেকে প্রকাশিত হয়। তাছাড়া ফারসী সাহিত্যের সুবৃহৎ অভিধান 'লুগাত-নামা' তাঁর একটি অসামান্য কীর্তি। তদুপরি রোম সাম্রাজ্যের পতন, আল-বেরুনীর জীবন, আইনের সারবত্তা ইত্যাদি বিষয়ে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

কবি হিসেবেও তাঁর খ্যাতি সুবিদিত। কবিতার আধুনিকী-করণের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন কিন্তু সাদী, হাফিজ, খৈয়্যাম প্রমুখকে বিনষ্ট করে নয়—অনেকটা সোনার উপরে সোহাগার মতন। তাঁর কবিতা সহজ, সরল এবং উপমার আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। নিম্নের 'নিভানো বাতি' কবিতাটি তাঁর এক বন্ধুর উদ্দেশ্যে লেখা এবং সেই বন্ধুকে কাজার সুলতান মোহাম্মদ

আলী শাহ্-এর আদেশে হত্যা করা হয়েছিল। কবিতাটিতে শুধু কবির আবেগপ্রবণতা নয় একচ্ছত্র আধিপত্যের নৈরাজ্যও লক্ষ্য করবার মত।

জাগ্রত ভোরের পাখী শোনো ;
যখন আঁধার রাত অন্ধকার পাখনা গোটায়,
ভোরের সতেজ হাওয়া ঘুমের আবেশ ভেঙে দিয়ে
বয়ে চলে দূরে,—
আলোকের রশ্মি ছেড়ে সূর্য জেগে উঠে
সুনীল ও পর্দার আড়ালে
এবং আল্লাহ্ তাঁর আলোকের পূর্ণতায় আসে,
অন্ধকার শয়তান গোপন গহবরে ফিরে যায়---
তখন নিভানো বাতি স্মরণে এনো হে এক মনে।

যখন পৃথিবী হবে সুখী ও স্বাধীন,
এবং আল্লাহ্ তাঁর বান্দার বিনীত নিবেদনে
হাসবে কী সুখে
কেননা পৃথিবী থেকে জুলুম নিঃশেষ হয়ে গেছে—
বাগানে অজস্র ফুল হাসবে আনন্দে
তখন স্মরণে এনো আমার বন্ধুর সেই লাশ
যে নাকি সত্যের জন্য মৃত্যুর পিয়ালা
আকণ্ঠ করেছে পান কৃপাণ আঘাতে।

দেখোদার প্রায় সমসাময়িক আর একজন উল্লেখযোগ্য কবি ইয়াসামী। ফারসী, আরবী, ফরাসী, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষায় তিনি শুধু জ্ঞানই অর্জন করেননি, প্রত্যেকটি ভাষায়ই তিনি লিখতে পারতেন। তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত থেকে তিনি ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্য-চর্চায় নিয়োজিত থেকেছেন। ফারসী সাম্প্রতিক কবি ও কবিতা সম্পর্কে তাঁর আলোচনা গ্রন্থ ছাড়াও ইতিহাস-শাস্ত্রের উপর তাঁর বেশ কয়েকটি গবেষণা গ্রন্থ আছে। কাব্য-রচনায় তিনি সম্পূর্ণ আধুনিক মনোভঙ্গীর পক্ষপাতী। এমনকি সনেট ও ট্রিওলেট রচনা করে তিনি আধুনিক ফারসী কাব্যে এক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন এবং এজন্য তিনি

পাঠক মহলের সাড়াও পেয়েছেন। পঁয়ষট্টি বছর বয়সে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর কবিতার সূক্ষ্ম দর্শন, আবেগ নির্ভরতা সহজেই পাঠক-হৃদয় মোহাবিষ্ট করে। উদাহরণঃ

১. জীবনের পলায়ন

জীবন পাখীটা চলে যায়
রেখে যায় পৃথিবীতে কর্মের পালক;
আমাদের আত্মার দুঃখের ধুঁয়ো কিছু নয়, নয়—
কেবল দেয়াল
কালো করা ছাড়া।
সারাটি জীবন
কাহিনীর জিন্দান খানায়
বন্দী মোরা সব;
গল্পকার নিশ্চুপ এখন
কেবল রয়েছে সব গল্পগুলো আজ।

যার আছে ভালোবাসা সে-ই পায় অনন্ত জীবন,
চলে যাই ক্ষতি নেই, আমার এ কাব্য-ভালোবাসা
উজ্জ্বল মোহর হয়ে থাকবে এ কালের পাতায়।
আমার এ দেহ থাক অথবা না থাক, ক্ষতি নেই;
ভালোবাসা-কাব্য যদি থাকে
অনন্ত কালের ঘরে থাকবো এ আমি।

২. ভুলো না আমায়

প্রেমিক-প্রেমিকা মিলে একদা নদীর কিনারায়
আনন্দে বেড়াতে গিয়ে দেখে এক কী সুন্দর ফুল
ঢেউয়ের দোলায় দোলে নৃত্যের ভঙ্গীতে ভেসে যায়;
প্রেমিকা বললো ধীরে, 'আমার খোঁপার এই চুল
ধন্য হোক ওই ফুলে, আমি চাই...' প্রেমিকার কথা
শেষ না হতেই সেই প্রেমিক গভীর জলে নেমে
নাকানি চোবানি খেয়ে দুই হাতে ফুলের মমতা
কেমন আঁকড়ে ধরে মৃত্যুর মুহূর্তে আস্তে থেমে

সজোরে নিক্ষেপ করে সেই ফুল উপরে দাঙ্গায়
বললো করুণ স্বরে, 'এই নাও, ভুলো না আমায়।'

নতুন নতুন বিষয়বস্তু এবং অভিনব চিন্তা-ভাবনায় পাজমাঁ বখতিয়ারীর কবিতা ব্যঙময়। তাঁর এই স্বকীয়তার জন্য আধুনিক ফারসী কাব্যে তাঁকে সহজেই চিহ্নিত করা যায়। তাঁর প্রত্যেকটি কবিতা তাঁর দুঃখের কথাই উচ্চারণ করে এবং সে উচ্চারণেও একটা ভিন্ন স্বাদ লক্ষ্য করা যায়। মননশীল প্রবন্ধ ও গবেষণায়ও পাজমাঁ বখতিয়ারীর খ্যাতি সুবিদিত। সাম্প্রতিক ফারসী করিতার সমালেচনা বিষয়ক তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ সুধীমহল কর্তৃক সমাদৃত। নিম্নের কবিতাটিতে তাঁর দুঃখবাদের লক্ষণ স্পষ্ট ঃ

কেউ-ই আসে না এই আমার এ হৃদয় প্রাসাদে
নিজের বসতি ভেবে ; যাকে আমি প্রাণ দিতে চাই—
কেমন অবজ্ঞা ভরে দেয় সে ফিরিয়ে সেই প্রাণ।
অস্থির হৃদয় মোর রাখতে যে পায় না সাহস।

আজকে এখানে এই পৃথিবীর আলোর বাগানে
দুঃখের আগুনে জ্বলা এ হৃদয় এমন প্রদীপ
যেখানে ভুলেও আহা, কখনো সে পতঙ্গ আসে না।
হায়রে দুঃখের শ্বাস ! অযথা করো না আঁহাজারি !

তার সে হৃদয়ে কভু বাজবে না এর প্রতিধ্বনি ?
কতদিন শোনাবে সে আলেকজাণ্ডার-দারিয়াস
কাহিনী আমাকে বলো ? দশটি দিনের হেরফের
খুব স্বল্প এ জীবনে এবং সে এই উপন্যাসে !

বর্তমানে আফগানিস্তানও কয়েকজন প্রতিভাধর কবির জন্ম দিয়েছে। এঁদের মধ্যে খলিলী, বায়তাব এবং ক্বারী নানা কারণেই উল্লেখের দাবি রাখে। তিনজনই কাব্য-প্রতিভার জন্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন। দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবাদ এবং প্রকৃতির বর্ণনায় এঁরা মুখর। বায়তাবের কবিতায় প্রাচীন রীতির গজল, কাসিদা, মসনবী এবং রোমান্স ধারার স্পর্শ থাকলেও সেসব আধুনিক ভাবধারায় উজ্জীবিত। খলিলী একজন প্রবন্ধকারও, কবিদের

জীবনী সংক্রান্ত গবেষণা-গ্রন্থ তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। অনুরূপভাবে ক্বারী ছন্দঃ প্রকরণ এবং কাব্য বিচার সম্পর্কেও গবেষণা পুস্তক রচনা করেছেন। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তিন জনেরই অবদান অসামান্য। নমুনাস্বরূপ তিনজনের তিনটি কবিতার অনুবাদ পেশ করছি ঃ

১, খলিলী/কোহিস্তানের রাত্রি

পর্বতের সুউচ্চ শিখরে
বৃক্ষের সে সমারোহ কেমন আঁধার হয়ে আছে ;
তারকার মিটি মিটি কটাক্ষ, চাহনি
এবং চাঁদের শুভ্র হাসি
মনে হয় একমাত্র যুবক-যুবতীর ভালোবাসা
রাত্রির বিকাশ।

পর্বতের পাদদেশে মাঠের নির্জনে
ফুলের সৌকর্যে শুনি কী মধুর কোকিলের গান,
আঁধার বিদীর্ণ করে দূরে থেকে ওই
ভেসে আসে রাখালের বাঁশী।

২. বায়তাব/গজল থেকে

আমার জীবন প্রায় নিঃশেষ এখন।
সে সব উপেক্ষা করে বর্তমানে ঘুমের খরগোস।
সে ঘুম ভাঙাতে পারে একমাত্র মৃত্যুর দামামা।

এমন দুর্বল নই, সামান্য মদেই ডুবে যাবো—
কেবল ডুবতে পারি সুন্দরীর যুগল চাহনি
যখন মদির হয়ে আমাকে আমগ্ন করে রাখে।

সারাটি জীবন গেছে সত্যের খাতিরে
এবং সে সত্য শুধু মায়াবী নারীর দুটি চোখ—
সেখানেই নিমজ্জিত আমি আজীবন।

৩. ক্বারী/ভালোবাসার গান

উন্মত্ত প্রেমের থাবা ছিঁড়েছে যে আমার বসন,
সম্পদ লুপাট করে বানিয়েছে পথের ভিখিরী।

বিরহের স্বল্পক্ষণ আমার দু'চোখে অশ্রু আনে
সামান্য দু'এক ফোটা, তাতেই তো দুঃখের প্লাবন।

তোমার দর্পণ-দেহ কেন যে এমন চমকায়?

আমার গোপন প্রেম যতই আড়ালে রাখি আমি
কেন যে চোখের জল সেই কথা ফাঁস করে দেয়;
আমার বাগান শুধু নয়
যেখানেই ফুল ফোটে, লাল ফুল অগ্নির প্রকাশে
আমার বুকের অগ্নি সেইখানে জ্বলে শুধু জ্বলে।

হে ক্বারী, কেন যে ফুলের বাগানে
অমন সুমিষ্ট সুরে বুলবুল গান ধরে আহা!
হায়রে সাধের বুলবুল!
গানের যাদুর স্পর্শে নিতে কি পেরেছে
ফুল থেকে সুঘ্রাণ কখনো?

কাবুলের নাদিমও আধুনিক ফারসী কাব্যে একটি বিশিষ্ট নাম। গজল বা গীতিধর্মী কবিতা লিখেই তিনি সমধিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। নাদিম বিংশ শতাব্দীরই অন্যতম কবি ইরাজ মীর্জার অনুসারী এবং নাদিমের বহু কবিতায় ইরাজ মীর্জার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রেম ও প্রকৃতিই নাদিমের কবিতার প্রধান উপজীব্য। এই প্রেম কখনো দর্শন তত্ত্বে উজ্জীবিত আবার কখনো নর-নারীর প্রেম বিরহের স্বাক্ষর। নিম্নের সনেটধর্মী 'দীল-আসত' (আমার হৃদয়) কবিতাটিতে নাদিম-কল্পিত প্রেমের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়ঃ

তোমার প্রেমের কথা আমার এ হৃদয় বাগানে
কী লাল গোলাব হয়ে ফুটে আছে অপার কৌতুকে;
এমন বাগান আছে পৃথিবীর অন্য কোনোখানে?
আমার হৃদয়ে আজ রক্তস্রোত কী যে উৎসুকে
বয়ে চলে টগবগিয়ে, যেমন বসন্ত হাওয়া চলে
লাল গোলাবের ঘ্রাণ বুকে নিয়ে দূর থেকে দূরে—
এমন বসন্ত বুঝি আসে না কখনো কৌতূহলে,
হৃদয়ে এমন স্রোত কোথাও চলে না ঘুরে ঘুরে।

আমার মৃত্যুর পর আমার প্রেয়সী যদি আসে
আমার কবর পার্শ্বে; প্রতিদ্বন্দ্বী বন্ধুরা আমার—
তাকে তো দেখাবে এই নীরব কবর অনায়াসে;
তারাতো জানে না এই নাদিমের কবরের দ্বার
ভালোবাসা টোকা পেয়ে প্রতিটি মুহূর্ত খোলা থাকে—
ভালোবাসা ছাড়া কিছু নাদিম জানে না আপনাকে।

ফারসী সাহিত্যের কাব্য শাখা যে কত উন্নত এবং সমৃদ্ধির পথে অগ্রগামী তা উপরের আলোচনা থেকেই স্পষ্ট। বর্তমানে পারস্য, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশে এতো সব প্রতিভাধর কবির আবির্ভাব ঘটেছে যে তাঁদের তালিকা-প্রস্তুত করে তাঁদের সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা সত্যি দুরূহ ব্যাপার। তবে তাঁদের সামগ্রিক প্রচেষ্টায় আধুনিক ফারসী কবিতা যে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হচ্ছে এটা খুবই আশার কথা।

২. কথাসাহিত্য

কথা সাহিত্যের দুটো প্রধান অঙ্গ ছোট গল্প বা ‘দাস্তান-ই-কুতুহ্’ এবং ‘রুমান’ বা উপন্যাস হাল আমলের হলেও এর সূত্র সুদূর অতীত পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এ সম্পর্কে একটু সুদীর্ঘ আলোচনার অপেক্ষা রাখে। ‘বিড্‌পের উপকথা’ বা Fables of Bidpay-কেই ফারসী ছোট গল্পের জনক বলে অভিহিত করা হয়। ‘বিড্‌পের উপকথা’ মূলতঃ ভারতীয় পশু-পাখী কেন্দ্রিক প্রতীকাশ্রয়ী উপকথা-ধর্মী সংস্কৃত গ্রন্থ ‘পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ’-এর পুনর্বর্ণন। কথিত আছে যে, পারস্য সম্রাট নওশেরোয়াঁ (৫৩০—৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দ)-এর রাজত্বকালে তাঁর প্রধান মন্ত্রী বোজারজী মেহেরের আদেশক্রমে বারজোই নামে এক ডাক্তার-পণ্ডিত ভারতে আসেন এবং তিনিই ‘বিড্‌পের উপকথা’ পারস্যে নিয়ে যান। অল্প দিনের মধ্যেই গ্রন্থটি ফারসী ভাষার প্রাচীনরূপ পাহলবী ভাষায় অনুবাদ করা হয়। এবং গ্রন্থটি সমগ্র পারস্যে আলোড়ন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়।

গ্রন্থটির জনপ্রিয়তা এতোই বেড়ে যায় যে, ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সিরীয় পণ্ডিত বোদ 'সিরীয়' আঞ্চলিক ভাষায় গ্রন্থটির অনুবাদ সমাপ্ত করেন। এখানেই শেষ নয়। আব্বাসীয় শাসন আমলে প্রখ্যাত আরবী সাহিত্যিক ইবনে আল-মুকাফ্‌ফা ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থটি আরবীতে অনুবাদ করেন এবং এর নামকরণ করা হয় 'কালিলা ওয়া দীমনা'।

'কালিলা ওয়া দীমনা' এই নাম পরিবর্তন না করে গ্রন্থটি দশম শতাব্দীতে সামানীয় শাসক আবুনাসর বিন আহমদের নির্দেশক্রমে আরবী থেকে ফারসীতে অনুবাদ করানো হয় এবং কবি রোদাকী তার কাব্যরূপ দেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে আবার গ্রন্থটি ইবন আল মুকাফ্‌ফার মূল আরবী থেকে ফারসী লেখক আবুল মা' আলী নাসর-আল্লাহ্ ফারসীতে অনুবাদ করেন। এই দূরূহ কাজটি সমাপ্ত করা হয় ১১১৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং প্রধানতঃ এর মূলে ছিল গজনী শাসক সুলতান বহরাম শাহের নির্দেশ।

দীর্ঘদিন পর অর্থাৎ পঞ্চদশ শতকের শেষ দশকে সহজ সরল ও সাবলীল ভাষায় এর 'পুনর্বর্ণনা' করেন মওলানা হোসাইন ওয়ায়েজ—কবি নাম কাশিফী এবং তখন 'কালিলা ওয়া দীমনা' নাম পরিবর্তন করে এর নাম রাখা হয় 'আনোয়ার-ই-সোহেলী।' সম্রাট আকবর এতে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তাঁর নির্দেশে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক 'আকবর নামা' এবং 'আইন-ই-আকবরী'র লেখক আবুল ফজল 'আনোয়ার-ই-সোহেলী'র একটি পরিমার্জিত এবং পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করলেন এবং এর নাম দেওয়া হলো 'আয়ার দানিশ' (জ্ঞানের পরশ পাথর)। বলা যায়, Flabes of Bidpay/কালিলা ওয়া দীমনা/আনোয়ার-ই-শোহেলী/আয়ার দানিশ/পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ ইত্যাদি যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন এসব যে ফারসী ছোট গল্পের প্রথম পদক্ষেপ তাতে সন্দেহ নেই।

'কালিলা ওয়া দীমনা'র পর গদ্য রচনার নিদর্শন তথা ছোট গল্পের উল্লেখে সাদীর 'গুলিস্তাঁ', জামীর 'বাহারিস্তান', মুঈন উদ্দীন জোবায়নীর 'নিগারিস্তান' ইত্যাদির নাম করা যায়। এইসব গ্রন্থে বিভিন্নধর্মী চিত্তাকর্ষক গল্প তো আছেই তদুপরি রয়েছে উপদেশ-সম্বলিত কাব্য নিচয়। উল্লেখ্য যে, সাদীর 'গুলিস্তাঁ' ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে

সমাপ্ত করা হয় এবং এতে ভূমিকা, আটটি অধ্যায় এবং একটি ছোট্ট উপসংহার রয়েছে। ভূমিকাতে মহান আল্লার প্রশংসা নিয়ে গ্রন্থের শুরু, অতঃপর আতা বেগ আবু বকর বিন-সাদ-বিন জঙ্গী —যাঁকে গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে তাঁর প্রশংসা, সিরাজ রক্ষার জন্য আল্লার কাছে প্রার্থনা, গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ইত্যাদি ব্যক্ত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে একচল্লিশটি গল্প এবং গল্পের বর্ণনার মাঝে মাঝে বিষয়ানুগ উপদেশধর্মী কবিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে উনপঞ্চাশ, তৃতীয় অধ্যায়ে উনত্রিশ, চতুর্থ অধ্যায়ে চৌদ্দ, পঞ্চম অধ্যায়ে এগার, ষষ্ঠ অধ্যায়ে আট, সপ্তম অধ্যায়ে নয়, এবং অষ্টম অধ্যায়ে একশত গল্পের সমাহার ও ছয়টি বাণী দিয়ে 'গুলিস্তাঁর' সমাপ্তি টানা হয়েছে। সর্বমোট দুইশত একষট্টিটি গল্প এতে স্থান পেয়েছে।

অনুরূপভাবে জামীর 'বাহারিস্তান'-ও (বসন্ত বাগান) সাদীর 'গুলিস্তাঁ'-এর অনুকরণে রচিত। 'বাহারিস্তান'-এ আটটি অধ্যায় আছে এবং এই আটটি অধ্যায়ই বেহেশতের আটটি বাগানরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। 'বাহারিস্তানে'ও সাদীর অনুকরণে শিক্ষা, দর্শন, ধর্মো-পদেশ ইত্যাদি বিষয়ক গল্পের অবতারণা করা হয়েছে এবং এতেও গল্পের ফাঁকে ফাঁকে বিষয়ানুগ ছন্দোবদ্ধ কবিতা সংযোজিত হয়েছে।

মুঈন উদ্দীন জোবায়নীর 'নিগারিস্তান' (চিত্র-গ্যালারী) গ্রন্থটিও রচিত রয়েছে সাদীর 'গুলিস্তাঁ'-এর অনুকরণে। এতেও উপদেশধর্মী গল্প এবং কাব্যাংশ আশ্রয় লাভ করেছে। উল্লেখ্য যে, ১৩৩৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থটি তদানীন্তন সুলতান আবু সাঈদ বাহাদুর খানকে উৎসর্গ করা হয়। 'নিগারিস্তান'-এ সাতটি অধ্যায় আছে এবং সমালোচকদের মতে এটি সাদীর 'গুলিস্তাঁ'-এর চেয়ে উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত। 'গুলিস্তাঁ', 'বাহারিস্তান' এবং 'নিগারিস্তান' গ্রন্থসমূহের পরেই নাম করতে হয় 'হিন্দবাদ ওয়া সিন্দবাদ' নামক গ্রন্থটির। গ্রন্থটি মূলতঃ ভারতীয় উপকথা আশ্রয়ী এবং এর মূল রচনা সংস্কৃত বলে অনেকেই মনে করেন। গ্রন্থটির লেখকের সঠিক নাম কেউ উদ্ধার করতে পারেন নি। এতে রাজা, রাজ-পুত্র, এক অপরূপ সুন্দরী এবং সাতজন মন্ত্রীর রোমান্স-কাহিনী কীর্তিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গ্রন্থটির সুনাম আছে। এতে প্রধানতঃ নারীর রহস্যময়তার প্রতিই আলোকপাত করা হয়েছে অতিমাত্রায়।

কাহিনীর শুরুতে দুই লাইন কবিতা আছে এবং এই কাব্যাংশই নারী-চরিত্রের প্রতি ইংগিত দেয়ঃ

> ঘৃণায় মিশ্রিত কোনো ভালোবাসা সে স্বর্গে থাকে না,
> নারীর বচসারূপ উষ্মারাজি নরকও রাখে না।

'বখতিয়ার নামা' এবং 'জাফর নামা' গ্রন্থ দুটিও রোমান্স কাহিনীতে পূর্ণ। 'বখতিয়ার নামা'-এর লেখকের উল্লেখ পাওয়া যায় না তবে এটির প্রথম প্রকাশ কাল ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ শতক বলেও অনেকে অনুমান করেন। তবে ষোড়শ শতকেই গ্রন্থটি নিয়ে বেশী আলোচনা ও বিচার বিশ্লেষণ হয়। 'বখতিয়ার নামা'য় এক রাজার রোমান্স কাহিনী বিবৃত হয়েছে—যে রাজা মন্ত্রীর মেয়ে বিয়ে করে শেষ পর্যন্ত রাজ্য ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। পরে অবশ্যি রাজ্য পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়।

'জাফর নামা'র লেখক শরাফ উদ্দীন আলী ইয়াজদী। তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর অন্যতম ইতিহাস-প্রণেতা। গ্রন্থটি সম্পর্কে আগেও উল্লেখ করা হয়েছে। এই গ্রন্থটি ইতিহাস তথ্য-নির্ভর হলেও এতে কিছু চিত্তাকর্ষক রোমান্স-কাহিনী আছে।

উপরোক্ত গ্রন্থ দুটির সমধর্মী প্রখ্যাত ফারসী কবি নাখশাবী রচিত 'তূতিনামা' (তোতা-কাহিনী)ও প্রসঙ্গতঃ উল্লেখের দাবি রাখে। গ্রন্থটি চতুর্দশ শতকে রচিত বলে অনুমান করা হয় এবং সপ্তদশ শতকে কাদেরী নামক এক ফারসী লেখক তাঁর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করেন। 'তূতিনামা'র কাহিনীর সঙ্গে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ 'সুক-সপ্ততি'-এর প্রভূত মিল রয়েছে এবং অনেকে 'তুতি-নামা'কেও মূল সংস্কৃত গ্রন্থের পুনর্বর্ণন বলে অনুমান করে থাকেন। তবে 'সুক সপ্ততি'তে আছে বায়ান্নটি গল্প, পক্ষান্তরে 'তুতিনামা'য় পঁয়ত্রিশটি গল্প আশ্রয় লাভ করেছে। প্রত্যেকটি গল্পই রোমান্স-কেন্দ্রিক। এতে অপুত্রক রাজা আহমদ সুলতানের মায়মুন নামে এক পুত্র লাভ—পুত্রের সঙ্গে খোজিস্তাহ্ নাম্নী এক রাজকুমারীর বিয়ে এবং রাজকুমারীর অনুরোধে এক তোতা পাখী ক্রয় এবং তোতার মুখেই সুন্দর কাহিনী বর্ণনার ইতিহাস আছে। এই কাহিনীর মধ্যে

রয়েছে ধর্মাশ্রিত উপদেশ, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, আতিথেয়তা, কাজীর বিচার—এককথায় জীবন-কেন্দ্রিক সব ধারণা।

মোঘল সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে রচিত 'বাহার-ই-দানিশ' (প্রজ্ঞার বাগান) গ্রন্থটিও এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। এটি রচনা করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক এনায়েত উল্লাহ। 'বাহার-ই-দানিশের' কাহিনীসমূহ রোমান্টিক, চিত্তাকর্ষক এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়। জনৈক জাহান্দর বাদশাহ্‌র প্রেম-কাহিনী এতে কীর্তিত হলেও নারী-চরিত্রের প্রতি সর্বত্র কটাক্ষ করা হয়েছে।

দশম শতাব্দী, একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত আরবী লেখক বদি-উজ-জামান হামদানীর 'মাকামাতে হামদানী', আল হারিরীর 'মাকামাতে হারিরী' এবং বিশ্বখ্যাত 'আলিফ-লায়লা ওয়া লায়লা'ও এই প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবি রাখে। এই গ্রন্থসমূহও বিভিন্ন ফারসী লেখক ফারসী ভাষায় অনুবাদ করেন। এবং এর একটা প্রভাবও ফারসী সাহিত্যে প্রভূত ক্রিয়া করে।

উপরন্তু দশম শতাব্দীতে সম্রাট আবু মনসুর-এর নির্দেশক্রমে গদ্যে যে 'শাহনামা'র সংস্কার সাধন করা হয়—এই 'শাহনামা'ও কথা-সাহিত্যের উল্লেখে স্মরণ করা যেতে পারে।

উপরে উল্লেখিত গ্রন্থসমূহকে ফারসী কথা-সাহিত্যের পটভূমি হিসেবে দাঁড় করানো যায়। কেননা, কথা-সাহিত্য পদবাচ্য গল্প ও উপন্যাস উভয়ের স্বাদ উপরোক্ত গ্রন্থসমূহে রয়েছে। এ জন্যই বলেছিলাম, ফারসী কথা-সাহিত্যের সূত্র সুদূর অতীত পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এর ইতিহাস সুপ্রাচীন কালের।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে ফারসী সাহিত্যে রেনেসাঁ আন্দোলন শুরু হয় এবং এই আন্দোলনের ফলশ্রুতিতেই সাহিত্যে আধুনিকীকরণের প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ সম্পর্কে আধুনিক ফারসী সাহিত্য পর্বের শুরুতেই বলা হয়েছে। কথা-সাহিত্যের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য।

প্রথমে উপন্যাসের কথাই ধরা যাক। জাতীয় জাগরণ এবং সাহিত্যের পুনর্বিন্যাস সাধনে দুটো উপন্যাস প্রথমে দিকদর্শনের কাজ করে। তন্মধ্যে একটি হাজী জয়নুল আবেদীনের মূল রচনা

'সিয়াহত নামা-ই-ইবরাহীম বেগ' (ইবরাহীম বেগের ডায়েরী), অপরটি জেমস্ মোরিয়ারের প্রখ্যাত উপন্যাসের অর্থাৎ 'দি এ্যাডভেন্চার অব হাজী বাবা অব ইস্পাহান'-এর ফারসী অনুবাদ। দুটো উপন্যাসই আধুনিক ফারসী কথা-সাহিত্যে চেতনা সঞ্চারী ক্রিয়া করে। এর পরে অবশ্যি আলেকজাণ্ডার দামুস, মোলের প্রমুখের যথাক্রমে উপন্যাস ও নাটকও অনূদিত হয়। আমাদের আলোচনায় মূল রচনার প্রতিই প্রাধান্য আরোপ করবো।

রেনেসাঁ-আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ক্লাসিকধর্মিতা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে নয়—এর পরিবর্তন সাধন করে নবরূপ প্রদান করা। সেই পরিবর্তনের মধ্যে ছিল বিষয়বস্তুর নতুনত্ব, আঙ্গিক বা স্টাইলের অভিনবত্ব এবং সর্বোপরি ভাষার সারল্য তথা প্রকাশভঙ্গীর সাবলীলতা। এক কথায় আধুনিক সংজ্ঞাসঞ্জাত পাশ্চাত্যের অনুকরণে সাহিত্য নির্মাণ। এদিক দিয়ে বিচার করলে হাজী জয়নুল আবেদীন মারাঘীর 'সিয়াহত নামা-ই-ইবরাহীম বেগ' একটি সার্থক উপন্যাস।

'সিয়াহত নামা-ই-ইবরাহীম বেগ'-এর কাহিনী নির্মাণেও নতুনত্ব আছে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ইবরাহীম বেগ। সে তাব্রিজের একজন ধনী ব্যবসায়ীর পুত্র। তার জন্ম এবং যৌবন কেটেছে মিশরে। তার বাবার কাছে সে শিক্ষা লাভ করেছে দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য, স্বদেশের প্রতি অনাবিল ভালোবাসা ইত্যাদি। তদুপরি সে জানতে পেরেছে যে তার দেশ 'স্বর্গাদপি গরিয়সী' অর্থাৎ স্বর্গের চেয়েও মনোরম। পিতার শিক্ষায় আস্থা রেখে নিজের দেশ ইরানে প্রত্যাবর্তন করে তার মনের গতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেলো। তার উপলব্ধিতে সে বুঝতে পারলো তার পিতার সমস্ত তথ্য সম্পূর্ণ ভুল। কেননা 'স্বর্গের' পরিবর্তে সেখানে অত্যাচার, অনাচার, দুঃখ-দারিদ্র্য ইত্যাদি। এবং এসব চিত্রই পরিস্ফুট করেছেন তিনি উপন্যাসের প্রতিটি পাতায়। তাছাড়া বর্ণনার পারিপাট্য এবং ভাষার প্রাঞ্জলতা গ্রন্থটিকে মহিমান্বিত করেছে। গ্রন্থটি রচনার মূল উদ্দেশ্যই জনজীবনে জাগরণের স্পৃহা সৃষ্টি করা এবং এ জন্য তিনি সফলকামও হয়েছেন পুরোমাত্রায়। উল্লেখ্য যে, 'সিয়াহত নামা-ই-ইবরাহীম বেগ' তিন খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ড তারিখ বিহীন অবস্থায় মিশর থেকে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ড ছাপা হয় ১৯০৭ সালে কলিকাতা থেকে এবং সর্বশেষ

খণ্ড তিনি সমাপ্ত করেন ১৯০৮ সালের মধ্যে এবং ১৯০৯ সালে ইস্তাম্বুল থেকে খুব সুন্দর ছাপা পরিব্যাপ্ত হয়ে প্রকাশিত হয়।

হাজী জয়নুল আবেদীন মারঘীর পর যাঁরা নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে উপন্যাস রচনায় এগিয়ে আসেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মোহাম্মদ বাকীর খোসরুভী, শেখ মুসা নাসরী, হাসান বাদী, আবুল হোসাইন সান আতিজাদা কিরমানী, আলী আকবর দেখোদা, সাদিক হিদায়াত, দাস্তী, জামালজাদা, খলিলী, হিজাজী, বুজরুখ আলভী প্রমুখ। এঁদের মধ্যে মোহাম্মদ বাকীর খোসরুভী, শেখ মুসা নাসরী, হাসান বাদী এবং আবুল হোসাইন সান আতিজাদা কিরমানীকে ফারসী কথা-সাহিত্যের দিকপাল বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

মোহাম্মদ বাকীর খোসরুভীর উপন্যাসের মধ্যে 'শামস-ই-তোগরা', (তোগরার সূর্য), 'মারী-ই-ভিনিসী' (ভেনিসীয় মেরী) এবং 'তোখরুল-উ-হোমনে' (হোমনের তোখরুল) আধুনিক ফারসী কথা সাহিত্যের অমর অবদান। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসই ঐতিহাসিক বিষয়ভিত্তিক এবং পুনর্জাগরণের বাণীতে ব্যঞ্জনাময়। উদাহরণ স্বরূপ 'শামস-ই-তোগরা'-এর উল্লেখ করা যায়। এই উপন্যাসের কাহিনী শুরু হয়েছে মোংগল রাজন্য তোগরা-এর দেশাত্মবোধক স্পৃহা কেন্দ্র করে। শামসও ছিলেন অন্যতম মোংগল অমাত্য। তিনি তোগরার কন্যার সঙ্গে প্রেমে পড়েন এবং এই প্রেম শুধু নারী-কেন্দ্র করেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। সেই সঙ্গে দেশ-জাতির কাছে তা আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়। উপন্যাসটিকে প্রাচীন ও আধুনিক ফারসী কথা-সাহিত্যের যোগসেতু বলা চলে এবং এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসাবে স্বীকৃত। 'শামস-ই-তোগরা' প্রকাশিত হয় ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে।

শেখ মুসা নাসরীও ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার পথে বিচরণ করেছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ইশ্‌ক ওয়া সোলতানাত' (প্রেম ও সাম্রাজ্য) প্রকাশিত হয় ১৯১৯ সালে, হামাদান থেকে। এই উপন্যাসে পারস্যের ইতিহাসের ঊষালগ্নের মহান সাইরাসের বীরত্বপূর্ণ জীবনী কাহিনী-নির্ভর করে কীর্তিত হয়েছে। গ্রন্থটির ভূমিকায় লেখক নিজেই উল্লেখ করেছেনঃ 'ওয়া মাইয়ী তো আঁ গুফ্‌তে আওয়্যালীন রুমানী আস্ত কেহ্ দর ইরান বে আসলোব মাগরিব জমিনে তালিফ

শাদাহ্।' অর্থাৎ ইরানের মাটিতে পাশ্চাত্য ধরনে এটিই প্রথম উপন্যাস।

শেখ মুসার আর একটি ইতিহাস-কেন্দ্রিক তথ্য-নির্ভর উপন্যাস 'সিতারা-ই-লিদী' (লিডীয়-তারকা)। ১৯২৪-২৫ সালের মধ্যে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় এবং এর বিষয়বস্তুও অভিযান, সাহসিকতা এবং জাগরণের বাণীবাহক। এতে ক্রুসো-এর বিরুদ্ধে সাইরাসের অভিযান-কাহিনী বিবৃত হয়েছে। তাছাড়া রয়েছে সাদরীসের বন্দী সম্পর্কিত বিবরণ এবং লিডিয়াকে পারস্যের অন্তর্ভুক্তিকরণ। এই উপন্যাসটিও সাহসিকতা ও দেশাত্মবোধের জ্বলন্ত স্বাক্ষর।

'সারগুজিস্ত-ই-শাহজাদা খানম-ই-বাবুলী' (বেবীলনীয় রাজ-কুমারীর উপাখ্যান) উপন্যাসটিও শেখ মুসার সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছে। এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৩১-৩২ সালের মধ্যে। এটিও ঐতিহাসিক উপন্যাস তবে এর মধ্যে যে প্রেম তদ্‌গত তা দেশবাসীর পক্ষে আদর্শ ও দেশ-প্রেমের উল্লেখযোগ্য নজির। এই গ্রন্থের কাহিনী নির্মাণ এবং রোমান্স সৃষ্টি হয়েছে মেডিয়া ও ইরিদীর শেষ রাজকুমার হরজুমান এবং বেবীলনের শেষ রাজকুমারীর জ্বলন্ত প্রেম কেন্দ্র করে।

শেখ মুসার সমসাময়িক হাসান বাদীও একজন অমর কথাশিল্পী। তাঁর সবচেয়ে খ্যাতিমান উপন্যাস 'দাস্তান-ই-বাস্তান' (প্রাচীনকালের কথা)। এটিও ঐতিহাসিক উপন্যাস। এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯২১ সালে। শেখ মুসা যেমন তাঁর 'ইশক ওয়া সোলতানাত'কে পাশ্চাত্য ধরনের প্রথম উপন্যাস বলে ঘোষণা করেছেন তেমনি হাসান বাদীও তাঁর 'দাস্তান-ই-বাস্তান'কে প্রথম ঐতিহাসিক সার্থক উপন্যাস বলে দাবি করেছেন। বলা যায়, ফারসী সাহিত্য সমালোচক যেমন তকী জাদেহ্, আব্বাস ইকবাল, হিকমাত প্রমুখ তা স্বীকারও করে নিয়েছেন।

উপরোক্ত তিনজনের পরবর্তী ফারসী কথা-সাহিত্যে যুগান্ত সৃষ্টিকারী লেখক আবুল হোসাইন সান আতিজাদা কিরমানী। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে যেমন ঐতিহাসিক, সামাজিক, ধর্মীয়, প্রেম-বিরহ প্রভৃতিকে তাঁর উপন্যাসের উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এবং তিনি সার্থকতাও অর্জন করেছেন আশাতীতভাবে। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপ-ন্যাসের মধ্যে নাম করতে হয় 'দম গুস্তারাঁ ইয়া ইনতিকাম কাহান-

ই-মাজদাক' (মাজদাকের ফাঁদ পাতার নায়ক), 'দাস্তান-ই-মনি-ই-নাককাস' (চিত্রশিল্পী মনির উপাখ্যান), 'সালাহশূর' (যোদ্ধা), 'সিয়াহ পোশান' (কালো বর্ম), 'রোস্তম দরকারণ-ই-বিস্ত-ওয়া দাবোন' (দ্বাবিংশ শতাব্দীর রোস্তম), 'আলম-ই-আবাদী' (অনন্তকালের পৃথিবী), 'মাজমা-ই-দিবানীগাঁ' (পাগলের হাট), 'ফিরিশ্‌তা-ই-সালক-ইয়া-ফাতানা-ই-ইস্পাহান' (ইস্‌পানের শান্তির দূত), 'নাদির, ফতিহ্-ই-দিল্লী' (নাদির, দিল্লীর বিজয়কারী) ইত্যাদির। ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৫৭ সালের মধ্যে এইসব উপন্যাস প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য যে, উপন্যাসগুলোর নামকরণ থেকেই বিষয়বস্তু সম্পর্কে ইংগিত পাওয়া যায়। তবু দু'একটা সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করছি।

কিরমানীর প্রথম উপন্যাস 'দম গুস্তারাঁ ইয়া ইনতিকাম কাহান-ই-মাজদাক'-এ পারস্যের সাসানীয় সাম্রাজ্যের পতন এবং আরবদের ইরানীয় ভূখণ্ড দখলের কাহিনী রোমাণ্টিক ভঙ্গিতে বিবৃত হয়েছে। ইরান কি করে আরবদের সঙ্গে মিলে গেল তার পটভূমিও সৃষ্টি করা হয়েছে অতি নিপুণভাবে।

'দাস্তান-ই-মনি-ই-নাক্‌কাশ'-এ চিত্রিত হয়েছে একজন চিত্রশিল্পীর রোমাণ্টিক কাহিনী। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মনি তাঁর জীবন-সংগ্রামে সফলতা অর্জনের জন্য পিতাকে পরিত্যাগ করে সুদীর্ঘ ভ্রমণে বের হন এবং সুদূর চীন দেশে যান চিত্রশিল্পে জ্ঞানলাভের জন্য। সেখানে জাহিদা নাম্নী এক সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পড়েন। প্রেমে ব্যর্থ হয়ে তাঁর অধ্যবসায়ের গতি ভিন্নদিকে প্রবাহিত করে এবং শেষ পর্যন্ত তুর্কীস্তানের জেহোভা মন্দিরে গুপ্তধনের সন্ধান পান এবং এটাই তাঁর জীবনের চরম সাফল্য। এবং এ উপন্যাসটিও সার্থকতার নামান্তর।

'সিয়াহ্ পোশন' উপন্যাসে কীর্তিত হয়েছে এক বীরের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী। এই জাতীয় বীর অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে লড়ে পারস্যের উন্নতিসাধনে এক উল্লেখযোগ্য নজীর স্থাপন করেন।

তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস 'চাগুনা মুমকিন আস্ত মুতুমাভিল শুদ' (কি করে ধনী হওয়া যায়)। এই উপন্যাসটিতে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে অতিমাত্রায় এবং কিরমানির দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তি আসল ধনী যাঁর মন আছে—মনের মানুষই আসল মানুষ।

উপরোক্ত চারজন কথাসাহিত্যের দিকপাল ছাড়া আরও অনেক ঔপন্যাসিক রয়েছেন যাঁদের প্রকাশিত একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। আমরা এখানে মাত্র কয়েকজন ঔপন্যাসিক, তাঁদের প্রকাশিত গ্রন্থ এবং প্রকাশকাল উল্লেখ করছি। যেমন জাবিহ বিহ্রুজ-এর 'শাহ-ই-ইরান ওয়া বানু-ই-আরমাঁ' (তেহরান, ১৩০৬ হিঃ), জাবাদ ফাজিল-এর 'লারিজাঁ ইশ্‌ক ওয়া খুন' (১৩২৯ হিঃ তেহরান), হায়দার আলী কামালীর 'মাজালিম-ই-তুরকাঁ খাতুন' (১৩০৭ হিঃ তেহরান) এবং 'আফসানা-ই-তারিখ-ই-লাজিকা' (১৩০৯ হিঃ তেহরান), মোহাম্মদ আলী খলিলীর 'দোখতার-ই-কুরুশ' (১৩২০ হিঃ তেহরান), 'নিগারিস্তান-ই-খুন ইয়া কিয়াম-ই-খোরাসান' (১৩২১ হিঃ তেহরান) এবং 'বাহারাম-ই-ঘোর' (১৩২৫ হিঃ তেহরান), মোহাম্মদ তকী কুরদানীর 'দালিরাঁ-ই-খারাজম' (১৩২৭ হিঃ মেশদ), ইবরাহীম মোদারিসীর 'পাঞ্জা-ই-খুনীন' (তেহরান), 'পায়েক-ই-আজল' (তেহরান) এবং 'আরুস-ই-মাদাইন' (তেহরান) জয়নুল আবেদীন মুতামিনের 'আশিয়ানা-ই-উকাব' (৬ খণ্ড, তেহরান), সাঈদ নাফিসীর 'আখারিন ইয়াদিগার-ই-নাদির' (১৩০৫ হিঃ তেহরান), নাসির নাজমীর 'দাস্তান্‌হা-ই-তারিখী' (১৩২৭ হিঃ তেহরান), নুসরাতুল্লাহ্‌ শাদলু-এর 'আজম ওয়া ইশ্‌ক' (১৩০৬ হিঃ তেহরান) ইত্যাদি এবং আরও অনেক।

আধুনিক সংজ্ঞা ও দৃষ্টিভঙ্গীসঞ্জাত ছোট গল্পের আমদানী প্রথমতঃ অনুবাদের মাধ্যমে ঘটে। ইংরেজী, ফরাসী, জার্মানী, রুশ প্রভৃতি ভাষা থেকে প্রথমশ্রেণীর গল্পসমূহ অনুবাদের দুরূহ কাজ সম্পাদন করেন সাঈদ নাফিসী, পায়েন্দা, শাহরজাদ, ফারজাদ, হিকমাত, গানী, ইতিসামী প্রমুখ সাহিত্যিকবৃন্দ। এঁদের অনূদিত গল্পসমূহ প্রকাশে সবচেয়ে বেশী উদ্যোগ গ্রহণ করে সাহিত্য পত্রিকা 'বাহার'। উল্লেখ্য যে, প্রথমতঃ তাঁরা পাশ্চাত্যের অনুসারী হলেও অল্প সময়ের মধ্যে তাঁরা স্বকীয়তায় ফিরে আসেন এবং মূল রচনায় আত্মনিয়োগ করেন।

'দাস্তান-ই-কুতুহ' বা ছোটগল্পের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মোহম্মদ আলী জামালজাদাকে দাঁড় করানো যায়। কেননা, তাঁর আগে মূল ফারসী গল্পকার হিসেবে এমন সার্থকতা আর কেউ অর্জন

করতে পারেননি। তাঁর প্রথম গল্প সংকলন 'ইয়াকি বোদ ওয়া ইয়াকি নাবোদ' (একদা এক সময়ে) ১৯৩৭ সালে বার্লিন থেকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে এগারটি গল্প ছাড়াও রয়েছে একটি সুদীর্ঘ ভূমিকা। ভূমিকায় তিনি ছোট গল্পের সংজ্ঞা, স্টাইল, ফর্ম এবং বিদেশী গল্প বিশেষতঃ ইউরোপীয় ধারার গল্প সমূহের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তাছাড়া প্রত্যেকটি গল্পের বিষয়-বস্তুতে রয়েছে জাতীয় জীবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সমষ্টি-গত চিত্র। 'ইয়াকি বোদ ওয়া ইয়াকি নাবোদ' গল্প গ্রন্থের অন্যতম গল্প 'ফারসী শিকর আস্ত' (ফারসীই চিনি) খুবই সার্থক রচনা। এতে একজন নিরীহ ইরানী ও দুইজন দুষ্ট প্রকৃতির ইউরোপীয় ধারায় শিক্ষিত নব্য যুবকের কাহিনী আশ্রয় লাভ করেছে।

জামালজাদার বড় গল্পধর্মী উপন্যাস 'কুলতাশান-ই-দেবান' (১৯৪৬ খ্রীঃ)-ও ফারসী কথা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এতে যুগ যুগ ব্যাপী ন্যায়-অন্যায়ের দ্বন্দ্ব কীর্তিত হয়েছে। তাঁর পরবর্তী এবং সবচেয়ে প্রশংসিত খণ্ড উপন্যাস 'রা আব নামা' (নর্দমার কথা) প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে। গ্রন্থটির বর্ণনায় এবং বিষয়বস্তুর ভঙ্গীতে 'সূলতাশান-ই-দেবান'-এর কিছুটা মিল থাকলেও 'রা-আব নামা' স্বমহিমায় উজ্জ্বল। কেননা ইরানের ছয়টি পরিবারের কর্তৃত্ববিধানে যে জলাশয় ছিল—ইরানে খাল খননকালে যখন পানি বন্ধ হয়ে যায়—তখন সেই ছয় পরিবার এক ফোটা পানিও বাইরে দিতে রাজী হয়নি। এই বিষয়ই তিনি কাহিনীর মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছেন।

অনুরূপ ভাবে 'সার ওয়া তাহ্-ই-ইয়াক কারবুস' (বৈশিষ্ট্যের সকল দিক)-ও জামালজাদার সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছে। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। অনেকে মনে করেন এই গ্রন্থে জামালজাদা তাঁর আত্মজীবনীই গল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। কেননা এতে যে 'মুরশিদ' (ধর্ম গুরু) এবং 'আখুন্দ' (ইমাম) প্রভৃতির দ্বন্দ্ব কীর্তিত হয়েছে তা তাঁর নিজের জীবনেরই অভিব্যক্তি। ভণ্ড 'আখুন্দ'দের প্রতি ছিল তাঁর ভীষণ অনীহা।

উপরোক্ত গল্প সংকলন এবং খণ্ড উপন্যাস ছাড়াও তাঁর অন্যান্য গল্প সংকলন যেমন 'সারগুজিস্তা-ই-আমু হোসাইন আলী' (হোসাইন আলী

চাচার কাহিনী, ১৯৪২), 'তালক ওয়া শিরীন' (টক ও মিষ্টি, ১৯৫৬), 'কোহনা ওয়া নও' (পুরাতন এবং নতুন, ১৯৫৯) এবং 'গায়ের আজ খোদা হিকাস না বোদ' (খোদা ছাড়া কেউ নেই, ১৯৬০) ফারসী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

জামালজাদার রচনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর ভাষা সহজ, সরল এবং সাবলীল। তাছাড়া প্রকাশের নৈপুণ্যে তাঁর রচনাকে আরও মহিমান্বিত করেছে। তদুপরি ইরানের আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারে রচনাকে আরও আকৃষ্ট করেছেন বলে সমলোচকদের ধারণা। এ কারণেই জামালজাদা দেশে এবং বিদেশে বহু আলোচিত কথা-শিল্পী। জার্মানী, ইংরেজী রুশ ও ফরাসী ভাষায় তাঁর বহু ছোট গল্প অনূদিতও হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, তাঁর 'ইয়াকি বোদ ওয়া ইয়াকি নাবোদ' গল্প গ্রন্থের অন্যতম গল্প 'দরদ ই-দিল-ই-মোল্লা কোরবান আলী' যখন ইংরেজীতে অনূদিত হয়ে ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসে দিল্লীর 'আহাংগ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তখন আলোড়নের সৃষ্টি হয়।

শুধু কথাশিল্পী হিসেবে নয় সাহিত্য সমালোচক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি সুবিদিত। সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত মোহাম্মদ ইসহাকের 'সুখানবারান-ই-ইরান দর আসর-ই-হাজির' (বর্তমান পারস্যের কবি ও কবিতা) গ্রন্থে জামালজাদাকে কবি বলেও চিহ্নিত করা হয়েছে। কেননা তাঁর সাহিত্যজীবন শুরু হয় কবিতার মাধ্যমে।

মোহাম্মদ আলী জামালজাদার পরই নাম করতে হয় প্রখ্যাত গল্পকার সাদিক হিদায়াতের। দুঃখের বিষয় সাদিক হিদায়াত অল্প বয়সেই ১৯৫৩ সালে মসেকার একটি হোটেল কক্ষে আত্মহত্যা করেন। কিন্তু অল্প জীবনকালের মধ্যেই উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, সমালোচনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তিনি এমন অবদান রেখেছেন যা ফারসী সাহিত্যে রীতিমতো গর্বের বস্তু। মাত্র আটচল্লিশ বছর তিনি জীবিত ছিলেন এবং এই জীবনকালে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা তিষট্টিটি।

সাদিক হিদায়াতের উল্লেখযোগ্য গল্প সংকলনের মধ্যে 'জিন্দা বে-গোর' (জীবন্ত সমাধি), 'আব-ই-জেন্দেগী' (জীবনের রস), 'সে কাতরে খুন' (তিন ফোটা রক্ত), 'ছায়া রুশন' (কালো রং),

'আলভিয়া খাতুন' (শ্রীমতী আলভিয়া), 'ভগ ভগ সাহাব' (জনাব ভগ ভগ), 'বোফ-ই কোর' (অন্ধ পেচক), 'সাগ-ই-ভিল গারদ' (রাস্তার কুকুর), 'ফারদা' (আগামী কল্য) ইত্যাদি প্রধান।

উপরোক্ত গল্প সংকলনের মধ্যে 'সে কাতবে খুন', 'ছায়া রুশন', 'বোফ-ই-কোর' এবং 'সাগ-ই-ভিল গারদ' পৃথিবীর কয়েকটি আন্তর্জাতিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর প্রত্যেকটি গল্প সংকলনই সমাজের বিভিন্ন দিকের প্রতি ইংগিতবাহক। উদাহরণ স্বরূপ 'বোফ-ই-কোর'র উল্লেখ করা যায়। বোফ-ই-কোরের প্রথম গল্প 'বোফ-ই-কোর' লোক-কাহিনীভিত্তিক এবং একটি পেচককে প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। ইরানীয় লোক-কথায় পেচক অশুভ ইংগিত বাহক। শুধু ইরান নয় আরবী লেখক দামিরীর 'হায়াতুল হায়ান' (পশুর জীবনী) গ্রন্থেও বলা হয়েছে যে, আরবদের উপকথায় যদি কোন লোক মারা যায় কিংবা নিহত হয় তবে সে স্বপ্নে দেখে যে পেচক তার কবরের উপর বসে তার মৃত্যুর জন্য শোক করে। ফারসী গ্রন্থ 'তারিখ-ই-ইবন-ই-নাজ্জার'-এ উল্লেখিত আছে, খসরু আদেশ করলেন একটি অশুভ-সংবাদবাহী পাখী আনতে এবং তখন আনা হয়েছিল একটি পেচক। এবং এই বিষয়বস্তুই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আশ্রয় লাভ করেছে 'বোফ-ই-কোর' গল্পে। গল্পের প্রথম লাইনের শুরু এইভাবে, 'যে ক্ষত ক্যান্সারের মতো হৃদ্‌পিণ্ড কুরে খায়, সে তো পেচকের মতোই অন্ধকারে বসে থাকে।' এই মতবাদই সারা গল্পে বিস্তার লাভ করেছে এবং সমাজের ক্যান্সার দূরীকরণেই তিনি তৎপর ছিলেন। তবে একটা প্রশ্ন তিনি রেখেছেন: ক্যান্সারের ঔষধ কি আবিষ্কৃত হয়েছে?

সাদিক হিদায়াতের পরই নাম করতে হয় বুজরুগ আলভীর। ১৯০৭ সালে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯২২ সালে তিনি জার্মানী থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করেন। দেশে ফিরে এসে তিনি মার্কস্‌বাদী রাজনৈতিক দলে যোগদান করেন এবং রাজনৈতিক মতানৈক্যের জন্য তাঁকে কারাবরণও করতে হয়। সাহিত্য ছাড়া বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজেও তাঁর অবদান রয়েছে। ১৯৫৩ সালে তিনি 'বিশ্বশান্তি কাউন্সিল' প্রদত্ত স্বর্ণপদক পাওয়ার গৌরবও অর্জন করেন।

ফারসী কথা সাহিত্যে বুজরুখ আলভী একটি পরিচিত নাম। তাঁর ছোট গল্প সংকলনের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'চামদান' (স্যুটকেস), 'ভরখ পরিহা-ই-জিন্দান' (জেলের চোষ কাগজ), 'নামাহা' (চিঠি-পত্র) ইত্যাদি। এসব ছাড়াও তাঁর জেল-জীবনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন 'পাঞ্জা ওয়া সা নফর' (তিপ্পান্নজন ব্যক্তি) এবং বড় গল্প বা ছোট উপন্যাস 'চশমায়াশ' (তাঁর চোখ) গ্রন্থ দুটিও উল্লেখের দাবি রাখে।

'চামদান' প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ সালে এবং এতে ছয়টি গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রত্যেকটি গল্পই উচ্চমানের তবে 'আরুস-ই-হাজার দামান্দ' (হাজার স্বামীর স্ত্রী) গল্পটিকে অনেকেই শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন করেছেন। এই গল্পের পটভূমি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে সাম্প্রতিক কালের ইরানের একটি নাইট-ক্লাব। গল্পের নায়িকা সুসান গান-সহকারে পিয়ানো বাজাচ্ছে এবং তাকে কেন্দ্র করেই হাজার স্বামীর আনাগোনা।

আলভীর চিন্তার প্রসারতা, বাচনভঙ্গী এবং স্টাইল লক্ষ্য করার মতো। তাছাড়া গল্পের চিত্র-চিত্রণে তাঁর ক্ষমতা অপরিসীম। ১৯৪১ সালে প্রকাশিত 'ভরখ পরিহা-ই-জিন্দান' গল্পসংকলনের শেষ গল্প 'রক্স-ই-মরগ' (মৃতের নাচ)-থেকে কিছু অংশের অনুবাদ পেশ করছি। এতে বোঝা যাবে আলভী কতটা শক্তিধর গল্পকার ঃ

ঢং ঢং করে বারোটা বাজলো। এখন থেকে ভোর না হওয়া পর্যন্ত মৃতেরা স্বাধীন···স্বাধীন ··স্বাধীন।

মধ্যরাত্রি!

কী ভয়ঙ্কর রাত!

প্রত্যেকটা রাতই ভয়ঙ্কর। কারণ আমাদের জীবনই তো ভয়ঙ্কর! ভয়ঙ্করেরা কি হৃদয় বিনময় করতে পারে! মৃতদের তো হৃদয় নেই।

আমরা কিন্তু সে রকম নই; কিন্তু মৃত ব্যক্তিরা তো তাই।

মধ্যরাত্রি থেকে মোরগ-ডাকা সময় পর্যন্ত মৃতেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মরণশীল জীবন থেকে স্বাধীনতা ও মুক্তি উৎসব করে।

সবাই সমান।

এখানে কেউ রাজা নয় কিম্বা ভিক্ষুক। না বৃদ্ধ না যুবক। না ছেলে না মেয়ে। না পুরুষ না রমণী। সবাই মৃত। সবাই কঙ্কাল।

কারো মাথায় পালকের মুকুট নেই, কারো পিঠে ছালা নেই। হাত ধরাধরি করে তারা নাচে।

মৃত্যু সবার কাছেই সমান, তাদের জীবনের অঙ্গ—মৃত্যুই কঙ্কাল নাচায়।

মৃত্যু, চামড়ার হারের মতো এককালে যুবতী মেয়েদের পা ছিল। আর ঘন হার যুক্ত মাথার খুলিতে ছিল ঢোল-সদৃশ।

রাত বারোটা বাজতেই কঙ্কালরা কবর থেকে পা ফেলে চলে আসে। নাচে।

যেহেতু তারা নিজেরাই মৃত্যু সেহেতু এখানে কোনো সেনানায়ক নেই অথবা নেই সৈন্য। সবাই নীরব গায়ক।

মৃতের দল হাত ধরাধরি করে নাচে আর নাচে।

যার মুখের চোয়াল কদাকার সে তার জীবিতকালে ছিল বিচারক। অবজ্ঞাতদের বিচার সে করে নি। সে এখন নব মৃত। এই চিহ্নও খুব শীগ্‌গীর চলে যাবে। মুখ ও গালের কোনো নমুনাই আর থাকবে না। কেননা এখন সে মৃত এবং স্বাধীন।

যার মেরুদণ্ড বাঁকা সে সুন্দর জীবনের জন্য কখনো পিঠ খাটায় নি এবং সে কখনো নত হয় নি। অন্যের দুঃখ বোঝে নি। এসবও থাকবে না।

এখানে কোনো হাসি নেই। কান্না নেই। সুখ নেই। দুঃখ নেই। আশা নেই। নিরাশা নেই। সম্মান নেই। অপমান নেই। ক্ষুধা নেই। আহার নেই।

এখানে কিছুই নেই। কেবল মৃত্যু। কেবল স্বাধীনতা।
যে বিচারক সুবিচার করে না তার চেয়ে কি মৃত্যু ভালো নয়?
যে শিরদাঁড়া অকাজে থেকেছে তার চেয়ে কি মৃত্যু ভালো নয়?
মানবতা যেখানে শৃংখলাবদ্ধ সেখানে কি মৃত্যু ভালো নয়?
এ জন্যই বিদ্রোহ।
তারা নাচে। কারণ তারা মুক্ত, স্বাধীন।
মৃত্যু, মৃতের নাচ নাচায়।
হায় কপাল! এ স্বাধীনতাও সীমিত।
ভোর না হতেই মোরগ ডাকে।
সমস্ত মৃত লাশ ও কঙ্কাল বিদায় নেয়।

বাড়ী ভাড়ার সমস্যা এ জনবহুল বিশ্বে এক চরম সমস্যা। এই সমস্যাও রেহাই পায় নি আলভীর শক্ত হাত থেকে। ১৯৫২ সালে প্রকাশিত তাঁর 'নামা-হা' গল্প সংকলনের অন্যতম গল্প 'ইজারা-ই-খানা' (বাড়ী-ভাড়া) একটি সমস্যাবহুল বিষয়ের সমাধানে নিয়োজিত। ছাদ ভেঙে একটি গরীব পরিবারের মৃত্যু কেন্দ্র করেই এই গল্প রচিত।

বুজরুখ আলভী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গল্পকার। তাঁর বহু গল্প ইংরেজী, ফরাসী, রুশ, জার্মানী ইত্যাদি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ—'চশমায়াশ' গ্রন্থটির নাম করা যায়। ১৯৫৯ সালে বার্লিন থেকে এর একটি জার্মান অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদের দুরূহ কাজটি সম্পাদন করেছেন হার্বার্ট মেলজিগ। আলভী বহু ভাষাবিদ। বিদেশী উৎকৃষ্ট অনেক রচনা তিনি ফারসীতেও অনুবাদ করেছেন।

জামালজাদা, হিদায়াত এবং আলভীর পরবর্তী দলভুক্ত গল্পকার-গণ অনেকেই গত চল্লিশ দশক থেকে লেখা শুরু করেছেন এবং বর্তমানেও অব্যাহত গতিতে লিখে চলেছেন। এই দলভুক্ত লেখকদের মধ্যে রয়েছেন জালাল আলা-ই-আহমদ, সাদিক চোবক, বিহ্ আজিন, তকী মোদররিস্, আলী মোহাম্মদ আফগানী, নুর আল্লাহ্ নূরী, আরভানকী কিরমানী, হাদী শরীফিয়ান এবং আরও অনেকে। এঁদের রচনার প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ সমাজের দুর্নীতি, রাজনৈতিক অবক্ষয়, প্রেম-বিরহ জনিত নানা সমস্যা এবং ধর্মীয় গোঁড়ামি সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনা। তাছাড়া তাঁদের রচনারীতির বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করবার মতো। রচনার স্টাইল, ফরম, প্রকাশভঙ্গী ইত্যাদিতেও রয়েছে নতুনত্ব এবং ছোটগল্পের বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞায় সেসব উত্তীর্ণ বলা চলে।

জালাল আলা-ই আহমদ তাঁর নিজস্ব স্টাইলের জন্য ফারসী কথা-সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। ১৯৪৫ সালে 'সুখান' সাহিত্য পত্রিকায় যখন তাঁর 'জিয়ারত' (তীর্থযাত্রা) গল্পটি

প্রকাশিত হয় তখনই তা সুধী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং উচ্চ প্রশংসিত হয়। তাঁর কয়েক বছর পরেই তাঁর গল্প সংকলন 'দিদ ওয়া বাজদিদ' (দৃষ্টির বিনিময়) প্রকাশিত হয়। এই সংকলনের অধিকাংশ গল্পেই তিনি গ্রামীণ জীবন তথা সংস্কারবদ্ধ ধারণা কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের জীবন-চিত্র অঙ্কন করেছেন। 'দিদ ওয়া বাজদিদের' অল্পকাল পরেই পর পর প্রকাশিত হয় আরও কয়েকটি গল্প সংকলন। এ সবের মধ্যে ১৯৪৭ সালে 'আজ রঞ্জিকা মি বারিম' (আমাদের যন্ত্রণা থেকে), ১৯৪৮ সালে 'সিতার', ১৯৫২ সালে 'জানানা-ই-জিয়াদী' (অশালীন রমণী), ১৯৫৪ সালে 'সারগুজিস্ত-ই কানদোহা' (মৌচাকের গল্প) প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। এসব ছাড়াও বড় গল্পধর্মী তাঁর আরও দুটি ছোট উপন্যাস ফারসী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত। একটি 'মুদির-ই-মাদ্রাসা' (প্রধান শিক্ষক) প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে এবং অপরটি 'নুন ওয়াল কালাম' (নুন এবং কলম) প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালে। এ দুটো উপন্যাসেই তিনি সমাজের নির্যাতিত দিকের প্রতি আলোকপাত করেছেন। 'মুদির-ই-মাদ্রাসা' গ্রন্থে শিক্ষার গলদ এবং মাস্টারদের অশিক্ষাজনিত কুফলের ব্যাখ্যা করেছেন। এসব ছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য কিছু অনুবাদ কর্মও রয়েছে।

১৯১৬ সালে সাদিক চোবক বুশিহির শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৭ সালে তেহরানের আমেরিকান কলেজ থেকে ডিগ্রী লাভ করে একটি তৈল কোম্পানীতে চাকরি গ্রহণ করেন। চোবক সাদিক হিদায়াতের বন্ধু। হিদায়াত তাঁকে উৎসাহিত করেছেন অতিমাত্রায়—তাই বলে চোবক হিদায়াতের অনুসারী নন। তরুণ লেখকদের মধ্যে চোবকই একমাত্র লেখক যাঁর মৌলিক রচনা সবারই প্রশংসা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। ছোটগল্পের ফর্ম সম্পর্কে চোবক অত্যন্ত সজাগ এবং তাঁর গল্প আমেরিকান ছোটগল্পকার হেমিংওয়ে, ফকনার এবং হেনরী জেমসের সাথে তুলনীয় হতে পারে।

১৯৪৫ সালে চোবকের প্রথম গল্প সংকলন 'খেয়ামী শাহবাজী' (পুতুল খেলা) প্রকাশিত হয়। এবং তাঁর পাঁচ বছর পর অর্থাৎ ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় গল্প সংকলন 'আনতার-ই-কা লুতিয়াশ মর্দাবাদ' (যে শিল্পাঞ্জীর ভাঁড় মারা গেছে)।

চোবকের রচনার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর লেখা পড়লে একান্ত মৌলিক বলে মনে হয়—কারো অনুকরণ বা অনুসরণ লক্ষণ তার মধ্যে অনুপস্থিত। তাছাড়া তাঁর গাঁথুনী এতই শক্ত যে, কোথাও হাল্কাভাব কিংবা পতন আছে বলে মনে হয় না। 'খেয়ামী শাহবাজী' গ্রন্থের 'নফতী' (কেরোসিন বিক্রেতা), 'জির-ই-চিরাগ-ই-কিরমিজ' (লাল বাতির নীচে), 'মরদ-ই-দর কাসাস' (খাঁচার মানুষ) প্রভৃতি গল্পে তাঁর শক্তিমত্তার পরিচয় সুস্পষ্ট।

সুদীর্ঘ দশ বছর পর চোবকের আরও দুটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি অনুবাদ এবং অপরটি 'আহ্-ই-ইনসান' (মানুষের দুঃখ)। চোবকের সাম্প্রতিক কালের গল্প সংকলন 'রোজ-ই-আওয়্যাল-ই-কবর' (কবরের প্রথম দিবস)-এ পনেরোটি ছোট গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং প্রত্যেকটি গল্পই সার্থক রচনার স্বাক্ষর। নতুন নতুন বিষয়বস্তু এবং নতুন নতুন চিন্তা-ভাবনা তাঁর রচনায় আশ্রয় লাভ করে জীবন্ত হয়ে আছে।

মোহাম্মদ ইয়াতিমাজাদা, কথা-সাহিত্য জগতে যিনি 'বিহ্ আজিন' নামে পরিচিত—আধুনিক ফারসী কথাশিল্পে তাঁর নাম বহু উচ্চারিত। ১৯৫১ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দোখ্তার-ই-রায়াত' (প্রজার মেয়ে) খুব প্রশংসা কুড়াতে সমর্থ হয়। তাছাড়া ১৯৫৪-৫৫ সালে প্রকাশিত 'পরাকান্দা' (বিক্ষিপ্ত টুকরো), ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত 'বি-সুআ-ই-মারদুম' (মানুষের দিকে) এবং ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত 'নকশা-ই-পরন্দ' (সিল্ক-ডিজাইন) গল্প সংকলনসমূহ ফারসী কথা সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। নিপুণ শিল্পী হিসেবে বিহ্ আজিন খ্যাত।

অনুরূপভাবে ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত তকী মুদার্‌রিসের গল্প সংকলন 'ইয়াকোলিয়া ওয়া তানহা-ই-আয়্' (রূপসী ইয়াকোলিয়া এবং নির্জনতা), ১৯৭১ সাল প্রকাশিত আলী মোহাম্মদ আফগানীর বড় গল্পধর্মী উপন্যাস 'সহর-ই-আহু খানম' (আহু খানমের স্বামী) খুবই উল্লেখযোগ্য।

৩. প্রবন্ধ-গবেষণা-নাটক-ভ্রমণ-কাহিনী

ইতিপূর্বের 'কাব্য-শাখা' ও 'কথাসাহিত্য' শীর্ষক আলোচনায় যে সব কবি এবং কথাশিল্পীদের সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করা হয়েছে তাঁদের অনেকেই কবিতা ও কথা-সাহিত্যের পাশাপাশি প্রবন্ধ-গবেষণা, নাটক ও ভ্রমণ-কাহিনীধর্মী রচনায়ও আত্মনিয়োগ করেছেন এবং এ সম্পর্কে কিছু কিছু উল্লেখও করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রথমতঃ তাঁদের সাহিত্য—কর্ম প্রকাশ এবং প্রচারের মাধ্যম ছিল পত্র-পত্রিকা। কেননা যে কোনো দেশের সাহিত্যের উন্নতির মূলে পত্র-পত্রিকার ভূমিকা অনস্বীকার্য এবং পত্র-পত্রিকা সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে।

আধুনিক ফারসী সাহিত্যে কিছু সংখ্যক রচনার সন্ধান পাওয়া যায় যেসবে প্রবন্ধ-গল্প উভয়ের স্বাদ পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে মুর্তাজা মুশফিক কাজিমীর ১৯২২ সালে প্রকাশিত 'তিহরান-ই-মাকুফ' (ভয়ঙ্কর তেহরান), আহম্মদ আলী খোদাদাদ-এর ১৯২৬ সালে প্রকাশিত 'রোজ-সিয়াহ-ই-কারগর' (শ্রমিকদের কালো ভাগ্য) এবং ১৯২৭ সালে প্রকাশিত 'রোজ-ই-সিয়াহ-ই-রায়াত' (কৃষকদের কালো ভাগ্য), আব্বাস খলিলীর ১৯৩১ সালে প্রকাশিত 'রোজিগার-ই-সিয়াহ' (কালো দিন) এবং 'রাশাহাত-ই-কালাম' (কলমের খোঁচা) এবং রাবী আনসারীর 'ফরোশাঁ-ই-কারন-বিস্তুম' (বিশ শতাব্দীর মানুষ চালক) ও 'সিজদা-ই-নওরোজ' (বছরের তেরো দিন) ইত্যাদি। এই সব গ্রন্থে নারী-প্রগতি, নারী-স্বাধীনতা, নারীর অধিকার, কৃষক ও শ্রমিকদের সমস্যা, ইরানের প্রাচীন উপজাতি প্রভৃতি বিষয়ে রসাত্মক আলোচনা আছে। এমনকি রাজনৈতিক এবং সামাজিক দিকের প্রতিও আলোকপাত করা হয়েছে। লেখকদের প্রকাশনৈপুণ্যে এসবের মধ্যে প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস এবং ভ্রমণ-কাহিনী সব কিছুর সংমিশ্রণ-স্বাদ পাওয়া যায়।

সাহিত্য-বিষয়ক গবেষণায় আলী দাস্তীর 'নাকশী আজ হাফিজ' (হাফিজের চিত্র), 'সায়ের-ই-দর দিবান-ই-শামস' (শামসের কাব্য জগতে ভ্রমণ), 'কালামরু-ই-সাদী' (সাদীর অনুভূতি), 'শায়ের-ই-দির-আশনা' (কবিকে চেনা কঠিন) ইত্যাদি খুবই মূল্যবান গ্রন্থ।

দাস্তীর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি সব কিছু খুঁটে বের করেছে। তাছাড়া শামস-ই-তাব্রিজ, সাদী, হাফিজ প্রমুখ সূফী কবিদের আলোচনার সঙ্গে তুলনামূলক ভাবে অন্যান্য প্রাচীন কবিদের আলোচনাও তিনি করেছেন।

দাস্তীর মতো মোহাম্মদ হিজাজী কবিতা, ছোট গল্প ও উপন্যাস ছাড়াও প্রবন্ধ ও গবেষণায়ও উল্লেখযোগ্য অবদান সংযোগ করেছেন। হিজাজীর 'আয়না' গ্রন্থটি সবকিছুর সমন্বয় বলা চলে। কেননা এতে সমাজের বিভিন্ন দিকের প্রতি ইংগিতবাহী কয়েকটি মননশীল প্রবন্ধ ছাড়া কিছু উপদেশধর্মী ছোট গল্পও রয়েছে। তাছাড়া তাঁর 'কামালুল মূলক', 'তেলিগ্রাফ-ই-বিসিম', 'খোলাসা-ই-তারিখ-ই-ইরান' প্রভৃতি গবেষণা-সমৃদ্ধ ফসল।

বর্তমান বিশ্বে লোক-সাহিত্য গবেষণায় সবদেশের পণ্ডিতরাই এগিয়ে এসেছেন। ইরানও এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম নয়। প্রাচীন সংস্কার, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ ইত্যাদি সম্বলিত কবি আলী আকবর দেখোদার 'আমসাল-উল হিকাম' গ্রন্থের উল্লেখ ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। লোক-সাহিত্য গবেষণায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন সাদিক হিদায়াত এবং তাঁকে লোক-সাহিত্য গবেষণার পথ-প্রদর্শক বলা চলে। লোক-সাহিত্যের গুরুত্ব, ইরানের সর্বত্র প্রচলিত লোক-সঙ্গীত ইত্যাদি সম্পর্কিত তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'উসানা' প্রকাশিত হয় ১৯৩১ সালে। অল্পদিনের মধ্যেই গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যায় এবং পরে তিনি দীর্ঘদিন অন্যান্য সাহিত্য-কর্মের সঙ্গে লোক-সাহিত্য গবেষণাও পরিচালনা করেন। ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ 'নিভিস্তা-হা-ই-পরাকান্দা-ই-সাদিক হিদায়াত' (সাদিক হিদায়াতের বিবিধ রচনা)। উল্লেখ্য যে এই গ্রন্থের মধ্যেও 'উসানা' গ্রন্থটি সন্নিবেশিত হয়েছে।

সাদিক হিদায়াতের লোক-সাহিত্য গবেষণার শ্রেষ্ঠ ফসল 'নায়া-রিংগিস্তান' এবং এই গ্রন্থে প্রাচীন বিশ্বাস, লোক-কাহিনী, গাঁথা, লোক-সঙ্গীত, ছড়া, ধাঁধা ইত্যাদি বিষয়ক গবেষণাধর্মী আলোচনা আছে। গ্রন্থটি বহু আলোচিত এবং উচ্চ প্রশংসিত। প্রখ্যাত ফরাসী লোকবিজ্ঞানী অধ্যাপক হেনরী মাসে এই গ্রন্থের জন্য হিদায়াতকে অনন্য প্রতিভা বলে চিহ্নিত করেছেন। তাছাড়া লোক-কাহিনীভিত্তিক উপন্যাস ও নাটক

রচনায়ও হিদায়াতের খ্যাতি সুবিদিত। এ প্রসঙ্গে 'মাজিয়ার', 'আতশ পরস্ত', 'আখারিন লবখন্দ' (শেষ হাসি) ইত্যাদির নাম করা যায়। 'মাজিয়ার' গ্রন্থটি পরবর্তী সময়ে তাঁর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্থানসমূহে ভ্রমণ কেন্দ্রিক 'ইসপাহান নিস্‌ফ-ই-জাহান' (ইসপাহান, বিশ্বের অর্ধেক) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভ্রমণ কাহিনী সংক্রান্ত হিদায়াতের আর একটি গ্রন্থ 'রো-ই-বাদা-ই-নামাক্' (ভিজে রাস্তায় বিচরণ)।

সাদিক হিদায়াতের অন্যান্য প্রবন্ধ পুস্তক ও গবেষণা-গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'রুবাইয়্যাত-ই-হাকিম উমর খৈয়্যাম' (১৯২৩ খ্রীঃ প্রকাশিত), 'ইনসান ওয়া হায়ান' (মানুষ ও পশু, ১৯২৩), 'ফাওয়াইদ-ই-গিয়া খারী' (শাকসবিজর তত্ত্বকথা, ১৯৫৭), হিকায়াত-ই-বানাতিজা' (উপদেশধর্মী কাহিনী, ১৯৩২), 'তারানা-হা-ই-খৈয়্যাম' (খৈয়্যামের সুর, ১৯৩৪), 'দাস্তান-ই-নাজ' (নাজের গল্প, ১৯৪১), 'পায়াম-ই-কাফকা' (কাফকা-বার্তা) ইত্যাদি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশক থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত সাহিত্য, সংস্কৃতি, লোক-ঐতিহ্য, শিল্প-চিত্র-কলা, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে এতসব গবেষণা-সমৃদ্ধ কাজ হয়েছে যে, স্বল্পপরিসর নিবন্ধে সবার সম্পর্কে আলাদা করে বলা সম্ভব নয়। সংক্ষেপে বলা যায়, যাঁরা কবি-সাহিত্যিক, নাট্যকার, গবেষক তাঁরা সাহিত্যের সবক্ষেত্রেই বিচরণ করেছেন। কাজেই একই সাহিত্যিককে কবি, গবেষক, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ও গল্পকার সব আখ্যায়ই আখ্যায়িত করা যায় এবং এরূপ নজীর ইতিপূর্বের আলোচনায় বহুজনের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়েছে। যাহোক, সাহিত্য সম্পর্কিত গবেষণায় সাম্প্রতিককালে যেসব গ্রন্থ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে সেসবের মধ্যে রয়েছে মুহাম্মদ ইসহাকের 'সুখানাওয়াবিঁন-ই-ইরান দর আসর-ই-হাজির' (আধুনিক ইরানের কবি ও কবিতা)। গ্রন্থটির প্রথম দুই খণ্ড ১৯৩৫ – ৩৭ সালে দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয় এবং তৃতীয় খণ্ড আরও ব্যাপক আলোচনা সমৃদ্ধ হয়ে ১৯৩৪ সালে কলকতা থেকে প্রকাশিত হয়।

১৯৪৭ সালে তেহরান থেকে প্রকাশিত রাশীদ ইয়াসামীর 'আদাবিয়্যাত-ই-মু'আসির' (সাম্প্রতিক সাহিত্য) একটি যুগান্ত সৃষ্টিকারী কর্ম। এই গ্রন্থে কবিতা, ছোট গল্প, উপন্যাস ইত্যাদির বিবর্তন স্টাইল, ফর্ম ও সংজ্ঞার তুলনামূলক আলোচনা স্থান পেয়েছে। প্রায়

একই ধরনের আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ দীনশাহ জে. ইরানীর 'নুখুস্তিন কোংগরা–ই-নিওয়িসীনদিগান-ই-ইরান' (ইরানীয় সাহিত্যিক-দের প্রথম কংগ্রেস)। ১৯৫৭ সালে তেহরান থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত মুহাম্মদ সদর হাশমীর 'তারিখ-ই-জারায়ীদ ওয়া মাজালাত-ই-ইরান' (প্রেস ও সংবাদ-পত্রের ইতিহাস) গ্রন্থটির নাম করা যেতে পারে। চার খণ্ডে সমাপ্ত এই গ্রন্থটিতে শুধু প্রেস ও সংবাদ-পত্রের ইতিহাসই ব্যক্ত হয় নি। সেই সঙ্গে সংবাদ-পত্রের প্রধান ভূমিকা এবং কবি-সাহিত্যিক-সমালোচক-দের আলোচনাও স্থান পেয়েছে। এমনি আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়।

আধুনিক ফারসী সাহিত্যের অন্যান্য শাখার ন্যায় নাট্য-সাহিত্য ততো উন্নত নয়। তবু ইরানে নাট্য-আন্দোলন গড়ে উঠেছে এবং নাটক মঞ্চস্থকরণেও তাঁদের উদ্যোগ সমানভাবেই লক্ষণীয়। উল্লেখ্য যে, ফারসী নাটক প্রথমতঃ অনুবাদের মাধ্যমেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং পরবর্তী সময়ে অনেকেই মূল নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু, বিজয়-অভিযান, প্রেম-কাহিনী, ইরানের লোক-ঐতিহ্য ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় কেন্দ্র করেই তাঁদের নাটক রচিত। আলী আকবর দেখোদা, শেখ মুসা নাসরী, সান আতিজাদা কিরমানী, মুশফিক কাজিমী, রাবী আনসারী, জাহাঙ্গীর জলিলী, মোহাম্মদ হিজাজী, বুজরুখ আলভী, জামালজাদা প্রমুখ অনেকেই নাটক রচনার ক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন। হিজাজী এবং হিদায়াতই নাটক রচনায় অধিকতর সফলকাম হয়েছেন। হিজাজীর বহুসংখ্যক নাটকের মধ্যে 'হাফিজ', 'আরোস ফারাংগী' (ইউরোপীয় কনে), 'জংগ' (যুদ্ধ), 'হাজী-ই-মুতাজাদ্দিদ' (আধুনিক হাজী), 'মুসাফিরাত-ই-কোম' (কোম অঞ্চলে ভ্রমণ) এবং 'মাহমুদ আকা রা ওয়কিল কুনিদ' (মাহমুদ আকার জন্য ভোট চাই) ইত্যাদি ফারসী নাট্য-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। 'মাহমুদ আকা রা ওয়াকিল কুনিদ' নাটকটির জনপ্রিয়তা খুব বেশী। এই নাটকের প্রধান চরিত্র মাহমুদ আকা একজন ভণ্ড, চোরাকারবারী এবং স্বার্থপর। 'মজলিস' বা এসেম্বলীতে তার যোগদানের অর্থই হলো নিজের স্বার্থ উদ্ধার করা এবং এই বিষয়ই নাটকের আগাগোড়া বিস্তৃত।

অনুরূপভাবে সাদিক হিদায়াতের 'পারভিন দোখার-ই-সাসান' (সাসানীয় কন্যা দোখার), 'মাজিয়ার' এবং 'আফসানা-ই-আফারিনিশ' (সৃষ্টিতত্ব কাহিনী) খুবই খ্যাতি অর্জন করেছে। 'আফসানা-ই আফারিনিশ' নাটকটি স্যাটায়ারধর্মী এবং সৃষ্টিতত্ত্বের অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এতে আশ্রয় লাভ করেছে। তাছাড়া নাটকের চরিত্রগুলোও মুসলিম জাতীয় জীবনে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী। যেমন খালিক উফ, জিব্রাইল পাশা, মিকাইল আফান্দী, ইসরাইল বেগ, মুনিসার শয়তান, বাবা আদম, নানা-হাওয়া ইত্যাদি। ১৯৩১ সালে নাটকটি লিখিত হয় কিন্তু ধর্মীয় বিরোধিতার জন্য ইরানে এই নাটক প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। এবং ১৯৪৬ সালে এটি প্যারিস থেকে ছাপা হয় এবং হিদায়াতের আত্মহত্যার কয়েক বছর আগে। নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছে এমন খবর আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি এবং জানা যায় নাটকটির মাত্র ১০৫ কপি ছাপা হয়েছিল এবং তার প্রায় সবগুলো কপিই প্যারিসে নিঃশেষ হয় এবং ইরানে মাত্র নমুনা কপি এসেছিল। এই নাটকটি স্বভাবতঃই আরবী নাট্যকার তাওফীক আল-হাকীমের 'মহম্মদ' নাটকটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে তাওফীক আল-হাকীমের নাটকে ধর্মীয় উত্তেজনার একমাত্র কারণ ছিল হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর উপর নাটক লেখা নিয়ে—অন্য কারণে নয়। এই নাটকে হযরতকে আদর্শ মানব হিসেবেই চিত্রিত করা হয়েছে।

জালাল আলী আহমদের 'জিয়ারত' এবং 'মুদির-ই-মাদ্রাসা' বড় গল্প দুটোও পরবর্তী সময়ে নাটকে রূপ দেওয়া হয়েছে। 'মুদির-ই-মাদ্রাসা' মঞ্চে খুব সাফল্য অর্জন করেছে বলে শোনা যায়। দেশের শিক্ষার গলদ, শিক্ষকদের অমনোযোগিতা এবং শিক্ষা দপ্তরে যথাযথ তদারকের অভাব ইত্যাদিই আশ্রয় লাভ করেছে এই নাটকে। তাছাড়া নাটকটির রূপান্তরও হয়েছে ইরানের আঞ্চলিক ভাষায়। ফলে, জনসাধারণের বোধগম্য হতে মোটেই কষ্ট হয় না।

উন্নত ধরনের নাটক রচনা এবং সেই সঙ্গে মঞ্চায়নের সাফল্য সম্পর্কে বর্তমানে ইরানীয় লেখক ও নাট্যামোদীরা খুব সতর্ক। তাঁদের এই প্রচেষ্টা নাটক রচনা ও মঞ্চ সাফল্যের দিকে যে তাঁদের এগিয়ে নেবে তাতে সন্দেহ নেই।

৪. অনুবাদ সাহিত্য

ফারসী সাহিত্যের রেনেসাঁ যুগে সাহিত্য প্রধানতঃ অনুবাদ-নির্ভর ছিল। জে. জে. মারিয়ার-এর প্রখ্যাত উপন্যাস 'দি এ্যাডভেন্সার অব হাজী বাবা অব ইস্পাহান'-এর কথা আধুনিক ফারসী সাহিত্যের শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রন্থটি মূল ফারসী ভাষা থেকে অনুবাদ করেন মীর্জা হাবীব-ই-ইস্পাহানী। ব্রাউন অবশ্যি শেখ আহমদকে অনুবাদক হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। এ সম্পর্কে নানারূপ বিতর্ক আছে। কোনরূপ বিতর্কে না গিয়ে আমরা বলবো 'হাজীবাবা' গ্রন্থটিই ফারসী সাহিত্যের নবজাগরণের প্রথম দিশারী। 'সিয়াহত নামা-ই-ইবরাহীম বেগ'ও এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।

ফারসী সাহিত্যে যে সব অনুবাদের সন্ধান পাওয়া যায় তন্মধ্যে ফরাসী থেকেই অনূদিত হয়েছে অধিকমাত্রায়। ইংরেজী, রুশ, জার্মানী ও আরবী থেকেও কিছু কিছু হয়েছে, তবে তাদের সংখ্যা নগণ্য। মীর্জা হাবীব অথবা শেখ আহমদ যাই বলি না কেন তাদের পর পরই উল্লেখ-যোগ্য অনুবাদ বিশ্ব-খ্যাত আরবী গ্রন্থ 'আলিফ লায়লা ওয়া লায়লার।' এই অনুবাদ-কর্ম সম্পাদন করেন মীর্জা আবদুল লতিফ তাসুজী তাব্রিজী। 'আলিফ লায়লা ওয়া লায়লার' অনুবাদ ইতিপূর্বে অনেকেই করেছেন কিন্তু ভাষার প্রাঞ্জলতা এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য এটি সুধীজন কর্তৃক অধিকতর সমাদৃত হয়।

রেনেসাঁ যুগের প্রাথমিক পর্বে আর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অনুবাদ হচ্ছে আলেকজান্দ্রে দুমুস-এর উপন্যাসসমূহ যেমন 'লী কমটে দ্য মণ্টে ক্রিসটু', 'লেস ট্রুইস মস্কোটারিস', 'লা রেইনে মারগট', 'লুই ফরটিন' এবং 'লুই ফিফটিন' ইত্যাদির অনুবাদ। এগুলো অনুবাদ করেন শাহ মোহাম্মদ তাহির। রেনেসাঁ আন্দোলনের সময় আধুনিক ফারসী সাহিত্যের নবজাগরণে এগুলো চেতনা সঞ্চারী ক্রিয়া করেছিল। জানা যায়, রীতিমত সাহিত্য সভার আয়োজন করে এগুলো পড়ে শোনানো হতো।

শাহ মোহাম্মদ তাহিরের পরে 'জোকা-উল-মূলক' খ্যাত কবি ফরোগী অনুবাদ করেন জোলে ভার্নের 'লা টোর দ্য মান্দে এন এইটি জারস', বারনারদিন দ্য সেণ্ট পীয়ের-এর 'লা চমেরে ইনডিয়ানে' এবং

চতেব্রিয়ান্দ-এর 'লেস এ্যাভেন্তারে দ্য এভেন্সেরাজ' ইত্যাদি গ্রন্থ। আলী মোকাদাম অনূদিত মোলেরের 'লী মেতেসিন মালগ্রে লুই'ও উল্লেখের দাবি রাখে।

পরবর্তী সময়ে লক্ষ্য করা গেছে যে, যাঁরাই সাহিত্য-কর্ম করেছেন তাঁরাই তাঁদের মূল রচনার পাশাপাশি অনুবাদও করেছেন। উদাহরণ-স্বরূপ আলী দাস্তী কৃত স্যামুয়েল স্মাইলস-এর 'সেলফ হেলফ', মোহাম্মদ আলী জামালজাদা কৃত সেন্ট পীয়ের-এর 'লী কাকে দ্য সুরাট', মোলেরের 'ল এ্যাভারে', হেনরীক ইবসেনের 'এন ফোক ফিয়েন্দে' এবং হেনরীক উইলেম ভন লুনের 'দি স্টোরি অব ম্যানকাইণ্ড, বুজরুখ আলভী কৃত চেকভের 'দি চেরী অরচার্ড', মারশাকের 'টুয়েলভ মন্থস', বার্ণার্ড শ'-এর 'মিসেস ওয়ারেনস', প্রফেসন্স এবং জে. বি. প্রিস্টলের 'এ্যান ইন্সপেক্টর কলস', জালাল আলী আহমদ কৃত দস্তভস্কির 'ইগরোক', আলবার্ট কেমোর 'ল' ইতরেঞ্জার', জাঁ পল সাঁত্রের 'লেস মেইন্স সেলস', বিহ্ আজিন কৃত শেকসপীয়রের 'অথেলো', বালজাকের 'লা পী দ্য চাগরিন', সাদিক হিদায়াত কৃত আলেকজান্দ্রে ল্যাঞ্জের 'দি ওল্ড ক্রো', চেকভের 'দি গুজবেরী বুশ', গ্যাস্টোন চেরঅ-এর 'দি আবিসিনিয়ান লেগুন', জাঁ পল সাঁত্রের 'লে মুর', লেসকটের 'কাণ্ট দ্য লী কারজে' ইত্যাদি অনুবাদের নাম করা যায়।

ফারসী সাহিত্যের পূর্ণ ও সমৃদ্ধির মূলে এসব গ্রন্থের অনুবাদের ভূমিকা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ফারসী সাহিত্যিকরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, বিশ্ব-সাহিত্যের একটা সামগ্রিক রূপ যদি অনুবাদের মাধ্যমেও উপস্থিত করা যায় তবে বিশ্ব-সাহিত্য সম্পর্কেই শুধু অবহিত হওয়া যাবে না—নিজেদের সাহিত্যও সমৃদ্ধ হবে নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয়ে। এবং এটা তাঁদের সাফল্যেরই নিদর্শন।

কি কাব্য, কি গল্প-উপন্যাস, কি প্রবন্ধ-গবেষণা, কি নাটক এবং অনুবাদ—সবক্ষেত্রেই উন্নতি বিধানে আধুনিক ফারসী লেখকগণ বদ্ধপরিকর। তাঁদের সামগ্রিক প্রচেষ্টায় ফারসী সাহিত্য উত্তরোত্তর অগ্রগতির পথে। এটা নিঃসন্দেহে আশার কথা।

পরিশিষ্ট

গ্রন্থপঞ্জী

ফারসী

১. ইরাজ আফসার, নাসর-ই-ফারসী-ই মু আসির (সাম্প্রতিক ফারসী গদ্য) তেহরান, ১৯৫১।

২. জালাল আলা-ই আহমদ, 'হিদায়াত ওয়া বোফ-ই-কোর' (ইলম ওয়া জিন্দিগী, নং ১, ২, পৃঃ ৬৫—৭৮)

৩. বুজরুখ আলভী, 'সাদিক হিদায়াত' (পায়াম-ই-নও, নং ১২, সংখ্যা ১, পৃঃ ২৫—২৯)।

৪. মোহাম্মদ তকী বাহার, সবক শিনাস্ত ইয়া তাতাওর-ই-নাসর-ই ফারসী (ফারসী গদ্যের স্টাইলের পঠন-পাঠন), ৩ ভলিয়ম, তেহরান, ১৯৪২।

৫. তকী মুদাররিস, মুলাহিজা দর বারা-ই-দাস্তান নিভিসী-ই-নুবীন-ই-ফারসী (আধুনিক ফারসী ছোট গল্প সম্পর্কিত তথ্য), তেহরান ১৯৬৭।

৬. সাঈদ নফিকী, শাখারা-ই-নাসর-ই-ফারসী মুআসির (সাম্প্রতিক ফারসী গদ্যের শ্রেষ্ঠ রচনা), তেহরান, ১৯৬১।

৭. মোহাম্মদ সদর হাশমী, তারিখ-ই-জারাহিদ ওয়া মাজাল্লাত-ই ইরান (ইরানের প্রেস ও সাময়িক পত্রের ইতিহাস), ৪ ভলিয়ম, ইস্পাহান, ১৯৫৩— ৫৭।

৮. জাবিহ্ উল্লাহ্ সাফা, তারিখ-ই আফারিয্যাত দর ইরান (ইরানের সাহিত্য ইতিহাস), ৩ ভলিয়ম, তেহরান, ১৯৬২।

৯. গোলাম মীর্জা রাশীদ ইয়াসামী, আফারিয্যাত-ই মুআসির (সাম্প্রতিক সাহিত্য), তেহরান, ১৯৪৭।

১০. মীরজা কালিস বেগ (সম্পাদিত), আনওয়ারুল আসরার, তেহরান, ১৯০৬।
১১. লুৎফ আলী আজহার, আতশকদা, (বোম্বে সংস্করণ, ১৯০৭)।
১২. মীরজা মোহাম্মদ কাজবিনী, বিস্ত মাকালা (১ম ও ২য় খণ্ড), তেহরান, ১৯২৮।
১৩ মীরজা মোহাম্মদ কাজবিনী (সম্পাদিত), নিজামী আরোদী রচিত 'চাহার মাকালা,' তেহরান, ১৯১০।
১৪. আসানন্দ সাতারাম (সংকলিত), চুন্দ আলা শি'র, বোম্বে, ১৯৩৬।
১৫. সোলেমান নাদভী, খৈয়্যাম, (বোম্বে, ১৯৩৩)।
১৬. খোদাদাদ খান, লুব্ব-ই-তারিখ-ই-সিন্ধ, (বোম্বে, ১৯০০)।
১৭. গোলাম আলী আজাদ, মা' আসীরুল কারীম, (দিল্লী, ১৯১০)।
১৮. মোহাম্মদ হোসাইন আজাদ, নিগারিস্তা-ই-ফারস, (দিল্লী, ১৯২২)।
১৯. রীদা কুলী হিদায়াত, রিয়াজুল আরফীন, (তেহরান, ১৩১৬ হি)।
২০. শিবলী নোমানী, শি'রুল আজম, (তিন খণ্ড). দিল্লী, ১৯২০।
২১. মোহাম্মদ সিদ্দিক হাসান খান, সুব্ব-ই-গুলশান, (তেহরান, ১২৯৫ হি)।
২২ মোজতবা মানুভী (সম্পাদিত), দীওয়ানই নাসির খসরু, (তেহরান, ১৯২৮)।
২৩. সায়ীদ নাফিসী, রুবাইয়্যাত-ই-আবু সায়ীদ ইবনে আবুল খায়ের, (তেহরান ১৯৫৫)।
২৪. আহমদ আ' রাম (সম্পাদিত), কিমি আ-ই-সাদাত, (তেহরান, ১৯৪০-৪২)।
২৫ মোজতবা মানুভী (সম্পাদিত) নওরোজ নামা-ই-ওমর খৈয়্যাম, (তেহরান, ১৯৩৩)।
২৬. মোহাম্মদ আলী নাসিহ (সম্পাদিত), দাসিফী : তারিখ-ই-জালালী, (তেহরান, ১৯৪৪)।
২৭. এ. আতেস (সম্পাদিত). জাহিরী : সিন্দবাদ নামা, (তেহরান, ১৯৩০, ইস্তাম্বুল ১৯৪৯)।
২৮. আমির খসরু, কিরান আল তা' দায়ান, (লাখনো, ১৮৪৫)।
২৯. আব্বাস ইকবাল (সম্পাদিত), উবাইদ-ই-জাকানী : কুল্লিয়াত, (তৃতীয় সংস্করণ, তেহরান, ১৯৩৫)।

৩০. সবিস্তারী, মীর' আত আল মু'হাক্কী–কিন, (সিরাজ, ১৯১৮)।
৩১. সালমান-ই-সাবাজী, কুল্লিয়াত (বোম্বে, ১৯৩৩)।
৩২. কাসিম গানী, তারিখ আসর–ই-হাফিজ, (তেহরান, ১৯৪২)।
৩৩. আবদ আল রহীম খাল খালী, দীওয়ান-ই-হাফিজ, (তেহরান' ১৯২৭)।
৩৪. মোহাম্মদ ইলাহাদাদ (সম্পাদিত), আলী ইয়াজদী: জাফর নামা, (কলিকাতা ১৮৮৫-১৮৮৮)।
৩৫. রীদা কুলী খান (সম্পাদিত), মীর খবন্দ: রওজাত-আল-সাফা, (দুই খণ্ড, তেহরান, ১৮৫৩-১৮৫৪)।
৩৬. মোহাম্মদ কাজিম সিরাজী, জোবারনী: আখলাখ-ই-জালালী, (কলিকাতা, ১৯১১)।
৩৭. মোহাম্মদ আমিন আল ইসলাম কিরমানী, নিয়ামাত আলাহ ওয়ালী: দীওয়ান, (তেহরান, ১৯৩৭)।
৩৮. হিকমাত আলী আসগর, জামী, (তেহরান, ১৯৪২)।
৩৯. ইকবাল হোসাইন, (সম্পাদিত) তোহফা-ই-সামী, (পাটনা, ১৯৩৪)।
৪০. হোসাইন পিজহামঁা, (সম্পাদিত) দীওয়ান-ই-জামী, (তেহরান, ১৯৩৮)।

ইংরেজী

১. এ. জে. আরবেরী, মডার্ণ পার্শীয়ান রীভার, কেম্ব্রিজ ১৯৪৪।
২. এ. জে. আরবেরী, ক্ল্যাসিকাল পার্শীয়ান লিটারেচার, লণ্ডন, ১৯৫৮।
৩. এডওয়ার্ড জি. ব্রাউন, এ লিটারেরী হিষ্ট্রি অব পার্শীয়া, ৪ ভলিয়্যম, কেম্ব্রিজ, ১৯২৪।
৪. এডওয়ার্ড জি. ব্রাউন, দি প্রেস এ্যাণ্ড পোয়েট্রি অব মডার্ণ পার্শীয়া, কেম্ব্রিজ, ১৯১৪।
৫. আর, লেভী, পার্শীয়ান লিটারেচার, এ্যান ইনট্রডাকশন; অক্সফোর্ড, ১৯২৩।

৬. আর লেভী, দি পার্শীয়ান ল্যাংগুয়েজ, লণ্ডন ১৯৫১।
৭. সি. এ. ষ্টোরে, পার্শীয়ান লিটারেচার, লণ্ডন, ১৯৩৯।
৮. নাজিব উল্লাহ্, ইসলামিক লিটারেচার, নিউইয়র্ক, ১৯৬৩।
৯. আবদুল গনি, এ হিষ্ট্রি অব পার্শীয়ান ল্যাংগুয়েজ এ্যাণ্ড লিটারেচার অব দি মোঘল কোর্ট, ৩ ভলিয়ম, এলাহাবাদ, ১৯২৭-৩০।
১০. এ. এ. হিকমাত, গ্লিমলেস অব পার্শীয়ান লিটারেচার, লণ্ডন, ১৯৫৬।
১১. মোহাম্মদ ইসহাক, মডার্ণ পার্শীয়ান পোয়েট্রি, কলকাতা, ১৯৪৪।
১২. আর, পি. মাসানী, কোর্ট পোয়েট্স অব ইরান এ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া, নিউবুক কোম্পানী, ১৯৩৮।
১৩. আর, এ. নিকলসন, এ লিটারেরী হিস্ট্রি অব দি এ্যারাবস, কেম্ব্রিজ ১৯৩০।
১৪. এইচ. কামশাদ, মডার্ণ পার্শীয়ান প্রোজ লিটারেচার, কেম্ব্রিজ, ১৯৬৬।
১৫. এফ. এফ. আরবুঘ্নট, পার্শীয়ান পোরট্রেইটস, লণ্ডন ১৮৮৭।
১৬. মোহাম্মদ ওয়াহিদ মীর্জা, লাইফ এ্যাণ্ড ওয়ার্কস অব আমির খসরু, (ক্যালকাটা, ১৯৩৫)।
১৭. এ. জে. আরবেরী (সম্পাদিত ও অনূদিত), ইরাকী ঃ উস্সাক নামা, (লণ্ডন, ১৯৩৯)।
১৮. ই. জি. ব্রাউন এ্যাণ্ড মীরজা মোহাম্মদ কাজবিনী (সম্পাদিত ও অনূদিত) শামস-ই-কায়স ঃ আল মু'জাম, (লণ্ডন, ১৯০৯)।
১৯. জে. ডব্লিউ. রেডহাউস, (সম্পাদিত ও অনূদিত), রুমী ঃ মসনবী-ই-মানুভী, (লণ্ডন, ১৮৮১)।
২০. জে. রেনল্ডস্ (সম্পাদিত ও অনূদিত), উতবী ঃ কিতাব-ই-ইয়ামিনী, (লণ্ডন ১৯৫৮)।
২১. এ. জে. আরবেরী, রুবাইয়্যাত-ই-ওমর খৈয়্যাম, (লণ্ডন, ১৯৫২)।
২২. জে. আটকিনসন (সম্পাদিত ও অনূদিত), শাহনামা-ই-ফেরদৌসী, (লণ্ডন, ১৮৮২)।
২৩. জে. চ্যাম্পিয়ন, (অনূদিত) ফিরদৌসী ঃ শাহনামা, (ক্যালকাটা, ১৮৭৫)।

২৪. আর. এ. নিকলসন, এ লিটারেরী হিষ্ট্রি অব দি এ্যারাবস, (লণ্ডন, ১৯০৭)।

২৫. সি. এ. ষ্টোরে, পার্শীয়ান লিটারেচার ঃ এ বাইওবিবলিও গ্রাফিকাল সার্ভে ইন প্রোগ্রেস, (লণ্ডন. ১৯২৭)।

২৬. পি. এম. সাইকেস, এ হিষ্ট্রি অব পার্শীয়া, (তৃতীয় সংস্করণ, ২ খণ্ড, লণ্ডন, ১৯৪০)।

২৭. পি. এম. সাইকেস, এ হিষ্ট্রি অব আফগানিস্তান, (দুই খণ্ড লণ্ডন, ১৯৪০)।

২৮. এল. পি. আল ওয়াল সাতান, এ গাইড টু ইরানিয়ান এরিয়া ষ্টাডি, (মিচিগান, ১৯৫২)।

২৯. এইচ. এ. আর. গিব, মডার্ণ ট্রেন্ডস ইন ইসলাম, (চিকাগো, ১৯৪৭) ।

৩০. এলজিন গ্রসক্লোজ, ইনট্রুডাকশন টু ইরান, (নিউ ইয়র্ক, ১৯৪৭)।

৩১. উইলিয়াম এস. হাস. ইরান (নিউ ইয়র্ক, ১৯৪৬)।

৩২. আর. নিককী কেদ্দী, 'রিলিজিওন এ্যাণ্ড ইররিলিজিওন ইন আর্লী ইরানিয়ান ন্যাশনালিজম' ইন কমপ্যায়ারিটিভ ষ্টাডিজ ইন সোসাইটিজ এ্যাণ্ড হিষ্ট্রি, নং ৩, ভ্যলিম ফোর, এপ্রিল, ১৯৬২ ।

৩৩. এ্যান. কে. এস. ল্যামবটল, ল্যাণ্ড লর্ড এ্যাণ্ড পিজান্ট ইন পার্সীয়া, (নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৩)।

৩৪. রহমত মোস্তাফাভী, 'ফিকশন ইন কনটেমপোরেরী পার্শীরান লিটারেচার' ইন মিডল ইষ্টার্ণ এ্যাফায়ার্স, সেপ্টম্বর, ১৯৫১।

৩৫. রেজাজাদা শাফাক, 'ড্রামা ইন কনটেমপারেরী ইরান,' ইন মিডল ইষ্ট্রার্ন এ্যাফায়ার্স, জানুয়ারী, ১৯৫৩।

৩৬. মনসুর সাকী, 'এ্যান ইন্‌ট্রুডাকশন টু দি মডার্ন পার্শীয়ান লিটারেচার' ইন কারেসটারিয়া ওরিয়ান্টলিয়া ; প্রাহা, ১৯৫৬।

৩৭. ইহসান ইয়ার সাতার, পার্শীয়ান লেটারস ইন দি লাষ্ট ফিফটি ইয়ারস' ইন মিডল ইষ্টার্ন এ্যাফায়ার্ল, ১৯৬০ ।

শব্দসূচী

অ

অকসাস ১, ২৭, ১৬৭
'অরলাণ্ডু ফিউরিসো' ৪০

আ

আইন-ই-আকবরী ৯১, ১০৯, ১৩১, ১৪৭
আওফী ১৪, ৫৭
আওরঙ্গজেব ৯৮
আওহাদ উদ্দীন ৭৭
আওহাদ সাবজোয়ারী ৭৯
আওহাদী ৭৭
আকবর, সম্রাট ৮৭, ৯১, ৯২, ৯৩, ১০৯, ১৩১
'আকবর নামা' ৯২, ১০৯, ১৩১
আকল নামা ৪২
আকা মোহাম্মদ ৯৭
আখলাখ-ই-নাসিরী ৮৩
আখতার ১১৩
আখলাখ-ই-মোহনিনী ৮৭
আজম ওয়াই শক ১৩৯
আখারিন ইয়াদিগার-ই-নাদির ১৩৯, ১৪২, ১৪৪
আখরিন লবখন্দ ১৫০
আখলাক-উল-আশরাফ ১২৪
আজ রঞ্জিকা মি বারিম ১৪৬
আজরাকী ১৭, ২১
আতহারুল বালা ৮৬
আতা মালিক জোবায়নী ৮৩
আতাবেগ ৩০, ১৩১
আতশকদা ৩৮, ৪৪, ৭৭, ৮৬
আতওয়াকুজ জাহাব ১০৪
আব্বাস খলিলী ১৪৮, ১৪৯
'আয়না' ১৪৯
আদারিয়্যাত্ত-ই-মু আসির ১৫০
আদিব সাবীর ৩৯
আদিব পেশওয়ারী ১১৫
আদিবুল মামালিক ১১৫, ১১৬
আদিবুজ জামান ১১৬
আনওয়ারী ১৭, ৩১, ৩৫, ৩৬-৩৮, ৪৭-৪৮, ৬০, ৭৭, ১০৮
আনতার-ই-কালুতিয়াশ মুর্দাবাদ ১৪৬, ১৪৮, ১৫০
আনতারা ৩৪
আনোয়ার-ই-সোহেলী ৮৬, ৮৭, ১০৯, ১১১, ১৩১
আফসানা-ই-তারিখ-ই লাজিকা ১৩৯, ১৪৭, ১৫০

আফজাল-ই-বাকী ৭৭
আবদুল্লাহ্ ইবনে তাহির ৩
আবদুল্লাহ্ ইবন আল-মুকাফ্ফা ৬, ৮, ৫৬, ৬১, ৬৮
অ্যব ওয়া জিন্দেগী ১৪১
আবদুর রাজ্জাক ৮৩
আবদুল করিম খান ১০৯
আবেস্তা ১, ২
আবি সীনা ৯, ১১
আবু আলী ৮, ১০
আবু ইসহাক ৭৯
আবুনাসর বিন আহমদ ১৩১
আবু শাকুর ৫, ১১
আবু তালিব খান ১০৯
আবু তালিব কালীম ৮৯
আবু হাসিব ২৯
আবু মনসুর ৮, ১০, ১১, ১৫,
আবু সাঈদ আবুল খায়ের ২০, ২১, ২২, ২৭, ৩১, ৪৭
আবুল আব্বাস ৩
আবুল ফজল, কবি ১৩১
আবুল সালীক ৪
আবুল মু'আইদ ৫, ৬, ৮, ১০, ১১
আবুল হাসান শহীদ ৫, ৬
আবুল আলা আল মা'আরবী ৬৬
আবুল আলী বা'ল আমী ১১
আবুল ফারাজ ২৬
আবুল ফজল ৯১, ১০৯
আবুল কাসিম লাহুতী ১১৫
আবুল মা'আলী নাসর আল্লাহ ১৩১, ১৪২, ১৪৭, ১৫০
আমসাল-উল-হিকাম ১৪৯
আমসাল ওয়া হিকাম ১২৪
আমানী ৯৭
আমাক ৩৯
আমিন আহমদ-ই-রাজী ৩৮, ৮৬
আমির খসরু ৬৭, ৬৮-৭০, ৮৬
আমির-ই-আওমানী ৭৭
আমির শাহী কুদসী ৭৯
আমির আলী শায়ের নবাই ৮৩, ৮৬, ৯৭, ১০৩, ১০৯
আফসানা-ই-তারিখ-ই লাজিকা ১৩৯, ১৪১, ১৪৭
আমির নাসর ১৮
আমির মোহাম্মদ জে ১০৬
আমির দোস্ত মোহাম্মদ খান ১০৬
আমির আবদুর রহমান খান ১০৬
আরমা গান-ই-হিজাজ ১২০
আরিফ কাজবিনী ১১৫
আরফী ৭৯, ৮০
আরবু থণ্ট ৬০
আরবেরী ৬০
আরবী ভাষা ১, ২, ৭৭, ৮৯, ১১০
আরভানকী কিরমানী ১৪৫
আরসাদী ১৪, ১৫, ২০
আরুস-ই-মাদাইন ১৩৯
আরোস ফারাংগী ১৫১
আর্য সমাজ ১, ২৭, ৭৩
আল-মামুন ৩, ১৫, ৭১
আল-খাবিসাত ৬০
আল-আলামুত ৮৪
আল-মোরী ১৫
আল-মুতানাব্বী ১৯
আল-বেরুণী ২৯; ১২৪

আল-আশা ৩৪
আল-আফলাকী ৫০, ৫১
আলফিয়াহ্ ওয়া সালফিয়াহ্ ৫৪
আলপ আর সালান ৩২, ৩৪
আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা ৭, ২৮, ৪০, ১৩৪, ১৫৩
আলী দাস্তী ১৪৮
আলী মোহাম্মদ আফগানী ১৪৫
আলেকজাণ্ডার ২৮, ৪০
আলেকজাণ্ডার দামূস ১৩৫
আলী বিন জায়েদ বায়হাকী ৫৭
আল্লামা ইকবাল ১১৫, ১২০, ১২২, ১২০, ১৪০
আয়ার দানিশ ১০৯, ১৩১
'আশিক' ৯৭
আসুঁ-ই-খোরাসান ৩৬
আশিয়ানা-ই-উকাব ১৩৯
আসু-ই-ইয়াতিম ১২৩
আসশিজ, সুলতান ৪৭
আসজাদী ২০. ২১
আসাদী ১৪, ২০, ২১, ২৮
আসরার-ই-যুদী ১২০
আহমদ আলী খোদাদাদ ১৪৮
আহ্-ই-ইনসান ১৪৭

ই

ইউসূফ জোলায়খা ৬, ১৭, ৪০, ৮০, ৮১, ১০৭, ১১৫, ১৪২
ইউসূফ হামদানী ৪২
ইউসূফ আমিরী ৭৮
ইজারা-ই-খানা ১৪৫
ইংরেজী ভাষা ১১৩, ১২৫
ইতোরদি ১১৩
'ইনসান ওয়া হায়ান' ১৫০
ইবন আলী বলখী ৫৭
ইবন ইসফেনদীয়ার ৫৭
ইবন-আল-আরাবী ৬৬
ইবন খাল্লীকান ৮৩, ৮৬
ইবন আল মুকাফফা ১৩১
ইয়াকিবোদ ওয়া ইয়াকি নাবোদ ১৪০, ১৪১, ১৪৩, ১৪৭
ইবনে সোলায়মান ১১০
ইবনে জাফর ৫৭
ইবনে মুনাব্বার ৫৭
ইবসেন, হেনরীক ১৫৪
ইব্রাহিম সুলতান ২৭
ইমরুল কায়েস ৩৪, ৩৫
ইমাদ-ই-জওজানী ৩৯
ইমামী ৭৭
ইয়াজদিগিরি ১০
ইয়াজদীজার্দ ২৫
ইয়াসামী ১১৫
'ইয়াকোলিয়া' ১৪৭
ইরাকী, কবি ৬৬
'ইরফান' ১০০
'ইরান শহর' ১১৪
ইরাজ মীর্জা ১১৫
ইলতুতমিশ ৫৭
ইলাহী নামা ৪৫, ৬২
ইবরাত নামা ১০৩
ইবাদ নিশাপুরী ৭৯
ইবরাহিম মুদারিসী ১৩৯
ইস্ফাহান নিসফ-ই-জাহান ১৫০

ইশক ওয়া সোলতানাত ১৩৬
'ইশ্‌ক নামা' ৪২
'ইশকিয়া' ৬৮, ৬৯
ইশকী, মীরজাদা ১১৫, ১১৮

উ

উনসুরী ১৪, ১৫, ১৭, ১৮, ২০
উর্দু ভাষা ১২০
উরফী ৮৮, ৮৯, ৯৩
উলুগবেগ ৭৮
'উসানা' ১৪৯, ১৫০

ঋ

ঋগ্বেদ ১

এ

এনায়েত উল্লাহ্‌ ১৩৪
এডওয়ার্ড ফিটজ্যারাল্ডউ ৩৩
'এল, এতোরদি' ৪০
এ্যারিস্টটু ৪০

ও

ওমর খৈয়্যাম ৩২, ৩৩-৩৪, ৩৯, ৫৬, ৮৪, ১৪১, ১৪৭
'ওয়াইস ওয়া রামীন' ৪০
ওয়ালেদ, সুলতান ৫০
ওয়াহ্‌কার ৮৯
ওয়াসিল ১০১, ১০৬
ওয়াসী ১০১, ১০৬
ওয়াফায়াতুল আয়ান ৮৬, ১১০
ওয়াসাফ ৮৩, ৮৫
ওয়াসীফ সাকজী ৪
'ওয়ামিক ওয়া আজরা' ১৮
ওয়াররাক, মোহাম্মদ ৪

ক

কন্‌স্টান্টিনোপাল ১১৩
কাজার রাজবংশ ১১৭
কাতরান ৩১
কাতিবী ৭৯
কান্তি ঘোষ ৩৩
কানী ৮৯, ১০৫
ক্বানিয়ী ৭৭
'কানুন' ১১৪
ক্বারী ১২৭-১২৮
'কাবুস নামা' ২৯, ৫৫, ৫৬
কাবুল ১২৯
'কামসূত্র' ৫৪
কামাল উদ্দীন ৬৫, ৬৭
কামাল উদ্দীন খাজুন্দী ৬৭, ৭১
কামাল-উল-মুলক ১৪৯
কারীম আনোয়ার ৭৪,৭৯
কাস্পীয়ান সাগর ১
কালামরু-ই-সাদী ১৪৮
কালিলা ওয়া দিমনা ৬, ২৮, ৫৬ ৮৬, ১৩১, ১৩৭, ১৪০, ১৪৭
কাশিফী ৮৩,৮৬
কাশ্মীর ১২০
কায়কাউস ২৯,৫৫
কিউনীফর্ম রীতি ২, ১১৯
'কিয়াসুল উলেমা' ১১০
কুতুব উদ্দীন আইবেগ ৫৭
কুদসী ৯৭

কুলতাশান-ই-দেবান ১৪০
'কুল্লিয়াত' ৬২
কেম্ব্রিজ ১২০
কোনাভী ৬৬
'কোরবান আলী' ১১৭
কোহনা ওয়া নও ১৪১

খ

খবন্দ, মীর ৮৩
খলিলী ১১৫, ১২৭, ১২৮
'খসরু ওয়া শিরীন' ৪০, ৪১, ৯০
খাকানী ৩৭,৩৮,৪০
খাকান মানুচেহর ৩৭
খাজা আবদুল্লাহ্ আনসারী ২৫, ২৮, ৩০, ৩১, ৪৭
খাজা মঈন উদ্দীন চিশতী ৫৪,৫৫
'খাবরীন' ২৯
খাজু ৬৭
'খামছা' ৬৮,৬৯,৮৯,৯০
খিজির খান ৬৮
খিরাজ নামা সিকান্দারী ৮১
খেয়ামী শাহবাজী ১৪৬
খোজিস্তা ১৩৩
'খোদাবন্দ নামা' ১০৩
খোন্দমীর ১০৮, ১০৯
'খোলাসাতুল সের, ২৯
খোলাসা-ই-তারিখ-ই-ইরান ১৪৯
খোরাসান ২, ৩, ১৪, ২৮, ৩১, ৪০, ৪২, ৪৭, ১০৫, ১০৭
'খোরাসানের কাবা' ৪২

গ

গন্তহর ৪৯
গজনী ১১৯
গজনবী শাসন ২, ৯, ১৫, ১৭, ২৪, ৩০, ৮৬, ৯৭, ১০৮
গাজায়েরী ২০
গারদিজী, আবদুল হাই ২৯
'গারীব নামা' ৪২
গায়ের আজ খোদা হিকাস নাবোদ ১৪১
গালিব ৯৭
গানী ১৩৯
গিয়াস উদ্দীন তুগলক ৭০
গিয়াসী ৯৭
গেয়োমার্থ, সম্রাট ২৮
গোলাম মোহাম্মদ খান তারজী ১০৬, ১০৭, ১১৭
'ওরসাসপ নামা' ১৪, ২০, ২৯
'গুলিস্তাঁ' ১৩, ৬৪, ৬৬, ৮১, ১০৫ ১৩১, ১৪৭, ১৫২
'গুলশান-ই-সাবা' ১০৩

ঘ

ঘোরী, মোহাম্মদ ৫৫
'ঘোরী ওয়া সুলতানুল হিন্দ' ৫৮

চ

'চশমায়াশ' ১৪৫
চামদান ১৪২, ১৪৩
'চাহার মাকালা' ১৪, ১৮, ৩৯, ৪৫, ৪৮, ৮৯, ১১৭

'চারান্দ পারান্দ' ১২৪
চেখভ ১৫৪
চেংগিস খান ৩৬,৪৫, ৫৯, ৬০, ৬৫, ৭৮, ৮৩, ৮৫, ১০৯
'চেংগিস নামা' ১০৯

জ

'জবুর-ই-আজম' ১২০, ১২১
জাফর খান ৯৬, ১১০; ১৩৩
'জাফর নামা' ৮৬, ১০১, ১১০
জানানা-ই-জিয়াদী ১৪৬
জাবাদ ফাজিল ১৩৯
জামশিদ ২৮
জামী ১৭, ৩১, ৩৯, ৭৯, ৮০, ৮৯, ১১১, ১২৪, ১৪৭
জালালুদ্দিন রুমী ১৭, ৩১, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৯, ৫০-৫২, ৫৩, ৫৫,৬৭, ৬৯, ৭৭, ১২০, ১২১, ১২৪
জালাল উদ্দীন ৬৫
জালাল আলা-ই-আহমদ ১৪৫
জালাল আসীর ৯৭
জালাল আলী ১৪৫
জালালল মুলক ১১৮
জাহাঙ্গীর, সম্রাট ৯৪, ৯৬, ১০৯
জাহাঙ্গীর জলিলী ১৫১
জার্মানী ১, ১৩
'জিয়ারত' ১৪৬
জিন্দা বেগোর ১৪১
জির-ই-চিরাগ ১৪৭
জীবরান খলিল জীবরান ৮
জেবুন্নেসা ৯৮, ৯৯, ১০০
জেন্দাবেস্তা ২
জেমস মোরিয়ার ১৩৫
জোহ্হাগ ২৮
জোবায়নী ৮০, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ১১১, ১৪৭, ১৫৩
জোলালী ৯৭
জোরোষ্টার ১, ৯
জুননুন মিসরী ২৩, ২৯
জুহায়ের বিন আব সালমা ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৪০

ত

তকী মুদাররিস ১৪৫
তরাফা ৩৪
তাইগ্রীস ১
তাওফীক আল হাকীম ১৫২
তাজিকিস্তান ২, ৮৭
তাজকিরাত উল মু'আসিরিন ৯৭
তাজকিরা-ই-দিলগুশা ১০৪
তাপসী রাবেয়া ২৯
তাবারী ১১, ১২০
তাব্রিজ ১১৩, ১২২
তারজামানুল আসরার ৭৪
তারজী ১০১
তারজীবন্দ ৯৫, ৯৭
তারজামানাল বালাগাত ১৯, ২৯
তারানা-ই-খৈয়াম ১৫০
তারিখ-ই-গুজিদা ১৪, ২৯, ৮৬
তারিখ-ই-গজনবী ২৯, ৫৭, ৫৮
তারিখ-ই-সেইস্তান ৩০
তারিখ-ই-মক্কা মুআজ্জমা ৫৪
তারিখ-ই-বায়হাকী ৫৭

তারিখ-ই-তাবাজিরস্তান ৫৭
তারিখ-ই-সালজুক ৫৭
তারিখ-ই-সুলতান মাহমুদ ৫৭
তারিখ-ই-আদাব ৫৭
তারিখ-ই-জাহান ৮৪
তারিখ-ই-জাহান গুশা ৬০, ৭১, ৪৪, ৪৭, ১০৫
তারিখ-ই-ওয়াসাফ ৮৫
তারিখ-ই-ইসলামীয়া ৮৬
তারিখ-ই-ফিরোজশাহ ৮৬
তারিখ-ই-সাহিব কিরানী ৮৬
তারিখ-ই-আলম ৮৫
তারিখ-ই-আব্বাসী ১০৯
তারিখ-ই-হামজা ১০৯
তারিখ-ই-আলফী ১০৯
তারিকুত তাহকিক ৪২
তালক ওয়া শিরীন ১৪১
তালিব ৯৭
তালিব-ই-আমোলী ৮৯, ৯৪
তাহা হোসেন ৬
তিহরান-ই-মাকুফ ১৪৮
তেহরান ১১৩, ১৩৬
তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় ১১৪
তেলিগ্রাফ-ই-বিসিম ১৪৫
তৈমুর লং ৭৮
'তৈমুর নামা' ৯০
তোতা কাহিনী ১৩৩
'তোহফাতুল ইরাকায়েন' ৩৭
'তোহফা সামী' ৮৯, ৯১
তোখরুল-ই-হোসনে ১২৬
তোফান ৯৭
তুর্কিস্তান ১৫
তুগরিল বে ৩০
'তুগলক নামা' ৭০
তুজক-ই-জাহাঙ্গিরী ১০৯
তূতী নামা ১৩৩, ১৩৪

দ

দাউদ বিলকিতী ৮৪
দা-ঈ, কবি ৯৭
দাকিকী ৫, ৮, ১৫, ২০
'দার-উল-ফুনুন' ১১৩
দাস্তানহা-ই-তারিখী ১১৩, ১১৬, ১৬০
দাস্তান-ই-নাজ ১৫০
দালিরা-ই-খারাজম ১৪৯
দাস্তান-ই-কুতুহ ১৩০
দাস্তান-ই-বাস্তান ১৩৭
দারী ভাষা ২
'দি হিস্ট্রি অব পিটার' ১১৩
'দি হিস্ট্রি অব চার্লস' ১১৩
দিদ ওয়া বাজদিদ ১৪৬
দীওয়ান-ই-হাফিজ ৭৪, ৭৫
দীনশাহ জে, ইরানী ১৫১
'দীল আসত' ১২৯
দেবলা দেবী ৬৮
দেখোদা, আলী আকবর ১১৫, ১২৫, ১২৬, ১২৮, ১৪০
দোখতার-ই-কুরুশ ১৩৯
দোখতার-ই-রায়াত ১৪৭
দৌলত শাহ ৬৭, ৭৯, ৮৩, ৮৬

ন

'নওরোজ নামা' ১১৭
নকশা-ই-পারন্দ ১৪৭

নজরুল ইসলাম ৩৩
নসর বিন আহমদ ৬, ৭
নরেন দেব ৩৩
নাকশী আজ হাফিজ ১৪৮
নাখশাবী ১৩৩
নাজিরী ৮৯, ৯৪
নাদির শাহ ১৭
নাদিম ১১৫
নাফাহাতুল ইনস ৮০
নামা-ই-দানিস ১১০
নাল ওয়া দামান ১৯
নাশাত ৮৯, ১০১, ১০৩, ১০৪
নাসর আল্লাহ ইবন মোহাম্মদ ৫৬, ৫৮, ৬১, ৭৭
নাসির খসরু ২৪, ২৫, ২৮
নাসির উদ্দীন তুসী ৮৩
নাসির নাজমী ১৩৯
'নায়ারিংস্তান' ১৪৯
'নাসিয-ই-সিমাল' ১১৪
নিকলসন, এ. আর. ২৩
নিগারিস্তান ১৩১, ১৩২
নিগারিস্তান-ই-খুন ১৩৯
নিজাম-ই-আরোদী ১৪, ১৮, ৩৯, ৪৫, ৪৮, ৫৫, ৬৭, ৭০
নিজাম-উল-মূলক ৩২, ৩৩, ৩৯, ৫৬, ৮৪
নিজাম উদ্দীন আওলিয়া ৬৮, ৮৬
নিজামী ১৭, ৩১, ৩৯, ৪০, ৪২, ৪৪, ৮৯, ৯৩, ১০৭
নিজারী ৭৭
নিজামাতুল্লাহ্ ৭৯
নিভিস্তা হা-ই-পারাকান্দা ১৪৯
নুজুমুস সামা-আ ১১০
নুন ওয়াল কালাম ১৪৬
নুরজাহান ৯৪, ৯৫
নুসরাতুল্লাহ্ শাদলু ১৩৯
নুর আল্লাহ্ নুরী ১৪৫

প

পঞ্চরত্ন ৪২, ১৩০
পঞ্চতন্ত্র ১৩০, ১৩১
পরাকান্দা ১৪৭
'পরোয়ারিশ' ১১৪
পাঁজমা বখতিয়ারী ১১৫, ১২৬, ১২৭, ১২৯
পারভিন ইতেশামী ১১৫, ১২৩
পায়াম-ই-মাশারিক ১২০, ১২১
পায়াম-ই-কাফকা ১৫০
পায়েন্দা ১৩৯
পায়েক-ই-আজল ১৩৯
পাশী ধর্ম ১
পাহলবী ২, ৯
পাঞ্জা-ই-খুনীন ১৩৯
পাঞ্জাব ১২০
পাহলবী শাসন ১১৪
পাঁনচ গঞ্জ ৩৯, ৪২, ৬৮, ৬৯, ৯০
পুর-ই-বাহা ৭৭, ৭৮

ফ

ফকনার ১৪৬
ফখরুল্লাহ্ আসাদ ৪০
ফতেহ আলী খান ১০১

ফরহংগ-ই-জাহাঙ্গিরী ১০৯
ফরাসী ভাষা ১১৩, ১১৯, ১২০
ফারহানী ১৩৯
ফরিদ-ই-আহওয়াল ৭৭
ফরিদ উদ্দীন আত্তার ৩১, ৩৯, ৪০, ৪২, ৪৪, ৪৯, ৫০, ৫৫, ৭৭, ৭৭, ৭৮, ৮১, ৯৭
ফরিদ-ই-কাতিব ৩৯
ফরোশ ৮৯
ফরোশাঁ-ই-কারণ বিসতুম ১৪৮
ফরোগী ৮৯
ফাওয়াইদ-ই-গিয়া খারী ১৫০
'ফারশ নামা' ৫৭
ফারহানী ১১৫, ১২২
ফারুকী ১৪, ১৫, ১৮, ১৯, ২৮
ফিজিস্তান ৪
ফিগানী ৮৯, ৯০
ফিরোজশাহ ৭০
ফিরোজ মাশরেকী ৪
'ফিহ্ মা ফিহ ৫১
ফেরদৌসী, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২০; ২১, ২৮, ৩৯, ৪০, ৬৯, ৭৭, ৮৯, ১২৪,১২০
'ফৈজী, শেখ ৮৮, ৮৯, ৯১, ৯৩, ১২০, ১২৭, ১৩১

ব

বখতিয়ার নামা ১৩৩
বদর-ই-শাস ৭৭
বাদাউনী ৮৭
বদিউজ্জামান ১৩৪
বায়হাকী, আবুল ফজল ২৯
রায়কারা মীর্জা ৭৮
বায়দিল ৯৭, ৯৯, ১০০, ১০১
বায়তাব ১২৭
বালুচিস্তান ১, ২, ৬৭, ৯০
বাবা তাহির ২৩
বারনী ৮৩, ৮৬
বারজোই ১৩০
বাহার-ই-দানিশ ১৩৪
বাহরাম, সম্রাট ৪০
বাহরাম-ই-ঘোর ১৩৯
'বাহারিস্তান' ৮০, ৮১, ১১১ ১৩১, ১৩২, ১১৭
বাহার ৯৯, ১১৯ ১২০
বাহাউদ্দীন ৪৯
বাৎসায়ন ৫৪
ব্রাউন ৬০
বি-সুআ-ই-মারদুম ১১৭
বিহরুজ ১৩৯
বিড়পের উপকথা ১৩০, ১৩১
বিসাল ৬০, ৮৯, ১০১, ১০৩
বিসমিল ১০৪, ১০৫
বিহ আজিন ১১৫, ১১৬
বেদ ১
বোজারজী ১৩০
বোদ ১৩০
বোফ-ই-কোর ১৪১
বোরানদাক ৭৯
বো'লো ৪৭
বোস্তাঁ ৬৩, ৬৬, ৮১, ১১১, ১৩১
বোস্তান নামা ১৫
বোস্তানুস সিয়াহাত ১১০

বুলবুল-ই-সিরাজ ৬৩
বুজরুখ আলভী ১৪৩, ১৪৪, ১১৫, ১৫০, ১৫৭

ভ

'ভগভগ সাহাব' ১১২
ভোলটেয়ার ৩৪, ১১৩
ভূমধ্যসাগর ৩০, ৬৭, ৯৮

ম

মখফী ৯৭
'মরদ-ই-দরকাসাস' ১১৫
মসনবী ৩৯, ৫১ ৫২ ৫৫
মহাভারত ১০৯
মাইজুদ্দীন হামগর ৭৭
মাকামাতে হামদানী ২৮, ১৩৪
মাকামাতে হারিরী ২৮, ১৩৪
মাখজানুল আসরার ৩৯, ৪০
মাগরিবী ৭৭
মাজমা উল ফুসাহা ৭৪, ৯১
মাজালিসুল মুহসিনীন ১১০
মাজালিসুল ফুসাহা ৮৯
মাজালিসুল উসসাক ৬৭, ৭১, ৭৮, ৮৯, ৮৭, ৯১
'মাজিয়ার' ১৫০
মানাকিবুল আরফীন ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩
মানাকিবুশ শো আরা ৬৭, ৭১
মাদহারুল আজায়েব ৪৫
মানুচেহরী ১৯
মারকাজ-ই-আদবার ৯১
মারিয়ার, জে, জে, ১৫৩
মারী-ই-ভিনিসী ১৩৬
মাশরেকী ১০১
মালকুম খান ১১৪
মালিক শাহ ৩২, ৩৪, ৬৭
মায়মুন ১৩১
মালিকুস শো'আরা ১১৫
মাসুদ সাদ ২৬, ২৭
মাসূদী ৮
মিনহাজ সিরাজ ৫৭, ৫৮
মিজমার, কবি ৮৯, ১০২
মীরজাদাহ শফী ১১৭
মীর্জা আবু সাঈদ ৭৯
মীর্জা সাম ৮৯
মু'ইজ্জী ৩৪, ৩৫, ৩৯
মু' আমমারী ১০
'মুদির-ই-ম্যদ্রামা ১১৬, ১১৮
মুনতেকুত তায়ের ৪৫
মুর্তাজা মুশফিক কাজিমী ১১৮
মুনিচ ১২০
মুসাব্বাত ১১৪
মুন্তাখাবাত উল তাওয়ারিখ ৯৪
মুসিবত নামা ৪৫
মেমান্দি ১৭
মেহেরদিল মাশরেকী ১০৬
মোহাম্মদ আলী শাহ্ ১২৪, ১২৫
মোহাম্মদ ইব্রাহীম ৪৪
মোহাম্মদ তকী কুরদানী ১৩৯
মোহাম্মদ বাকীর খোসরুভী ১৩৬, ১৩৮, ১৪০
মোহাম্মদ আলী খলিলী ১৩৯
মোহাম্মদ আলী জামালজাদা ১৩৯, ১৪০, ১৪৩, ১৪৭

মোহাম্মদ তকী বাহার ১১৫, ১৪৫, ১৪৭
মোহাম্মদ হিজাজী ১৪৯
মোস্তাক ৯৭
মোস্তাগনী ১১৫
মোল্লা মোহাম্মদ হোসাইন ৯৭
মোল্লা মোহাম্মদ মমিন ৯৭
মোলের ১১৩
মোঙ্গল শাসন ৩, ৩৭, ৪০, ৪৭, ১৩২, ১৩৭, ১৪৪, ১৪৭
মৌলালী ৫২, ৫৩

য

যাকারিয়া, শায়েখ ৬৬

র

রওজাতুল জান্নাত ১১০
রওজাতুস্ সাফা ৮৬, ১০৮, ১০৯
রমুজ-ই-বেখুদী ১২০, ১২১
রশীদ উদ্দীন ওয়াতওয়াত ৩৯, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯
রফী উদ্দীন আবহারী ৭৭
রফীক, কবি ৯৭
রাজন নামা ১০৯
রাজিয়া, সম্রাজ্ঞী ৫৮
রাবনামা ১৪০
রাবিয়ী ৭৭
রাবী আনসারী ১৪৮
রাশাহাত-ই-কালাই ১৪৮
রাশাহাত-ই-সাহাব ১০২
রাভানদী ৫৭
রাশীদ শিহাব ৫৪
রশীদ ইয়াসামী ১৫০
রাশীদ উদ্দীন আমির ৮৩
রিদা কুলী খান ৭৪, ৮৯, ৯১, ১০১, ১০৫, ১০৬, ১১৫, ১২১
রিয়াজুস্ শো আরা ৯১
রিয়াজুল্ল আরফীন ৪৫, ৬২, ৭৪, ৯১, ৯৭, ১০১
রেজাশাহ পাহলবী ১১৪
রো-ই-বাদা-ই-নামাক ১৫০
রোকন উদ্‌দীন হামজা ৫৪
রোকন উদ্‌দীন, শায়েখ ৪৪
রোজ-ই-সিয়াহ-ই রায়তে ১৪৮
রোজ-ই-আওয়্যাল ১৪৭
রোজ-সিয়াহ-ই কারগর ১৪৮
রোজিগার ই সিয়াহ ১৪৮
রোদাকী ৫, ৬, ৭, ১১, ১৩১
রোস্তম ও সোহরাব ২৮
'রুবাইয়্যাত-ই-ওমর খৈয়্যাম' ৩৩

ল

লণ্ডন ১১৪
লাইখার ৪২
'লামাত' ৬৬
'লায়লা ওয়া মজনুন' ৪০, ৪১, ৬৯, ৮১, ৯০, ১০৫, ১১০, ১১৭
লাহোর ১২০
লারিজাইশক ওয়া খুন ১৩৯
লিসানুল গায়্যাব ৪৫, ৭৪

লিসানুত তায়ের ৮৬
লি মেতেলিন ১১৩
লি মিসানথ্রপে ১২৩
লুগাত নামা ১২৪
লুবাইদ ৩৪
'লুবাব' ১৪, ৫৭
লুৎফী আলী বেগ ৩৮, ৪৪, ৮৩, ৯১, ১০৭, ১১৭, ১২১

শ

শররাফ উদ্‌দীন আলী ইয়াজদী ১৩৩, ১৩৫, ১৪৪
শামস-ই-তাব্রীজ ৫০, ৫১, ১১৯
শাহনামা ৫, ৮, ১০, ১৫-২০, ২৮, ৩৯, ৮৬, ৮৯, ১৩৪
'শাহনামা-ই-হজরত-ইশাই ইসমাইল' ৯০
শাহ আববাস ৯৬
শাহজাহান ১৩৪
শাহ্ সরকার ১১৪
শাহরোখ মীর্জা ৭৯, ৮৬
শারাফ উদ্‌দীন আলী ইয়াজদী ৮৩, ৮৬, ১০৭, ১১৪
শাহরজাদ ১৩৯
শামস-ই-তোগরা ১৩৬
শাহ-ই-ইরান ওয়া বানু-ই-আরমাঁ ১৩৯
'শাহিনশাহ নামা' ১০৩
শায়েখ মোহাম্মদ আলী হাজিব ৯৭, ৯৮, ১০০
শায়ের-ই-দির আশনা ১১৮
শিহাব উদ্‌দীন সোহরাওয়াদী ৬১
শিবলী নোমানী ৭৬, ৮৭, ৯০, ৯৫, ৯৬
'শিরুল আজম' ৭৬, ৭৭, ৮৭, ৯০, ৯১, ৯৬
শিয়ালকোট ১২০
শেখ মোবারক ৯১
শেখ মুসা নাসরী ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৪০

স

সক্রেটিস ৫
'সফর নামা' ২৫, ২৯
সফর নামা-করিম ১১০
সফর নামা-ই-তালিব ১১০
সংস্কৃত ভাষা ১, ২
সহর-ই-আহু খানম ১১৭
সাইফ উদ্‌দীন ইশফারান্দী ৭৭
সাইদ নাফিসী ১৩১
সাফ্‌ফারী রাজবংশ ৪
সাকী ৯৭
সাদ উদ্‌দীন আনসারী ৯৭
সাদ কালিমা ৪৮, ৪৯
সাদিক চোবক ১৪৫, ১৪৭, ১৫২
সাদিক হিদায়াত ১৩৬, ১৪১, ১৪২, ১৪৫, ১৪৭, ১৫০
সাদী, শেখ ১৭, ৩১, ৪০-৪২, ৬০, ৬২, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৮১, ১০৭, ১৩১, ১৪৯
সানায়ী ৩১, ৩৯, ৪০-৪৩, ৫৫, ৬২, ৭৭, ১৩১

'সাব আ মু' আল্লাকা' ৩৫
'সাবআ' ৮০
সারগুজিস্তা ১৩৭
সারগুজিস্তা-ই-কানদোহা ১১৬
সাবজোয়ার ১১৮
সাবা, কবি ৮৯
সাবাহী ৯৭
সাসানীয় শাসক ৬
সামা সঙ্গীত ৫৩, ৫৫
সালীম ৯৭
সালামান ওয়া আবসাল ৮০
সালজুক শাসন ৩, ১৫, ৩০, ৩১, ৩৮, ৩৯, ১৭, ৫৭, ১০৩, ১৫০
সয়ীদ হাসান ৩৯
সায়ীদ নূরুল্লাহ্ ১১০
সায়্যীদ মোহাম্মদ ৯৭
'সায়ে কাফন' ১১৭
সায়ীব ৮৮, ৮৯, ৯৬
সায়রুল ইবাদ ইলাল মা'দ ৪২
সাহাব ১০১
সাহাবী, কবি ৯৭
সাসানীয় শাসন ৫, ৯, ৬০, ৬৭, ৮১, ৯৩, ১০৭, ১৪০
সায়ের-ই-দরদিঘনে শামস ১১৮
'সিকান্দর নামা' ৪০, ৪১, ৯০, ৯১
সিজদা-ই-নওরোজ ১১৮
সিন্দবাদ ওয়া হিন্দবাদ ৫৪
সিলসিলাতুল দাহাব ৮০
সিন্ধু উপত্যকা ১
সিয়ারুল মূলক ১৫
সিয়াহ পোশন ১৩৮
সিয়াসত নামা ৩৯, ৫৬
'সিতার' ১৪৬
সিতারা-ই-লিদি ১৩৭
সিয়াহত নামা-ই-ইব্রাহিম বেগ ১৩৪, ১৩৪, ১৩৭, ১৫২
সে কাতরে খুন ১৪১
সোবহাতুল আবরার ৮১
সোলেমান ওয়া বিলকিস ৯১
সোভিয়েত দেশ ২
সোহরাওয়ার্দী ৫৭
সুআলা ৯৭
'সুখান' ১৪৬
সুজানী ৩৯, ৪৯
সুলতান উল উলামা ৫০
সুলতান মাহমুদ ১৫, ১৬-২০, ৩০, ৪৭, ৮৭, ১০৫
সুলতান মাসুদ ১৯, ৩০
সুবক্তগীন ১৫
সুবুহ ৯৭
সুর-ই-ইস্রাফীল ১১৪, ১১৬, ১২৪
সুরাইয়্যা ১১৪
'সূক সংততি' ১৩৩

হ

হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ১৫২
'হজর আসপ' ৭৪, ৪৮
হফত অন্তরঙ্গ ৩৯, ৮০
হফত মানজার ৯০
হফত কিশওয়ার ৯১
হফত পয়কর ৪০, ৪১, ৯০, ৯১
হাইডেলবার্গ ১২০
হাকীম আজরাকী ৫৩

হাজী-ই-মুতাজাদিদ ১৫২
হাজী জয়নুল আবেদীন ১০১, ১৩৫, ১৩৭, ১৫০
হাজী বাবা অব ইস্পাহান ১৩৫
হায়দার আলী কামালী ১৩৯
হাতিফ ৯৭
হাতিফ-ই-ইস্ফাহানী ৯৫, ৯৭
হাতিফী ৮৯, ৯০
হাদায়েকুস্ সেহর ৩৫, ৪৯
হাদী সাবজওয়ারী ১১৮, ১১৯
হাদিকাতুল হাককাত ৪০, ৪২, ৬২, ৬৭, ৭৪
হাদী শরীফিয়ান ১৪৫
হানজালা ৩, ৪
হাফত-ই-ইকলীম ৩৮, ৭৭, ৮৬
হাফিজ, কবি ১৭, ৩১, ৪১, ৬৭, ৭১-৭৭, ৮৯, ৯০. ১০৭, ১১৯
হাফিজ-ই-আবরু ৮৩
হাবলুল মতিন ১১৪
হাবীব উস্-সীয়ার ১০৯
হাবীব-ই-ইস্ফাহানী ১৫৩
হাবীব, মীর্জা ১৫৩
হামদ আল্লাহ্ মোস্তাউফী ৮৩, ৮৫, ৮৭, ১০৫
'হালনামা' ৭৯
হালাকু খান ৬০, ৭৩, ৮৪,
হাসান ৭৬, ৮৬
হাসান বাদী ১৩৬, ১৩৭
হাসান সাব্বা ৩২, ৩৩, ৫৬, ৮৪, ৮৫, ৮৭, ১০৭
হারুন অল-রশীদ ৩, ৪, ১৫
হিকমাত ১৩৯
হিজাজী ১৫১
হিদায়াত-ই-বানতিজ্য ১৫০
হিদায়াত, কবি ৮৯
হিন্দবাদ ওয়া সিন্দবাদ ১৩২
'হিতোপদেশ' ১৩০, ১৩১
হেকায়েত নামা ৫৭
হেমিংওয়ে ১৪৬
হেনরী জেমস ১৪৬
হোমার ৬
হোসাইন ওয়ায়েজ ১৩১
হুমামুদ দীন তাবরিজী ৭৭
হুজবিরী ২৯, ৫৪